আধুনিক যুগের সর্বাধিক মাতাত্মক একটি ফিতনার নাম

সালাফিবাদ

এরা মূলত মাজহাব বিরোধী।
বাংলা ভাষায় রচিত এ প্রামাণ্য গ্রন্থটি পাঠ করুন। সালাফিদের প্রায় ৫০টি ভ্রান্তির স্বরূপের ওপর আলোচনা এবং এগুলোর খণ্ডন করা হয়েছে এই গ্রন্থে। কেনো মাজহাব ছাড়া সঠিকভাবে দ্বীন পালন সম্ভব নয়, তা স্বচ্ছ পানির মতো পরিষ্কার হবে আপনার নিকট। বেঁচে থাকতে পারবেন গায়র-মুকাল্লিদদের খপ্পর থেকে।

অবশ্য তাদের কথায় বিভ্রান্ত সকলেই এ বই থেকে উপকৃত হবেন ইনশাআল্লাহ!

اَنْوَارُ الْمَذَاهِبِ الْاَرْبَعَةِ فِيْ رَدِّ ضَلَالَةِ غَيْرِ الْمُقَلِّدِيْنَ

চার মাজহাবের আলো

(গায়র মুকাল্লিদদের ভ্রান্তিসমূহের খণ্ডন)

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান সম্পাদক: মাওলানা মুহিউদ্দীন খান

মাওলানা ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী

মাওলানা সৈয়দ মাহমুদুল হাসান

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ

প্রফেসর ড. সৈয়দ বদিউজ্জামান ফারুক

আবদুল মুকিত মুখতার

ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

বিশেষ ইন্টারনেট সংস্করণ

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া

সর্বস্বত্ব

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া গবেষণা বিভাগ, সুবিদ বাজার, সিলেট।

প্রকাশকাল

মুহাররম ১৪৩৭ / নভেম্বর ২০১৫ / আশ্বিন ১৪২২

প্রকাশক

দেওয়ান শামসুল হুদা চৌধুরী

বর্ণবিন্যাস ও অঙ্গসজ্জা

ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া গবেষণা বিভাগ।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া জামিয়া ইমদাদিয়া ক্বওমিয়ার পক্ষ থেকে

পেশ কালাম

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ! যুগের প্রসিদ্ধ ওলিয়ে কামিল কুতবে যামান হযরত মাওলানা আমিনুদ্দীন শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খানক্বায়ী [তথা তাসাওউফের] খিদমাতকে সারা আলমে প্রচার-প্রসারের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় ঈসায়ী ২০১০ সালে এই খানক্বাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সিলেট শহরের প্রাণকেন্দ্র সুবিদ বাজার পয়েন্টে 'আলী সেন্টার' নামক ভবনে স্থাপিত এই খানক্বার দাতা হলেন ভবনের মালিক হাজী আলী আসগর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও তাঁর স্ত্রী হাজিয়্যা মমরাজ বিবি রাহমাতুল্লাহি আলাইহা। তাঁদের সন্তান আলী সেন্টারের বর্তমান মালিক ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী খানক্বার প্রধান পৃষ্ঠপোষকের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন।

আলহামদুলিল্লাহ! আমাদের মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বর্তমানে এই খানক্বায় মোট তিনটি বিভাগ চলু হয়েছে। এগুলো হলো:

১. তাযকিয়ায়ে নফ্‌স বিভাগ [আত্মশুদ্ধি বিভাগ]।
২. তাফাক্কুর ও ইশাআত বিভাগ [গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ]।
৩. তা'লিম বিভাগ [শিক্ষা বিভাগ]।

আল্লাহর অপরিসীম কৃপায় উপরোক্ত প্রতিটি বিভাগেই নিয়মিত কার্যক্রম চালু হয়েছে। আত্মশুদ্ধি বিভাগে প্রতি শনিবার বাদ ইশা তা'লিম, ইসলাহী মাহফিল, জিকির-আজকার ও দু'আ-দরূদ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এছাড়া বাদ ফজর সুরায়ে ইয়াসীনসহ কুরআন শরীফ তিলাওয়াত, বাদ যুহর খতমে খাজিগান, বাদ আছর ২৪ ঘণ্টার মুরাকাবার তা'লিম, বাদ মাগরিব সুরায়ে ওয়াক্বিয়া তিলাওয়াত, বাদ ইশা সুরায়ে মুল্‌ক তিলাওয়াত ও ফাজাইলে আমলের তা'লিম নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়।

তাফাক্কুর বিভাগকে সঠিকভাবে কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে আলিম-উলামা, লেখক-গবেষক এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে ৩১ সদস্যবিশিষ্ট একটি মজলিসে শূরা গঠিত হয়েছে। শূরার উপদেষ্টামণ্ডলী হলেন: খলীফায়ে কুত্‌বে আলম হযরত মাদানী রাহ. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ নোমান চট্টগ্রামী [দা.বা.], মাসিক মদীনা সম্পাদক হযরত মাওলানা মুহিউদ্দীন খান [দা.বা.], খলিফায়ে শায়খে কৌড়িয়া রাহ. শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা মুক্বাদ্দাস আলী [দা'বা.] এবং খলিফায়ে আসআদ মাদানী রাহ. ও
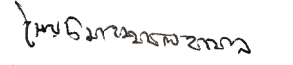
সাবেজাদায়ে হযরত শায়খে কাতিয়া রাহ. হযরত মাওলানা হাজী ইমদাদুল্লাহ আমিনী [দা.বা.]। আল্লাহর মর্জিতে বর্তমান গ্রন্থসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় ২২টি কিতাব এই বিভাগ থেকে ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। আরো প্রায় ২০টি কিতাবের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত রয়েছে। আমরা আশা করছি আপনাদের দু'আ ও সহযোগিতায় অচিরেই এগুলো প্রকাশ করবো ইনশাআল্লাহ!

শিক্ষা বিভাগে প্রাইমারী নূরানী শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া ফুনুনাত শাখায় ফন্নে সরফ-নাহু ও মাদানী নিসাবে আবাসিক/অনাবাসিক ছাত্ররা শিক্ষাগ্রহণ করছেন।

সবশেষে আমরা এটাই আশা করছি যে, বর্তমান এই গ্রন্থটি পাঠ করে সকলেই মাজহাবের গুরুত্ব অনুধাবন করবেন এবং তাক্বলিদের উপর অটল থাকবেন। তাক্বলিদ তথা যে কোন মাজহাবের অনুসরণ ব্যতীত দ্বীনকে বুঝা ও সঠিকভাবে আমল করার বিকল্প নেই। আমরা আশা করছি বিজ্ঞ হক্কানী উলামায়ে কিরাম লা-মাজহাবীদের বিভ্রান্তি, ভ্রান্ত আক্বিদা, উক্তি ইত্যাদি থেকে মুসলিম উম্মাহকে ঈমানী দায়িত্ব হিসাবে বঁচানোর চেষ্টা জোরদার করবেন। বিশেষভাবে প্রত্যেক মসজিদের খতিববৃন্দ ও সম্মানিত ওয়াইজগণ বক্তৃতা পেশকালে এই বিষয়ের উপর দিক-নির্দেশনা দ্বারা মুসলমানদেরকে মাজহাবের গুরুত্ব অবগত করার জন্য আমরা আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

গ্রন্থটির প্রকাশক জনাব দেওয়ান শামসুল হুদা চৌধুরী এবং অন্যান্য সহযোগী সবার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন। গ্রন্থের উপর উলামায়ে কিরাম ও বিজ্ঞ পাঠকদের পক্ষ থেকে আলোচনা, সমালোচনা ও মতামত অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে আমরা বিবেচনা করবো ও প্রয়োজনে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ!

(মাওলানা) ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী
প্রতিষ্ঠাতা প্রধান পরিচালক

(মাওলানা) সৈয়দ মাহমুদুল হাসান
প্রতিষ্ঠাতা সচিব

ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী
প্রতিষ্ঠাতা পৃষ্ঠপোষক, খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া জামিয়া ইমদাদিয়া ক্বওমিয়া
আলী সেন্টার, সুবিদ বাজার পয়েন্ট, সিলেট, বাংলাদেশ।
২৬ অক্টোবর, ২০১৫ ঈসায়ী।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

প্রকাশকের আরজ

আলহামদুলিল্লাহ! মাজহাবের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে এ পর্যন্ত যত লেখালেখি হয়েছে কেনো জানি আমার বার বার মনে হয় তা নিতান্তই অপ্রতুল। মাজহাব না মানার একটি প্রবণতা বর্তমান সময়ে বিশেষত আমাদের যুবসমাজে ভয়াবহরূপে প্রবেশ করতে শুরু করেছে। বিষয়টি এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে, এর বিপক্ষে কোনো শক্ত ও যৌক্তিক প্রতিরোধ গড়ে না তুললে অদূর ভবিষ্যতে মুসলিম সমাজে এটি একটি বড় ফিতনায় পরিণত হবে।

এরকম একটি পরিস্থিতিকে সামনে রেখে আমাদের সম্পাদনা পরিষদের স্বনামধন্য গবেষকগণ এ বইটি প্রণয়নের যে সাহস করেছেন তার জন্য সকলকেই ধন্যবাদ ও মুবারকবাদ জানাচ্ছি। এর পরিপূর্ণ বদলা একমাত্র রাব্বুল আলামীনই তাঁদেরকে দিতে পারবেন।

বইটি প্রকাশনার দায়িত্ব আমার উপর এসেছে সৌভাগ্যক্রমে। এর হক কতটুকু আদায় করতে পেরেছি বা পারবো, সে বিচার তো কেবল আল্লাহ তা'আলাই করবেন। পাঠকরা যদি উপকৃত হন তাহলে মনে করবো এটাই আমার ইহজগতের সবচেয়ে বড় প্রাপ্য। ভুল-ত্রুটির সমালোচনা হওয়াটাই স্বাভাবিক। এ সুযোগ খোলা রইলো গোটা উম্মতের প্রত্যেক সদস্যের জন্য। সাথে সাথে দু'আর দরখাস্ত সবার কাছে।

দেওয়ান শামসুল হুদা চৌধুরী

১লা জানুয়ারী ২০১৫ ঈসায়ী।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

প্রাক কথন

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহর অপরিসীম কৃপায় 'চার মাজহাবের আলো' শিরোনামের এই গ্রন্থটি আমরা বিদগ্ধ পাঠকবর্গের হাতে তুলে ধরতে পেরেছি। আমি একান্ত আশাবাদী, একদিকে মুকাল্লিদ অসংখ্য মুসলমান এবং অপরদিকে লা-মাযহাবী মুসলিম ভাই-বোন এই গ্রন্থটি পাঠ করে উপকৃত হবেন।

ইসলামের ইতিহাসের প্রাথমিক দিনগুলোতেই মহাত্মন আইম্মায়ে মুজতাহিদীন এবং তাঁদের ছাত্রবর্গ একদল উচ্চ পর্যায়ের ইসলামী গবেষক সর্বযুগের মুসলিম জনগোষ্ঠির সুবিধার্থে ইসলামের ফিক্হ শাস্ত্রের গোড়াপত্তন করে যান। এই ফিক্হ শাস্ত্র ছাড়া দ্বীনকে সঠিকভাবে বুঝা ও আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি মুতাবিক আমল করা আদৌ সম্ভব নয়। পবিত্র কুরআন ও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের সঠিক অনুসরণ নিশ্চিত করতে যেয়ে মোট চারটি ফিক্হের জন্ম হয়। যে কোন মুসলমান এই চারটির মধ্যে কোনো একটি ফিক্হ তথা মাজহাব অনুসরণ করলেই সঠিক দ্বীনদারিত্ব পালনে সমর্থ হবেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই।

মুসলিম উম্মাহ্ দীর্ঘ ১২ শতাধিক বছর যাবৎ এই চার মাজহাবের অভ্যন্তরে থেকে সঠিকভাবে ধর্মপালন করে আসছেন। অবশ্য অল্প কিছু মুসলমান 'নিজে নিজে' দ্বীন পালনের চেষ্টা অতীতে করেছেন। এখনও করছেন। এদেরকে ফিকহী ভাষায় 'গায়র মুকাল্লিদ' বা 'লা-মাজহাবী' বলা হয়। আধুনিক যুগে এই লা-মাজহাবী দলভুক্ত কেউ কেউ মাহজাবীদেরকে অন্যায়ভাবে আক্রমণ করে যাচ্ছেন। তারা মাজহাবী বা মুকাল্লিদ হওয়াকে 'শিরক', বিদআত' ইত্যাদি শব্দব্যবহারের মাধ্যমে মারাত্মকভাবে কটুক্তি করছেন। এটা কারো কাম্য নয়।

আমরা মনে করি লা-মাজহাবীরাও আমাদের একান্ত আপনজন মুসলমান ভাইয়েরা। তারা যদি মাজহাবের গুরুত্ব অনুধাবন করেন তাহলে পুরো মুসলিম সমাজ এবং নিজেরাও উপকৃত হবেন।

এই গ্রন্থে আমরা মাজহাবের ফিকহের সঙ্গে সংঘাতপূর্ণ লা-মাজহাবীদের আমল-আক্বিদার উপর দালিলিক প্রমাণাদিসহ বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আমরা আশা করছি লা-মাজহাবী ভাইগণ এ থেকে উপকৃত হবেন এবং মাজহাবের গুরুত্ব অনুধাবন করে নিজেদের পছন্দসই যে কোনো মাজহাবের অনুসরণে অনুপ্রাণিত হবেন। অপরদিকে মাজহাবপন্থী ভাইগণও নিশ্চিতভাবে বুঝতে সক্ষম হবেন যে, ১২ শতাধিক বছর যাবৎ অনুসৃত চার মাজহাবই হলো সঠিক দ্বীনদারিত্বের একমাত্র উপায় ও পাথেয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন।

(মাওলানা) মুহিউদ্দীন খান
প্রধান সম্পাদক
ঢাকা, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ঈসায়ী।

বিষয়সূচি

ভূমিকা ০১১-০১৫

পরিচ্ছেদ - ১: ওয়াহাবী-সালাফিদের মতামতসমূহের খণ্ডন ০১৬-৩৩০
(মাজহাব সম্পর্কিত) তাদের বিভ্রান্তি ও ভ্রান্ত আক্বীদার খণ্ডন ০১৮
মাজহাব অর্থ কি ০১৮
তাক্বলিদ সম্পর্কে শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী
রাহমাতুল্লাহি আলাইহির অভিমত ০১৯
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসারী কারা ০২০
গায়র মুকাল্লিদ সালাফিদের ভিত্তিহীন অভিযোগ ০২১
প্রথমে সুন্নাত, হাদিস না মাজহাব ০২২
তাক্বলিদের উপর গায়র মুকাল্লিদ ভাইদের প্রশ্নাবলী ও এদের উত্তর ০২৮
পবিত্র কুরআনে তাক্বলিদ ০২৯
হাদিস শরীফে তাক্বলিদ ০৩১
নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবিতাবস্থায় তাক্বলিদের প্রমাণ ০৩৪
সাহাবায়ে কিরামের যুগে তাক্বলিদ ০৩৬
লা-মাজহাবীদের ভ্রান্তি ও মাজহাবের গুরুত্ব সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য ০৪৪
লা-মাজহাবীদের সম্পর্কে বিভিন্ন যুগের উলামায়ে কিরামের মন্তব্য ০৫৬
শরয়ী আইন বুঝার জন্য হাদিস মুখস্ত থাকাই যথেষ্ট নয় ০৬৫
দ্বীনের ভিত্তি দু'টি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল ০৭২
তাক্বলিদের মর্যদা ও প্রমাণ ০৭৯
আল্লাহর দেহ ও স্থান দখল সম্পর্কিত তাদের আক্বীদার খণ্ডন ০৮৮
তাওয়াস্সুল সম্পর্কিত দাবীর খণ্ডন ০৯১
'হায়াতুন্নবী' সম্পর্কিত তাদের আক্বীদার খণ্ডন ০৯৫
অমুসলিম সৈন্যদেরকে মুসলিম জনপদে প্রবেশের অনুমতি সংক্রান্ত
ফাতওয়ার খণ্ডন ১০০
তাদের কর্তৃক সহীহ হাদিস গ্রন্থসহ মূল কিতাবের অনুবাদে ও নতুন
সংস্করণে রদবদলের প্রমাণাদি ১০২
তাসাওউফ সংক্রান্ত তাদের ভ্রান্তির খণ্ডন ১১৪
ইতিহাস থেকে তাসাওউফের প্রমাণ ১২২
হিজরী চতুর্থ শতকের শুরু থেকে দশম শতকের শেষ পর্যন্ত তাসাওউফচর্চা ১৪৪

হিজরী দশম শতকের শুরু থেকে চতুর্দশ শতক পর্যন্ত
শরীয়ত ও তরীকতের মাশাইখে কিরাম ১৪৬
'তাকফির' করা সম্পর্কিত ভ্রান্তির খণ্ডন ১৪৭
'মুত্ন পড়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্পর্কিত' ভ্রান্ত ধারণার খণ্ডন ১৪৯
আলবানি ও উসাইমিন কর্তৃক 'মসজিদে নববীর সবুজ গম্বুজ ভাঙ্গা ও
কবরগুলো মসজিদের বাইরে নিয়ে যাওয়া সম্পর্কিত মতামতের খণ্ডন ১৫৮
'আল্লাহর জিস্ম নেই' এ আক্বিদা পোষণকারীদেরকে আলবানি
'জিন্দিক' হিসাবে সাব্যস্ত সম্পর্কিত নেতিবাচক উক্তির খণ্ডন ১৬৫
ঈদের দিন আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ সম্পর্কিত
আলবানির ভ্রান্ত ঘোষণার খণ্ডন ১৬৬
জুমুআর ফরয নামাযের পূর্বে ও পরে চার রাকাআত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা
পড়া 'বিদআত' হওয়া সম্পর্কিত তাদের ফাতওয়ার খণ্ডন ১৬৯
একমুষ্ঠির বেশী লম্বা দাড়ি রাখা 'হারাম' ও 'চরম বিদআত' এরূপ
ভ্রান্ত ফাতওয়ার খণ্ডন ১৭১
তারাবী নামায ৮ রাকাআত হওয়া সম্পর্কিত তাদের ফাতওয়ার খণ্ডন ১৭৩
জানাযার নামাযে ফাতিহা পাঠ সম্পর্কিত তাদের ফাতওয়ার খণ্ডন ১৮৩
'খুতবাহ মাতৃভাষায় দিতে হবে'- এই ভ্রান্ত ফাতওয়ার খণ্ডন ১৯০
'ফাযায়েলে আমল' কিতাবের বিরুদ্ধে আক্রমণের জবাব ১৯৬
ফাযায়েলে আমল কিতাব সম্পর্কে একটি প্রশ্নোত্তর ১৯৮
বুকের উপর হাত বাঁধা, রাফে ইয়াদাইন, জলসাতুল ইস্তিরাহা,
আমীন সজোরে বলা, আত্তাহিয়্যাতু পাঠের সময় আঙ্গুল তুলে
কাঁপানো ও ঘুরানো, মহিলাদেরকে পুরুষের মতো নামায পড়া,
পা ছড়িয়ে নামাযে দাঁড়ানো ইত্যাদি ভ্রান্তির খণ্ডন ২০০
রাফউল ইয়াদাইনের ক্ষেত্রে ইমাম মালিকের মতামত ২১২
ইমাম [ওজর হেতু] বসে নামায পড়লে মুক্তাদীদেরকেও বসে নামায
পড়তে হবে: তাদের এই ফাতওয়ার খণ্ডন ২১৮
সিজদায় যাওয়ার সুন্নাত তরীকা সম্পর্কে তাদের মতামতের খণ্ডন ২২২
নামাযে সঠিকভাবে দাঁড়ানোর ব্যাপারে সালাফিদের আমলের খণ্ডন ২২৫
তাশাহহুদের সময় শাহাদাত আঙ্গুল খাড়া করে নড়ানো ও ঘুরানো
সম্পর্কিত তাদের আমলের খণ্ডন ২৩৫
জলসাতুল ইস্তিরাহা সম্পর্কিত তাদের আমলের খণ্ডন ২৪১
মহিলা ও পুরুষদের নামাযে পার্থক্য নেই, তাদের এই ফাতওয়ার খণ্ডন ২৪৩
মহিলাদের নামাযে পার্থক্যের তালিকা ২৫৫

উচ্চস্বরে 'আমীন' বলা প্রসঙ্গ ২৫৭
'আমীন' কি? ২৫৯
'আমীন' বলবো নীরবে না উচ্চস্বরে- হাদিস কী বলে? ২৬৩
'আমীন' সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরামের মন্তব্য ২৬৬
'আমীন' নীরবে বলার অন্যান্য কারণ ২৬৭
যেসব হাদিস আমীন নীরবে পাঠের বিপরীত বলে মনে হয় ২৬৯
মহিলারা স্বর্ণালঙ্কার পরা নিষিদ্ধ সংক্রান্ত ফাতওয়ার খণ্ডন ২৭২
পবিত্র তিন মসজিদ ছাড়া অন্য কোন মসজিদে ই'তিক্বাফ বৈধ নয়-
এ ফাতওয়ার খণ্ডন ২৭৪
চার মাজহাবের পরিবর্তে তাকে অনুসরণ করা সম্পর্কিত আলবানির
বক্তব্যের নিন্দা ২৮০
জুনুব এবং হায়েজ-নিফাস অবস্থায় কুরআন শরীফ
ছোঁয়া, পাঠ ও বহন বৈধ- এসব ভ্রান্তির খণ্ডন ২৮৩
সহীহাইনসহ অন্যান্য হাদিসগ্রন্থ আলবানি কর্তৃক 'বিভাগ' করার নিন্দা ২৮৬
আদাবুল মুফরাদ, তারগীব ওয়াত তারহীব ও জামি আস্‌সাগীর
গ্রন্থগুলোর 'সহীহ' ও 'জঈফ' সংস্করণ প্রকাশের নিন্দা ২৮৭
হাদিস গবেষণায় আলবানি সাহেবের মারাত্মক ভ্রান্তির প্রমাণ ২৮৮
কুরআন ও হাদিসের সকল বর্ণনা 'আক্ষরিত' অর্থে গ্রহণ করতে হবে:
আলবানির ভ্রান্তি ২৯২
ইমাম বুখারী 'অবিশ্বাসীদের মতো কথা বলেছেন' - আলবানির
এরূপ ধৃষ্টতাপূর্ণ মন্তব্য ও এর জবাব ২৯৩
আলবানি ও উসাইমিন কর্তৃক কালামশাস্ত্রের উপর আক্রমণ ও এর জবাব ২৯৩
আলবানি কর্তৃক 'আত্তাহিয়্যাতুর' শব্দ বদলানোর পরামর্শের জবাব ২৯৪
তাহাজ্জুদের নামাযের উপর আলবানির ফাতওয়ার জবাব ২৯৬
অতীত ও সমকালীন উলামার প্রতি আলবানির ধৃষ্টতাপূর্ণ বক্তব্যের জবাব ২৯৭
মাজহাবী মতানৈক্য নাকি রহমত নয়- আলবানির এরূপ মন্তব্যের জবাব ২৯৮
হানাফিরা যে পদ্ধতিতে বিত্‌র নামায আদায় করেন তা সঠিক নয়:
তাদের এই ভ্রান্ত দাবীর খণ্ডন ২৯৯
বিত্‌র নামায সম্পর্কে দালিলাদি: বিত্‌র নামাযের গুরুত্ব ৩০২
বিত্‌র নামায ওয়াজিব হওয়ার দলিলাদি ৩০২
বিত্‌র তিন রাকাআত হওয়ার দলিলাদি ৩০৬
বিত্‌র মাগরিবের অনুরূপ হওয়ার দলিলাদি ৩১০
বিত্‌র নামাযে একবার সালাম ফেরানোর দলিলাদি ৩১২

বিত্‌র নামাযে দু'আয়ে কুনুত পাঠ ৩০৫
রাসূলুল্লাহ [সা.] এর পক্ষ থেকে কুরবানী অবৈধ সম্পর্কিত
তাদের মতামতের খণ্ডন ৩১৭
একদিনে ঈদ, একদিনে রোযা- এই ভ্রান্ত মতের খণ্ডন ৩২০
'রাবেতা আলমে ইসলামী'র ফাতওয়া ৩২১
ফাতওয়ার বঙ্গানুবাদ: চাঁদের উদয়স্থলের অভিন্নতা গ্রহণযোগ্য নয় ৩২৪
যুক্তিভিত্তিক দলিল ৩২৫
ফাতওয়ায় যারা দস্তখত করেছেন তাদের নামের তালিকা ৩২৬

পরিচ্ছেদ - ২: যুগের প্রধান 'বিদআতী' নাসিরুদ্দীন আলবানিসহ
সালাফি লেখকদের মতামত, আক্বীদা ও ফাতওয়ার খণ্ডনে
উলামায়ে কিরাম কর্তৃক রচিত গ্রন্থাদি ৩২৭
আলবানি ও বিন বাযের উপর দারুল উলূম দেওবন্দের ফাতওয়া ৩৩০

পরিশিষ্ট - ১: একনজরে মাজহাব মানার গুরুত্ব ৩৩১
মাজহাব না মানার কুফল ৩৩২
উচ্চ পর্যায়ের উলামায়ে কিরাম ছিলেন মাজহাবের অনুসারী ৩৩২

পরিশিষ্ট - ২ : ইজতিহাদের যোগ্য কারা ৩৩৪

পরিশিষ্ট - ৩
অন্যান্য লা-মাজহাবী ফিতনাবাজ সম্পর্কে উলামায়ে কিরামের মন্তব্য ৩৩৬
লা-মাজহাবীদের ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের ফাতওয়াহ ও মন্তব্য ৩৩৭
মওদুদী ও মওদুদীবাদের উপর উলামায়ে কিরামের অভিমত ৩৪১

পরিশিষ্ট - ৪
গায়র মুকাল্লিদ ভাইদের প্রতি আকুল আবেদন ৩৪৭
তথ্যসূত্র গ্রন্থতালিকা ৩৫২

بسم الله الرحمٰن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى - اَمَّا بَعْد

ভূমিকা

ইসলাম একটি শাশ্বত মহাসত্যের ধর্ম। দুনিয়া-আখিরাতে মুক্তির একমাত্র উপায়-অবলম্বন হলো দ্বীন ইসলামকে তার মৌলিকত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত রেখে সঠিকভাবে আমল করা। আজ থেকে প্রায় সাড়ে চৌদ্দশ বছর পূর্বে এই মহান ধর্মকে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীর বুকে অসীম ত্যাগ-তিতিক্ষার বদৌলতে প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর উপস্থিতির ফলে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে দ্বীন সম্পর্কে কোন মতানৈক্য দেখা দেয় নি। কোন ব্যাপার জানতে হলে তাঁরা সরাসরি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তা জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে পারতেন। হুযুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর ইন্তিকালের পর থেকে ইসলাম সমগ্র 'পুরাতন সভ্যতার' পৃথিবীব্যাপী ব্যাপক গতিতে বিস্তৃত হতে থাকে। ফলে বিভিন্ন জাতি ও ভাষাভাষী মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেয়। সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুম- এর যুগ অতিবাহিত হওয়ার পর দ্বীনকে চিরদিন সংরক্ষিত রাখার লক্ষ্যে একাধিক গুণিজনের আবির্ভাব ঘটে। এদেরকে আমরা 'সালফে সালিহীন' বলে অভিহিত করি। এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ চারজন হলেন ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ ও ইমাম হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম।

দ্বীনকে লিখিতভাবে সম্পূর্ণরূপে সুসংহত ও শাশ্বত রাখার লক্ষ্যে এসব মহাত্মন ইমাম সারাজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করে গিয়েছেন। এদেরই নামানুসারে মুসলিম বিশ্বে ইসলামী ফিকহের ক্ষেত্রে চারটি মাজহাব সৃষ্টি হয়েছে। যে কোন মানুষ সঠিকভাবে দ্বীন পালনে এই চারটি মাজহাবের যে কোন একটি যদি অনুসরণ করে নেয়, তবেই সে সফল হবে। চার ইমামদের মধ্যে মাসআলার

ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য বিদ্যমান থাকায়ই চারটি আলাদা মাজহাবের জন্ম নিয়েছে। কিন্তু প্রত্যেকটি মাজহাবই দ্বীন ইসলামের মূল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং পার্থক্য থাকলেও সবগুলো কুরআন ও সুন্নাহর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

আমরা জানি বিভিন্ন নামদারী বাতিল দল, গোষ্ঠি, ফিরকা ইত্যাদির আবির্ভাব অতীতে ঘটেছে। খারিজী, মু'তাজিলা, কারামাতী, মুরজী, শিয়া ইত্যাদি দল ও ফিরকার কথা কে না জানে। তবে লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হলো প্রত্যেক যুগেই একদল হক্বপন্থী এসব ফিরকা-ফিতনার মুখোশ উন্মোচন করে গিয়েছেন, ফলে এগুলো সাময়িকভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করলেও স্থায়িত্বলাভে ব্যর্থ হয়েছে। বলতে পারেন শিয়া মতবাদ আজো বিদ্যমান আছে। এটা ঠিক- কিন্তু ইরান ও ইরাক ছাড়া এই মতবাদপন্থীদের সংখ্যা পৃথিবীর অন্যত্র তেমন নেই। এছাড়া এই মতবাদ থেকে কিছু চরমপন্থীদের আবির্ভাব ঘটেছে যারা মুসলিম উম্মাহ্ থেকে আলাদা হয়ে পড়েছে। এদেরকে যুগের উলামায়ে কিরামের সর্বসম্মত মতৈক্যের ভিত্তিতে 'অমুসলিম' বলে ঘোষণা করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কাদিয়ানী, ইসমাঈলী ও বাহায়ীদের কথা বলা যেতে পারে। এদের মূল অনেকের মতে শিয়া সম্প্রদায়। কিন্তু এদেরকে পুরো মুসলিম বিশ্বে 'অমুসলিম' হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে।

আধুনিক এ যুগে আরো কিছু নতুন ফিতনার জন্ম হয়েছে। এগুলোর মধ্যে 'গায়র মুকাল্লিদ' তথা মাজহাব বিরোধী তিনটি দল অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে মুসলিম উম্মাহ্কে দিগভ্রান্ত করে যাচ্ছে। এ তিনটি দলের মধ্যে অধিকাংশ হক্বপন্থী আলিমের মতে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর যে দলটি তার নাম হলো 'গায়র মুকাল্লিদ সালাফিবাদ'।

'সালাফি' শব্দের অর্থ হলো 'পূর্ববর্তী যুগের মুসলমান'- অর্থাৎ 'সালফে সালিহীন'। সুতরাং সালাফি তারা যারা ইসলামকে সঠিকভাবে পালন করে পৃথিবী থেকে বিদায় হয়েছেন। এ হিসাবে ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম সালফে সালিহীনের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

আধুনিক যুগের কিছু লেখক-গবেষকের অনুসারীরা এই 'সালাফি' শব্দকে নতুন ধাঁচে সাজিয়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পেয়েছেন। তারা 'হক্ব' একটি শব্দকে 'বাতিল ফিরকা' প্রতিষ্ঠার কাজে লাগাচ্ছেন। এই দলটি

জামালউদ্দীন আফগানীর (১৮৩৯-১৮৯৭) শিষ্য মুহাম্মদ আবদুহর (১৮৪৯-১৯০৫) অনুসারী। আজ থেকে শত বছর পূর্বে এই নতুন ফিরকার আবির্ভাব। ঠিক অতীতে যেভাবে অনুরূপ দলের আবির্ভাবকালে দাবী ছিলো, এ দলেরও মৌলিক দাবী হলো:

দ্বীনকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর থেকে কেউই সঠিকভাবে বুঝতে পারেন নি! [তবে তারা বুঝেছেন ঠিকই!]

উলমায়ে কিরাম এ যুগের চারটি 'লা-মাজহাবী' মতবাদ সনাক্ত করেছেন যেগুলো উম্মাহ্‌র অভ্যন্তরে অবস্থান করে ভেতর থেকে বিরাট ক্ষতিসাধন করছে। এই চার মতবাদ হলো: ১. ওয়াহ্‌হাবীবাদ, ২. সালাফিবাদ, ৩. আহলে হাদিসবাদ ও ৪. মওদূদীবাদ। এদের মধ্যে সর্বাধিক মারাত্মক মতবাদটির নাম 'সালাফিবাদ'। এ গ্রন্থে চরম 'লা-মাজহাবী' এই ভ্রান্ত মতবাদ, চার মাজহাবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক তাদের অনেক আক্বীদা-বিশ্বাস ও আমলের উপর বিস্তারিত আলোচনা ও এগুলো বাতিল হওয়ার প্রমাণাদি তুলে ধরা হয়েছে। সাথে সাথে চার মাজহাবের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা ও দালিলিক প্রমাণাদি উন্মোচন করা হয়েছে।

সালাফিদের কর্তৃক 'দ্বীনের দাওয়াত' প্রচারের নামে নিজেদের আলাদা আক্বিদা-বিশ্বাসে মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করার কলা-কৌশলের একটি নমুনা নিচে তুলে ধরছি।

সাধারণ মানুষকে বোকা বানানোর কৌশল

সালাফিরা সাধারণ শিক্ষিত (এবং অশিক্ষিত) মুসলিম সমাজকে বোকা বানিয়ে তাদের মতবাদপন্থী বানানোর পাঁয়তারা চালাচ্ছেন। পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের সুন্দর সুন্দর উদ্ধৃতি দিয়ে তারা মানুষকে কৌশলে তাদের দলভুক্ত করে থাকেন। কুরআন, হাদিস ও বিশেষ করে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দ্বীন সম্পর্কে প্রতারণামূলক কৃত্রিম প্রশ্ন-উত্তর তৈরি করে তারা আধুনিক শিক্ষিত মুসলমান ও এমনকি নতুন প্রজন্মের তালিবে ইলম্‌দের 'বোকা বানিয়ে' তাদের দলভুক্ত করেন। নিম্নে প্রমাণস্বরূপ একটি তথ্য তুলে ধরছি।

চার মাজহাবের আলো

ইংল্যান্ডের ইপসুইস নামক শহরে সালাফিদের প্রতিষ্ঠিত 'মারকাযুদ-দাওয়াহ' নামক একটি সংস্থা থেকে প্রকাশিত লিফলেটে লিখা আছে:

প্রশ্ন: আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীনকে অনুসরণ করেন নাকি 'ইমাম আবু হানীফার' দ্বীনকে অনুসরণ করেন?

এই প্রশ্নের মধ্যে লুকিয়ে আছে বিরাট একটি প্রতারণা। আপনি তো জবাব দিতে বাধ্য যে, আমি অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীনকে অনুসরণ করি। তখন ঐ সালাফি আক্বীদার অনুসারীরা আপনার অন্তরে বিষ ঢেলে দিয়ে বলবে: তাহলে মাজহাব অনুসরণ করবেন না-কুরআন-হাদিস অনুসরণ করুন। মাজহাব অনুসরণ মানে ইমামের অনুসরণ- যা শিরক!!

সালাফিদের উক্তরূপ প্রতারণামূলক প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারলে কিন্তু তাদের মুখে কুলুপ লেগে যাবে। এ সম্পর্কে দু'টি প্রসিদ্ধ বর্ণনা এখানে তুলে ধরছি। সালাফিদের উক্তরূপ কূটপ্রশ্নের সমুচিত জবাব দিতে এই বর্ণনাগুলো দিক-নির্দেশনা হিসাবে কাজ করতে পারে।

দ্বিতীয় উমর নামে খ্যাত, হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজীজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [৬১/৬৩ - ১০১ হি.] এর নিকট তাক্বদীরের উপর অবিশ্বাসকারী একদল লোক এসে বললো, দেখুন- কুরআন শরীফের এই-এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, তাক্বদীরের উপর বিশ্বাস রাখা আদৌ জরুরী নয়। তিনি এর জবাবে বলেছিলেন:

لَقَدْ قَرَأُوْا مَا قَرَأْتُمْ وَعَلِمُوْا مِنْ تَأْوِيْلِه مَا جَهِلْتُمْ وَقَالُوْا بَعْدَ ذَلِكَ كُلِّه بِكِتَابٍ وَقَدْرٍ

অর্থাৎ: ***[সাহাবী ও তাবিঈনগণ] পবিত্র কুরআনের সেসব আয়াতও পড়েছেন যা তোমরা পড়েছো। কিন্তু তাঁরা সেগুলোর মর্ম বুঝেছেন, আর তোমরা বুঝো নি। তাঁরা সে সকল আয়াত পড়েও তাক্বদীরের স্বীকৃতি দিয়েছেন।***[১]

[১]দরসে কুরআন সিরিজ, খণ্ড ৩০, মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ, পৃ: ৩৪৪-৩৪৫।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী শায়খ আহমদ সিরহিন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [৯৭১-১০৩৪ হি.] একটি চিঠিতে বলেন:

"হে সত্য পথের পথিক! মনে রেখো, কুরআন-হাদিসের আলোকে আমাদের আক্বীদা-বিশ্বাস দুরস্ত করা জরুরী। হক্কানী আলিম সমাজ কুরআন-হাদিস অধ্যয়ন করে তা থেকে যে পদ্ধতিতে আক্বীদা-বিশ্বাস আহরণ করেছেন, আমাদেরকে সে পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। মনে রেখো আমাদের বুঝা যদি তাঁদের বুঝার বিপরীত হয়, তাহলে আমাদের বুঝ গ্রহণযোগ্য নয়। বস্তুত বিদআতপন্থী ও গোমরাহ লোকেরা নিজেদের ভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাস ও আমল-আখলাককে সঠিক সাব্যস্ত করার জন্যে কুরআন-হাদিসেরই বরাত দেয়। অথচ সেগুলো কুরআন-হাদিস থেকে বহু দূরে।" [মাকতুব নং ১৫৭ - পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, পৃ: ৩৪৫]

সবশেষে আমরা আল্লাহর পবিত্র দরবারে আকুল আবেদন জানাচ্ছি, লা-মাজহাবীরা আমাদেরই আপনজন, মুসলিম ভাইবন্ধু। তিনি যেনো তাদেরকে মাজহাবের আলোর দিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। এই গ্রন্থখানা পাঠ করে যদি তারা নিজেদের ভুল-ত্রুটি অনুধাবন করে নেন এবং সংশোধনের পথে পা বাড়ান তাহলে আমাদের প্রচেষ্টা স্বার্থক হবে। একই সময় আমরা আল্লাহর দরবারে এটাও কামনা করি যে, যারা তাক্বলিদ করেন তারাও যেনো গ্রন্থখানা পাঠ করে বুঝতে সক্ষম হন যে, মাজহাবের অনুসরণ সঠিকভাবে করলে দ্বীনকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি মুতাবিক অসুসরণ করা হবে। মাজহাব বিরোধী কারো মন্তব্য ও মতামতকে উপেক্ষ করবেন জ্ঞানের আলোকে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দিন। আমীন।

সম্পাদনা পরিষদ

পরিচ্ছেদ - ১

ওয়াহাবী-সালাফিদের মতামতসমূহের খণ্ডন

ওয়াহাবী থেকে সালাফিদের অবির্ভাব ঘটেছে। তবে ওয়াহাবী নামটি এখন আর তেমন প্রযোজ্য নয়। কারণ তাদের চিন্তা-চেতনাকে আজ যারা আন্দোলনে পরিণত করে পুরো মুসলিম উম্মাহ্‌র মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছেন তারা নিজেদেরকে 'সালাফি' হিসাবে পরিচয় দিয়ে থাকেন। উভয় দলের ঈমান-আক্বীদা, আমল ও কর্মকাণ্ড এক ও অভিন্ন। তবে আগের যুগের ওয়াহাবীদের তুলনায় তাদের উত্তরসূরী সালাফিদের কর্মকাণ্ড আরো মারাত্মক এবং সার্বিকভাবে ইসলাম ও উম্মাহ্‌র জন্য ভীষণ ক্ষতিকর। একটু পরই প্রমাণসহ এর কারণ আমরা উন্মোচন করবো।

সালাফি গায়র মুকাল্লিদদের বাতিল চেষ্টা-সাধনা ও মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য সর্বাধিক ক্ষতিকর বিষয় মূলত তিনটি। এগুলো হলো:

ক. তাফকিকু মাজাহিবিল আইম্মা: আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতভূক্ত চার ইমাম প্রবর্তিত চারটি মাজহাব ধ্বংসের চেষ্টা।

খ. তাজসিমুল মা'বুদ: তারা বিশ্বাস করে আল্লাহর 'দেহ আছে'। আসলে এর দ্বারা তারা মুসলমানদের চিরন্তন আক্বীদা 'আল্লাহ নিরাকার' এটা নষ্ট করে দিচ্ছেন।

গ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আসহাবে কিরামের পবিত্র ব্যক্তিত্বের প্রতি ধৃষ্টতাপূর্ণ অশ্রদ্ধা পোষণ।

তারা প্রথমোক্ত আক্রমণ দ্বারা আমাদের পূর্বসুরী ও বর্তমান সুন্নী আক্বাঈদ ও ফিকাহ শাস্ত্রের ইমামদের উপরই আক্রমণ করেছেন। এসব মহাত্মনের মধ্যে আছেন ইমাম আশ'আরী ও ইমাম মাতুরিদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আক্বাঈদ সংক্রান্ত সর্বজনগৃহীত কালাম শাস্ত্র। মাজহাবের চারজন প্রসিদ্ধ ইমাম: ১. ইমাম আবু হানিফা, ২. ইমাম মালিক, ৩. ইমাম শাফিঈ ও ৪. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম। এছাড়া তাদের আক্রমণের শিকার হয়েছেন ইসলামী আখলাক্ব ও

নীতিনৈতিকতা এবং তাযকিয়ায়ে নফ্স শাস্ত্র তথা তাসাওউফের ইমাম মহাত্মন আক্বতাব (কুতুবগণ) হযরত জুনায়িদ বাগদাদী, হযরত আবদুল কাদির জিলানী, হযরত ইবনুল আরবী, আবুল হাসান শাজিলী, ইমাম রিফায়ী; চিশতী শায়খদের মধ্যে হযরত আবু ইসহাক শামী চিশতী ও হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী, নকশবন্দীয়া তরীকার প্রতিষ্ঠাতা হযরত শাহ বাহাউদ্দীন নকশবন্দ ও হযরত আহমদ সিরহিন্দ মুজাদ্দিদে আলফে সানী, হযরত শিহাবুদ্দীন সুহরাওয়ার্দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমুখ মাশায়েখ ও তাঁদের অনুসারী অসংখ্য উলামা-মাশায়েখ।

ইসলামের আবির্ভাব কাল থেকে আজ পর্যন্ত সকল পর্যায়ের অসংখ্য মুসলমানের আক্বীদা হলো 'আল্লাহ এক এবং নিরাকার, সৃষ্ট কোন বস্তুর সঙ্গে তাঁর তুলনা নেই'। গায়র মুক্বাল্লিদ সালাফিরা 'আল্লাহর দেহ আছে, তাঁর হাত, পা, মুখ, চোখ ইত্যাদি আমরা যেভাবে বুঝি সেরূপই আছে। তিনি কুরসীতে বসে আছেন, তিনি উপরে উঠেন, নীচে নামেন, একটি নির্দিষ্ট স্থানে তিনি আছেন'- ইত্যাকার মারাত্মক কথা দ্বারা মুসলমানদের আক্বীদা বিনষ্ট করে দিচ্ছেন। আল্লাহর 'জিস্‌ম' আছে বলা মূলত জিন্দা মূর্তি হিসাবে আল্লাহকে ধারণার নামান্তর- নাউযুবিল্লাহ!

তারা আমাদেরকে মাজহাবের অনুসরণের কারণে 'অন্ধ অনুসারী' বলে গালি দেন। সুন্নী আশ'আরী ও মাতুরিদী আক্বীদার উপর আস্থাশীল সকল মুকাল্লিদকে তারা 'জাহমি' অর্থাৎ 'আল্লাহর গুণাবলীর অস্বীকারকারী' বলেন। আর যে কেউ সুফি পথের অনুসারী অর্থাৎ পীর-মুরীদির সঙ্গে সম্পৃক্ত সে হলো তাদের মতে, "শায়খ উপাসনাকারী"!

গায়র মুকাল্লিদ সালাফিদের সকল বিভ্রান্তি ও বাতিল আক্বীদা এবং মতবাদ উক্ত তিনটি বিষয়কে ঘিরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাদের সকল আক্বীদাই মূলত এ তিনটির শাখা-প্রশাখা। ইনশাআল্লাহু তা'আলা, আমরা এখন একে একে তাদের উক্ত বিভ্রান্তি ও আক্বীদাসমূহ খণ্ডন করবো।

وما توفيقى إلا بال

১. চার ইমামের অনুসরণ করেন না- এমন ব্যক্তিকে বলে 'গায়র মুকাল্লিদ'। আজকাল ইসলামের অভ্যন্তরস্থ ফিতনাবাজ ফিরকা যেমন: 'আহলে হাদিস', 'সালাফি', 'মওদুদীবাদী'[২] ও 'ওয়াহাবী' এরাও গায়র মুকাল্লিদদের অন্তর্ভুক্ত। সালাফিরা কোন বিশেষ মাজহাব অনুসরণ করেন না বরং তারা বলেন, কোনো বিশেষ ইমামকে অনুসরণ হলো শিরক ও বিদআত।[৩]

তাদের এই বিভ্রান্তি ও আক্বীদার খণ্ডন:

কুরআন-সুন্নাহর সঠিক ব্যাখ্যাদাতা চার বিখ্যাত 'মুজতাহিদ' ইমামের অনুসারীদেরকে মুকাল্লিদ (অনুসরণকারী) বলে। এই চার ইমাম হলেন হযরত ইমামে আজম আবু হানিফা (৮০-১৫০ হিজরী), হযরত ইমাম ইদ্রিস শাফিঈ (১৫০-২৪০ হিজরী), হযরত ইমাম আনাস বিন মালিক (৯১-১৭৭ হিজরী) ও হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১ হিজরী) রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম। মুকাল্লিদকে মাজহাবপন্থীও বলে।

মাজহাব অর্থ কি?

তাক্বলিদ সম্পর্কে সালাফিরা নানান অভিযোগ তুলেন। তারা সাধারণ মানুষকে প্রশ্ন করেন, 'আপনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে না আবু হানিফাকে অনুসরণ করেন?' এরূপ প্রশ্ন শুনে যে কোনো সাধারণ মানুষ অবশ্যই বিভ্রান্ত হবেন। কারণ এ প্রশ্নে লুকিয়ে আছে এক মারাত্মক ভ্রান্তি। আসলে এরূপ প্রশ্নই বিভ্রান্তিমূলক। মানুষকে বোকা বানানোর কৌশল মাত্র। যেমন: আপনাকে কেউ জিজ্ঞেস করলো: 'আজ সোমবার না জানুয়ারী মাস?' অথবা: 'আপনি ঢাকা না বাংলাদেশে বসবাস করেন?'। এ ধরনের প্রশ্ন কি সঠিক হলো? ভাষাগত দিক থেকে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু প্রশ্নে লুকিয়ে আছে বোকা বানানোর কৌশল।

---

[২]মওদুদী নিজেই বলেছেন, তিনি কোন ইমামের অনুসরণ করেন না। তবে আমরা এটাও বলছি, সকল মওদুদীবাদী লা-মাজহাবী না-ও হতে পারেন।

[৩]ইন্টারনেটসহ তাদের অসংখ্য লেখা, বই ও বক্তৃতায় তারা এসব কথা বলে।

সুতরাং সালাফিদের উপরোক্ত প্রশ্ন, 'আপনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে না আবু হানিফাকে অনুসরণ করেন?' একটি ভ্রান্ত প্রশ্ন। এর মূলে মানুষকে বোকা বানানোর অপকৌশল বিদ্যমান। আপনি যদি এদের দৌরাত্ম্য সম্পর্কে অবগত হয়ে থাকেন, তাহলে অবশ্যই সমুচিত জবাব দিতে পারবেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তো এদের আসল চেহারা দেখেন নি।

মাজহাবপন্থী হওয়ার মানেই হলো 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের' অন্তর্ভুক্ত হওয়া। চার মাজহাব নিয়েই পুরো ইসলাম ও এর অনুসরণ সীমাবদ্ধ- এর বাইরে যা আছে সবই পথভ্রষ্টতা ও বিভ্রান্তি। গায়র মুকাল্লিদ হওয়ার অর্থ হলো ইসলামের বৃত্ত থেকে বাইরের দিকে পা বাড়ানো। আমরা এক্ষুণি শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (১৭০৩ - ১৭৬২ ঈ) রাহমাতুল্লাহি আলাইহির অভিমত তুলে ধরবো। এ থেকেই সকলে অবগত হবেন, মাজহাবের অনুসরণ ত্যাগ করা কতো মারাত্মক।

তাক্বলিদ সম্পর্কে শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির অভিমত

হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন:

১. সাহাবা ও তাবিঈনের পবিত্র যুগে তাক্বলিদ প্রচলিত ছিলো। এ ব্যাপারে কেউ অভিযোগ তুলেন নি।

২. চার মাজহাবের যে কোন একটি অনুসরণ করা মানেই হলো 'হাক্বিকাতের' অনুসরণ। আর অনুসরণ না করার নাম হলো 'হাক্বিকাত' থেকে দূরে সরে পড়া।

৩. দ্বিতীয় হিজরী শতকের পর থেকেই 'তাক্বলিদে শাখসী' শুরু হয়।

৪. এটা ছিলো 'ইলহামী' নির্দেশনার অন্তর্ভুক্ত।

৫. চার মাজহাবের যে কোন একটির অনুসরণ উম্মাতের জন্য ওয়াজিব।

৬. যে কোন অ-মুজতাহিদ ব্যক্তির জন্য তাক্বলিদ করা ওয়াজিব।

৭. তাক্বলিদ করার মধ্যে দ্বীনি অনেক ফায়দা বিদ্যমান।

৮. চার মাজহাবের যে কোন একটির প্রতি সম্পৃক্ত থাকতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইঙ্গিতে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

৯. সকল মাজহাব সুন্নাতের উপর প্রতিষ্ঠিত যার স্বীকৃতি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইঙ্গিতে দিয়েছিলেন।

১০. অ-মুজতাহিদ যে কোন সাধারণ ব্যক্তির জন্য তাক্বলিদ প্রত্যাখ্যান হারাম। তাক্বলিদ প্রত্যাখ্যানের অর্থ হলো ইসলাম থেকে বের হওয়ার প্রথম পদক্ষেপ।[৪]

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসারী কারা

আজকাল বেশ ক'টি ফিরকার আবির্ভাব ঘটেছে। এদের মধ্যে আহলে-কুরআন, আহলে-হাদিস, গায়র মুকাল্লিদ, শিয়া, কাদিয়ানী, বিদআতী, মওদুদী এবং সালাফি ইত্যাদি এখানে উল্লেখযোগ্য। এদের অধিকাংশ আবার আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভুক্ত নয়। কোন কোন দল যেমন কাদিয়ানী, তো ইসলামের বাইরে অবস্থান করছে। তবে সর্বাধিক মারাত্মক যে গ্রুপটি ইসলামের অভ্যন্তরে থেকে তাদের ভ্রান্ত আকীদা খুব তোড়জোড়ে প্রচার করে যাচ্ছে তারা হলো সালাফি। আর এরা মাজহাব ও তাক্বলিদের ঘোর বিরোধী। এরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বাইরে অবস্থান করছে। কারণ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতপন্থীরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর দৃঢ়বিশ্বাসী। কিন্তু সালাফিরা এগুলোর কোনোটা মানে আর কোনোটা মানে না।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতপন্থীরা এই চারটি বিষয়ের উপর সম্পূর্ণ আস্থাবান:

১. কুরআন শরীফ

২. হাদিস শরীফ

৩. ক্বিয়াস

৪. ইজমা

[৪]শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহ. 'ফুইউদ্দুল হারামাইন', পৃ: ৪৮।

গায়র মুকাল্লিদ সালাফিদের ভিত্তিহীন অভিযোগ

সালাফিরাসহ গায়র মুকাল্লিদগণ বক্তৃতা ও লেখার মাধ্যমে প্রচার করেন, মুকাল্লিদরা বিদআতী এমনকি শিরক ও কুফরের মধ্যে লিপ্ত আছেন। তারা প্রকৃত সালফে সালিহীনের অন্তর্ভুক্ত আইম্মায়ে মুজতাহিদীনকে (চার ইমামকে) পর্যন্ত কঠোর ভাষায় সমালোচনা করে থাকেন। বিশেষ করে ইমামে আজম হযরত আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বিরুদ্ধে তারা অত্যধিক বিষোদগার করে থাকেন। এর মূল কারণ হলো, অন্যান্য মাজহাবপন্থীদেরকে অতি সহজে তারা 'সালাফি দাওয়া'র মাধ্যমে পথভ্রান্ত করতে সক্ষম হলেও, হানাফীদের পথভ্রান্ত করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুরো মুসলিম উম্মাহ্‌র প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ এই মাজহাবের অনুসারী হওয়ায় এদের মধ্য থেকে সৃষ্টি হচ্ছেন যুগ যুগ ধরে উচ্চ পর্যায়ের হক্কানী উলামায়ে কিরাম। এরা মানুষকে সর্বদাই সঠিক দিকনির্দেশনা করে যাচ্ছেন।

সুন্নাত না হাদিস

সালাফিরা আরেক বিভ্রান্ত ছড়াচ্ছেন সাধারণ মানুষের মধ্যে। তারা প্রশ্ন করেন, 'আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস না সুন্নাতের অনুসারী?' তারা শ্রোতাকে এটাই বিশ্বাস করাতে চান যে:

১. 'হাদিস এসেছে শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' থেকে। কিন্তু সুন্নাত নয়।

২. সুন্নাত অন্য জিনিষ।

সুতরাং কেউ যদি বলেন, আমি সুন্নাত অনুসরণ করি তাহলে উপরোক্ত 'সালাফি' মতে তিনি হাদিসের অনুসরণ করছেন না! কিন্তু ব্যাপারটি তো এরকম নয়। যে কোনো ব্যক্তিকে বুঝতে হবে যে:

১. রাসূলুল্লাহর সুন্নাত মানেই হাদিস শরীফ।

চার মাজহাবের আলো

২. হাদিসে যা আছে তার দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'যাবতীয়' সুন্নাত বুঝাচ্ছে না।

৩. শুধু হাদিসের উপর আমলের নামই পুরো দ্বীন অনুসরণ নয়।

৪. আর নবীজীর সুন্নাত ও হাদিসের উপর আমল করার নামই হলো পুরোপুরিভাবে দ্বীন অনুসরণ। কারণ পবিত্র কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা হলো সুন্নাতে নববী এবং হাদিস শরীফ। আর এই দু'টোর সঠিক ব্যাখ্যার নামই চার মাজহাব।

উপরোক্ত বিষয়গুলো সকলকে বুঝতে হবে। আর সঠিকভাবে বুঝে নিলে বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

প্রথমে সুন্নাত, হাদিস না মাজহাব

সালাফিরাসহ গায়র মুকাল্লিদরা বলেন, মাজহাব অনুসরণ করলে হাদিস সঠিকভাবে অনুসরণ হয় না। আর তাদের মধ্যে অধিক অজ্ঞদের ধারণা, সুন্নাত অনুসরণে হাদিসের প্রতি উপেক্ষা করা হয়। এরূপ অভিযোগ অবশ্য গোঁয়ার্তুমি ও অজ্ঞতার মিশ্রণের ফলে তারা করে থাকে।

দ্বীনি আইন-কানুন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞানী ব্যক্তি মাত্রই কিন্তু উপরোক্ত অমূলক অভিযোগ ও দাবী সম্পর্কে অবগত থাকবেন। একটি প্রণালীবদ্ধ, সুচিন্তিত উপায়-অবলম্বন ও পদ্ধতিতে আমাদের পূর্বসুরী মহাত্মন ইমামরা দ্বীনকে সবার জন্য সঠিকভাবে অনুসরণযোগ্য করে রেখে গেছেন। পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদিস শরীফ হলো এই সুচিন্তিত পদ্ধতির মূল। গায়র মুকাল্লিদরা যেসব প্রশ্ন 'আজ' উত্থাপন করছেন, এসব ব্যাপারে মহাত্মন আইম্মায়ে মুজতাহিদীন ও তাঁদের অনুসারীরা সম্পূর্ণরূপে অবগত সে যুগেও ছিলেন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায়ই দ্বীন পরিপূর্ণতা লাভ করে। দ্বীনের যাবতীয় মৌলিক বিষয় তখনই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

-"আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।" [সূরা মায়িদাহ : ৩]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবী থেকে বিদায় হওয়ার পূর্বে আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাহ এবং আসহাবে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুমকে রেখে যান। [মুসতাদরাকে হাকিম, খ.১, পৃ: ৯৩] সাহাবায়ে কিরামের প্রতি স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাও সন্তুষ্ট। তিনি ইরশাদ করেন:

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

-"আর যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনসারদের মাঝে পুরাতন, এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ সে সমস্ত লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কাননকুঞ্জ যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত প্রস্রবণসমূহ। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটাই হল মহান কৃতকার্যতা।" [সূরা তাওবাহ : ১০০]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবাদেরকে 'ইসলাম' ও 'অনৈসলাম' এর মাপকাঠি করেছেন। তাঁদের অনুসরণ মানেই দ্বীনের সঠিক অনুসরণ। আর তাঁদের অনুসরণ না করাই হলো ভ্রষ্টতা ও গোমরাহী। তিনি বলেন:

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ

-"তোমরা আমার সুন্নাহকে আকড়ে ধরবে এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদীনকে অনুসরণ করবে"। [মুসতাদরাকে হাকিম; তিরমিযি; ইবনে মাজাহ; আবু দাউদ]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন:

أصحابى كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم

"আমার সাহাবীরা আকাশের নক্ষত্র সদৃশ। যাকেই তোমরা অনুসরণ করবে, সঠিক পথে থাকবে।" [মিশকাত, রাজীন]

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম তাঁর আসহাবে কিরামকে সমালোচনা করতে নিষেধ করেছেন। হাদিস শরীফে আছে:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهَ اللهَ فِي أَصْحَابِي اللهَ اللهَ فِي أَصْحَابِي لَا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِي فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللهَ وَمَنْ آذَى اللهَ يُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ

-হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম বলেন. "আমার সাহাবার ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, আমার সাহাবার ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। আমার পরে আমার সাহাবাদেরকে সমালোচনার লক্ষ্য বানিয়ো না। যে ব্যক্তি তাদেরকে মুহাব্বত করল, সে আমার প্রতি মুহাব্বতের কারণেই করল। আর যে ব্যক্তি তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করল, সে আমার প্রতি বিদ্বেষের কারণেই করল। যে তাদেরকে কষ্ট দিল, সে আমাকে কষ্ট দিল। আর যে আমাকে কষ্ট দিল, সে আল্লাহকে কষ্ট দিল। আর যে আল্লাহকে কষ্ট দিল সে অচিরেই পাকড়াও হবে।" [তিরমিযি]

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পরই ইসলাম খুব দ্রুত বিস্তার লাভ করে বিশ্বের সর্বত্র। দু'টি প্রাথমিক যুগ অতিক্রান্ত হলো: নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামের যুগ। শেষোক্ত

যুগের শেষের দিকে ইমামে আজম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বেড়ে ওঠেন। তাঁর জন্ম হয় ৮০ হিজরীতে। তখনো বেশ কয়েকজন সাহাবা জীবিত ছিলেন। তিনি তাঁদের সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হন। এই যুগেই শুরু হয় নিয়মতান্ত্রিকভাবে ফিকাহ শাস্ত্রের উপর গবেষণা। দ্বীনি প্রতিটি বিষয়ের উপর ব্যাপক ইজতিহাদী গবেষণার এই যুগে অসংখ্য মহাত্মন আলিম-উলামা, ফুকাহা, মুহাদ্দিসীন ও ইমামগণ অংশগ্রহণ করেন। আর সকল গবেষণাই সর্বোচ্চ তাক্বওয়াহ, পরহেজগারীর উপর নির্ভরশীল ছিলো। পবিত্র সূত্রদ্বয় তথা কুরআন-হাদিসের পরিপন্থী একটিও সিদ্ধান্ত যাতে চলে না যায় সে ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেন গবেষকরা। প্রত্যেক গবেষকের ব্যক্তিগত জীবনের উপর অধ্যয়ন করলে আশ্চর্য হতে হয় তাঁদের তাক্বওয়াহ, পরহেজগারী, ইবাদত-বন্দেগীর মাত্রা, সত্যবাদিতা, উচ্চ পর্যায়ের মেধা, স্মরণশক্তির বর্ণনা শুনে। একেকজন ইমাম লক্ষ লক্ষ হাদিস মুখস্ত করে নিয়েছিলেন। এ যুগে বেশ কয়েকজন সাহাবায়ে কিরাম তো জীবিত ছিলেনই, এছাড়া অসংখ্য তাবিঈ জীবিত থাকায় তাঁদের পবিত্র মুখ থেকে মুহাদ্দিসীনে কিরাম ও ইমামরা সরাসরি অনেক হাদিস শ্রবণ করেন ও লিপিবদ্ধ করে রাখেন।

আজকের গায়র মুকাল্লিদ সর্বোচ্চ পর্যায়ের আলিমও উপরোক্ত যুগের অতি সাধারণ পর্যায়ের কোনো আলিমের সঙ্গে তুলনা করারও যোগ্যতা রাখেন না। অথচ এরাই আবার আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের মতো মহাত্মনদের সমালোচনা করার ধৃষ্টতা দেখান!

ইমামে আজমের সময় একটি মাত্র মাসআলা নিয়ে ৪০ জন পর্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের আলিম গবেষণা, চিন্তা-ভাবনা ও তর্ক-বিতর্ক করতেন। এরপর সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছতেন, যা হতো সম্পূর্ণরূপে কুরআন-হাদিসের উপর নির্ভরশীল এবং সর্বমহলে গ্রহণযোগ্য। এভাবে উসূলে ফিকহের প্রতিটি দিক থেকে আলোচনা-সমালোচনা, গবেষণা ও অনুসন্ধানের পর তৈরী হয়েছে সর্বজন গ্রহণযোগ্য প্রায় তেরো লক্ষাধিক মাসআলা। অনুরূপ মাজহাবের অন্য তিনজন ইমামের যুগেও একইভাবে লক্ষ লক্ষ মাসআলা-মাসাইল লিপিবদ্ধ করা হয়। চার ইমামসহ যুগের লক্ষ লক্ষ উলামায়ে কিরামের এই সব চেষ্টাই বুঝি বিফলে যাবে আজকের অপরিপক্ক কিছু গায়র মুকাল্লিদদের ধৃষ্টতার কারণে? কখনোই নয়। সালাফিদের দৌরাত্ম্য থেকে মুসলিম উম্মাহ্ অবশ্যই একদিন রেহাই পাবে। টাকার জোরে কখনো বাতিলকে প্রতিষ্ঠা করা যায় না- করা যায়

নি ইসলামের দীর্ঘ ইতিহাসব্যাপী। তবে আমরা যারা হক্বকে আকড়ে ধরেছি, তাদের দায়িত্ব বিরাট। গায়র মুকাল্লিদদের কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আহলে হাদিসবাদ, সালাফিবাদ, মওদুদীবাদ, ওয়াহাবীবাদ ইত্যাদি বাদ-মতবাদের ভ্রান্তিসমূহ সনাক্ত করে সকলকে সতর্ক করা একান্ত জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন আর অলসভাবে বসে থাকলে চলবে না।

চারটি প্রাথমিক যুগে আমাদের দ্বীন সম্পূর্ণরূপে গ্রন্থাকারে পূর্ণতা লাভ করে। এ যুগগুলো হলো:

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ।

২. সাহাবায়ে কিরামের যুগ।

৩. ফিকহের ইমামদের যুগ।

৪. হাদিস সংকলক মুহাদ্দিসীনের যুগ।

উপরে উল্লিখিত শেষোক্ত যুগে সিহা সিত্তার সংকলন করেন ছ'জন উচ্চ পর্যায়ের মুহাদ্দিস ও গবেষক। এরা হলেন:

১. ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (১৯৪-২৫৬ হি.) - বুখারী শরীফের সংকলক।

২. ইমাম মুসলিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (২০৪-২৬১ হি.) - মুসলিম শরীফের সংকলক।

৩. ইমাম ইবনে মাজাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (২০৯-২৭৩ হি.) - ইবনে মাজাহ শরীফের সংকলক।

৪. ইমাম আবু দাউদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (২০২-২৭৫ হি.) - আবু দাউদ শরীফের সংকলক।

৫. ইমাম তিরমিযি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (২০৯-২৭৯ হি.) - তিরমিযী শরীফের সংকলক।

৬. ইমাম নাসাঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (২১৫-৩০৩ হি.) - নাসাঈ শরীফের সংকলক।

লক্ষ্য করুন, উপরোক্ত ইমামরা সকলেই ছিলেন ‘সালফে সালিহীনের’ অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ তাঁদের সকলেই হিজরী প্রথম চার শতকের মধ্যে জীবিত ছিলেন।

ইমামদের যুগে অনেক মুজতাহিদ পর্যায়ের গবেষক জীবিত ছিলেন এবং স্ব-স্ব মতামত অনুযায়ী ফিকাহ শাস্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু অবশেষে মাত্র চারটি ফিকাহ সর্বজন গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে এবং আজ পর্যন্ত অনুসৃত হয়ে আসছে। এই চারটিই হলো হানাফী, শাফিঈ, মালিকী ও হাম্বলী মাজহাব। অতি সাম্প্রতিককালে গায়র মুকাল্লিদদের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত সকল মুসলমান যুগ যুগ ধরে এই চারটি মাজহাবের যে কোন একটি অনুসরণ করে এসেছেন। কী আশ্চর্যের ব্যাপার, গায়র মুকাল্লিদ সালাফিদের অপরিপক্ক ও ভ্রান্তিমূলক যুক্তির ফাঁদে পড়ে আজ অনেক মুসলমান মাজহাব ছেড়ে ‘দ্বীনি লাওয়ারিশ’ হয়ে পড়লেন! এরা একবারও ভাবলেন না যে, মহাত্মন আইম্মায়ে মুজতাহিদীন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাজহাবসমূহে যদি কোন ভ্রান্তি থাকতো তাহলে ১২-১৩ শত বছর যাবৎ তা অবশ্যই টিকে থাকতে পারতো না। প্রত্যেক যুগের বড় বড় উলামায়ে কিরাম, এমনকি ইমাম পর্যায়ের মহাত্মনরা পর্যন্ত বিনা প্রশ্নে তাক্বলিদ তথা মাজহাব অনুসরণ করে গেছেন এবং এখনও করছেন। এরা সকলেই বুঝি দিগভ্রান্ত! কী অযৌক্তিক উক্তি!

সালাফি ‘দাওয়ার’ প্রতি যারা আকৃষ্ট হন তাদের অধিকাংশই ‘সাধারণ’ শিক্ষিত কিংবা অশিক্ষিত মানুষ। এরা তো দ্বীন সম্পর্কে অত্যল্প জ্ঞান রাখেন। গায়র মুকাল্লিদ সালাফি ও মওদুদীবাদীরা কেনো এদের টার্গেট করে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছেন, তা পাঠকরা নিশ্চয়ই এখন বুঝতে পারছেন।

সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, ইমামদের গবেষণার ফসল সঠিকভাবে বিন্যস্তকরণ, লিপিবদ্ধকরণ ও প্রণালীবদ্ধকরণ শেষে মাজহাবের আবির্ভাব হয়। প্রত্যেক মাজহাব প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ের মুজতাহিদ তথা ‘মুজতাহিদ মতলক’-এর নামানুসারে নামকরণ লাভ করে। অতএব, আমরা এবার নিঃসংকোচে ঘোষণা করতে পারি, সুন্নাত আগে এসেছে এবং এরপর এসেছে মাজহাব। মাজহাব কুরআন-সুন্নাহের সঠিক ব্যাখ্যা। সবশেষে এসেছে গ্রন্থাকারে হাদিস সংকলন।

তাক্বলিদের উপর গায়র মুকাল্লিদ ভাইদের প্রশ্নাবলী ও এদের উত্তর

গায়র মুকাল্লিদ ভাইগণ তাক্বলিদের উপর প্রশ্ন করেন:

১. কুরআনে তাক্বলিদ আছে কি? ২. তাক্বলিদ হাদিস শরীফে আছে কি? ৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় তাক্বলিদ হয়েছে কি? ৪. খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে তাক্বলিদের প্রমাণ আছে কি? ৫. সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুম কোন্ মাজহাবের অনুসরণ করতেন? ৬. ইমাম মাহদী আলাইহিস্‌সালাম কোন্ মাজহাব অনুসরণ করবেন? ৭. হযরত ঈসা আলাইহিস্‌সালাম যখন আসবেন, তিনি কোন্ মাজহাবের অনুসারী হবেন?

উপরোক্ত প্রশ্নাবলী সাধারণ মানুষকে অবশ্যই বিভ্রান্ত করবে। আর গায়র মুকাল্লিদ সালাফি ভাইদের উদ্দেশ্যও হয়তো তা-ই। হয়তো তারা আশা করেন, এসব আপাতদৃষ্টিতে যৌক্তিক প্রশ্নবানে দ্বীন সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান নেই এমন মুসলিম জনতাকে তাদের মত ও পথের সদস্য বানাতে পারবেন। উক্ত প্রশ্নগুলো দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মাজহাবের গুরুত্ব ক্ষুন্ন করা। এমনকি মাজহাব অনুসরণ সঠিক কি না সে ব্যাপারে মানুষের মনে সন্দেহ সৃষ্টিও এই কৌশলের অন্তর্ভুক্ত!

আমরা সকল পাঠককে অনুরোধ জানাচ্ছি, পরবর্তী কথাগুলো খুব মনোযোগ সহকারে পাঠ করুন। গায়র মুকাল্লিদদের উপরোক্ত প্রশ্নগুলোর আসল উদ্দেশ্য আপনার নিকট এ থেকে সহজেই ধরা পড়ে যাবে। উন্মোচন হবে এই গোষ্ঠির আক্বিদা ও আমল সম্পর্কিত ভ্রষ্টতার স্বরূপ। কারণ, তাক্বলিদ ও মাজহাব দ্বীন ইসলাম অনুসরণের মূল পথ ও পাথেয়। ইসলামের আবির্ভাব থেকে আজ পর্যন্ত তাক্বলিদ করে আসছেন প্রায় সকল মুসলমান। এরা সবই ‘মারাত্মক ভুল’ করেছেন বলে দাবী তোলা, কখনো যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না।

উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরে দু’টি করে উপমা আমরা তুলে ধরবো। এ থেকেই গায়র মুক্বাল্লিদদের দাবীর অসারতা উন্মোচন হবে ইনশাআল্লাহ!

পবিত্র কুরআনে তাক্বলিদ

১. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

-"অতএব জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর, যদি তোমাদের জানা না থাকে।" [সূরা আম্বিয়া : ২১]

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এটাই সাধারণ নিয়ম। আপনি কিছু না জানলে, যে জানে এমন ব্যক্তির শরণাপন্ন হবেন। কেউ কি কোনোদিন রোগের চিকিৎসার জন্য গাড়ির মেকানিক্সের নিকট গিয়েছে? অপরদিকে আপনার গাড়ি মেরামতের জন্য কোনদিন কি ডাক্তারের কাছে যাওয়ার কল্পনাও করবেন? সুতরাং কে কতটুকু কোন্ বিষয়ে অভিজ্ঞ তা জেনে নেওয়ার পর আপনি উপযুক্ত ব্যক্তির শরণাপন্ন হবেন। আজকাল ডাক্তারদের মধ্যেও বিশেষজ্ঞ আছেন। কেউ হৃদরোগ, কেউ অর্থোপিডিক্স, কেউ বা স্ত্রীরোগ ইত্যাদি বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের মধ্যে আপনার সমস্যা মুতাবিক সিদ্ধান্ত নেবেন কার কাছে যাবেন।

অনুরূপ দ্বীনের ক্ষেত্রেও কিছু জানতে ও শিখতে চাইলে যে কোনো ব্যক্তির শরণাপন্ন হলে চলবে না। কোনো অজ্ঞ ব্যক্তির উপর কখনো কেউ ভরসা করতে পারেন না। সুতরাং আমরা যারা মুকাল্লিদ, দ্বীনের সঠিক ইলমের উপর নির্ভর করি। ঠিক যেভাবে কুরআনে নির্দেশিত হয়েছে, 'যারা জানে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, যদি তুমি না জানো', অর্থাৎ 'ফিকাহ শাস্ত্রের ইমামদের অনুসরণ করো'।

২. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

-"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা 'উলিল আমর' তাদের।" [সূরা নিসা : ৫৯]

রাইসুল মুফাস্সিরীন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা, হযরত মুজাহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রমুখ মহাত্মন 'উলিল আমর' দ্বারা ফকীহ মুজতাহিদ ইমাম উদ্দেশ্য বলেছেন।[৫]

এই আয়াতের উপর মুফাস্সিরীনে কিরাম মন্তব্য করেছেন:

১. খাইরুল কুরুনের সময় মুসলিম বিশ্বের শাসকবর্গও দ্বীনের উপর পারদর্শী, তথা মুজতাহিদ ছিলেন। যেমন হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত উসমান, হযরত আলী এবং হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহুম। তাঁরা একদিকে রাজনীতিক নেতা ছিলেন এবং অন্যদিকে ইসলামী যে কোন ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা রাখতেন।

২. কিন্তু খাইরুল কুরুন শেষে শাসকবর্গের দ্বীনি জ্ঞান ও ইজতিহাদী ক্ষমতা লোপ পায়। ফলে দু'টি আলাদা শাখার জন্ম নেয়: ক. শাসকদের জন্য একটি শাখা, যারা রাজনীতিক কাঠামোকে নিয়ন্ত্রণ করছিলেন। খ. আরেকটি শাখা যার নেতৃত্বে ছিলেন উলামায়ে কিরাম। এরা শাসক ও শাসিতসহ পুরো উম্মাহ্কে দ্বীনি ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে দিক-নির্দেশনা দান করেন।

দ্বীনের উপর অভিজ্ঞ উচ্চতর কর্তৃপক্ষকে শাসকদের তুলনায় উচ্চ মর্যাদাশীল রাখা হয়। উলামায়ে কিরামের সিদ্ধান্ত শাসক ও শাসিত উভয় দলে বিনা প্রশ্নে মেনে নিতেন।[৬]

আল্লাহ তা'আলা দ্বীনের উপর অভিজ্ঞ কর্তৃপক্ষ তথা উলামায়ে কিরামকে মানার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। উপরে উদ্ধৃত উভয় আয়াতে করীমায় অবশ্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা আমাদেরকে 'কুফর', 'শিরক' কিংবা 'বিদআত' এর প্রতি ধাবমান হতে নির্দেশ দেন নি! অথচ তাক্বলিদ বা জানলেওয়ালার কথা মানাকে গায়র মুকাল্লিদরা এ ধরনের উচ্চ পর্যায়ের পাপ বলে সমাজে প্রচার করে থাকেন। তাদের এই দাবীর অসারতা নিশ্চয়ই পাঠকদের নিকট এখন আরো স্পষ্ট হয়েছে।

---

[৫] তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন।

[৬] আহকামুল কুরআন, আবু বকর জাস্সাস রাহ. খ.২, পৃ: ২১০।

হাদিস শরীফে তাক্বলিদ

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত দল সম্পর্কে মন্তব্য করতে যেয়ে বললেন:

وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلٰى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي

-"আমার উম্মাহ্ তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। এর মধ্যে একটি দল ছাড়া সবাই জাহান্নামী। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, এই দল কোন্‌টি? জবাব দিলেন, যে দলটি আমি ও আমার সাহাবার আদর্শকে অনুসরণ করবে।"[৭]

উপরোক্ত হাদিস শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুক্তিপ্রাপ্তির পূর্বশর্ত পরিষ্কার ভাষায় বর্ণনা করেছেন: তিনি ও তাঁর আসহাবে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুমের একান্ত অনুসরণ হলো এই পূর্বশর্ত। অর্থাৎ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে একমাত্র সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুমকে অনুসরণ করতে হবে। তাঁদেরকে অনুসরণ করলে মানুষ পথভ্রান্ত হবে না। তাঁদের অনুসরণ অবশ্যই কুফর, শিরক কিংবা বিদআত নয়- যা গায়র মুকাল্লিদরা প্রচার করার দুঃসাহস দেখান! এছাড়া তারা বলেন, আমরা শুধুমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অনুসরণ করি। কিন্তু উপরোক্ত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হলো, সাহাবায়ে কিরামকেও অনুসরণ করা বৈধ। শুধু বৈধ নয় রাসূলের অনুপস্থিতিতে তাঁদেরকে অনুসরণ মুক্তিপ্রাপ্তির একমাত্র পথ।

[৭] মাকতুবাতে ইমামে রব্বানী, খ.১, পৃ: ১০২; তিরমিযি, খ.২. পৃ: ৮৯; মুসতাদরাকে হাকিম, খ.১, পৃ: ১২৯; মিশকাত, খ.১, পৃ: ২০।

২. হাদিস শরীফে আছে:

أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْتُ فَلَمْ أَجِدْكَ قَالَ أَبِي كَأَنَّهَا تَعْنِي الْمَوْتَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ

-"রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে একজন মহিলা সাহাবিয়া জানতে চাইলেন, আপনাকে না পেলে কাকে জিজ্ঞেস করবো? [বর্ণনাকারী বলেন, প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিলো রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর তিনি কাকে অনুসরণ করবেন?] তিনি জবাব দিলেন "আবু বকরকে।"" [মুত্তাফাকুন আলাইহি; মিশকাত]

৩. হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

وعن على قال : قيل لرسول الله : من نؤمر بعدك - قال : " إن تؤمروا أبا بكر تجدوه أمينا زاهدا فى الدنيا راغبا فى الآخرة وإن تؤمروا عمر تجدوه قويا أمينا لا يخاف فى الله لومة لائم وإن تؤمروا عليا - ولا أراكم فاعلين - تجدوه هاديا مهديا يأخذ بكم الطريق المستقيم " . رواه أحمد

-"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার পর কাকে আমরা শাসক বানাবো? জবাব দিলেন, যদি আবু বকরকে বানাও, তবে তাঁকে তোমরা বিশ্বস্ত, দুনিয়ার প্রতি বিতৃষ্ণ এবং আখিরাতের প্রতি উদগ্রীব পাবে। যদি উমরকে বানাও তাকে ক্ষমতাবান, বিশ্বস্ত এবং আল্লাহর জন্য কোন নিন্দুকের দিন্দাকে পরোয়াহীন পাবে। যদি আলীকে বানাও, তোমাদেরকে অনুরূপ দেখছি না, তাকে তোমরা পথ-প্রদর্শক ও পথপ্রাপ্ত পাবে। তিনি তোমাদেরকে সীরাতে মুস্তাকীমের দিকে নিয়ে যাবেন।" [তিরমিযী; ইবনে মাজাহ; মুসতাদরাকে হাকিম; মিশকাত; মুসনাদে আহমদ]

৪. হযরত ক্বাসিম বিন আবদুর রাহমান রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

رضيت لأمتى ما رضى لها ابن أم عبد

-"আমার উম্মতের জন্য উম্মে আবদের পুত্র [অর্থাৎ আবদুল্লাহ বিন মাসউদ] যা পছন্দ করবে, আমিও তা পছন্দ করি।" [মুসতাদরাকে হাকিম]

এখানে আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর তাক্বলিদ করতে ইশারা দিয়েছেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। উল্লেখ্য, হানাফী ফিকহে হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর গুরুত্ব অপরিসীম।

৫. হাদিস শরীফে আছে:

عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أحيا سنتى فقد أحبنى ومن أحبنى كان معى فى الجنة

-হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন: "যে আমার সুন্নাতকে জিন্দা করবে, সে আমাকে মুহব্বাত করলো। আর যে আমাকে মুহব্বাত করলো সে জান্নাতে আমার সাথী হবে।" [তাবারানী]

উপরে উদ্ধৃত প্রতিটি হাদিস থেকে তাক্বলিদের প্রমাণ পাওয়া গেলো। তাহলে গায়র মুকাল্লিদরা কেনো বলছেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ছাড়া অন্য কারো তাক্বলিদ করা হারাম? এমনকি 'শিরক', 'বিদআত' ও 'কুফরী'র মতো মারাত্মক আমলের সঙ্গে এটাকে সম্পৃক্ত করার প্রয়াস পাচ্ছেন? এর সোজা জবাব হলো, মানুষকে বোকা বানিয়ে তাদের অনুসারী করা। সাহাবায়ে কিরামকে অনুসরণের মানেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অনুসরণ, এ সহজ কথাটি তারা প্রচার করতে ভয় পান। কারণ এটা প্রচার করলে তো তাদেরকে গায়র মুকাল্লিদের ভ্রান্ত রাস্তা থেকে তাওবাহ করে মুকাল্লিদদের পথে ফিরে আসতে হবে। আল্লাহ তা'আলার দরবারে আমরা এটাই কামনা করি যে, তারা ফিরে আসুক। মুসলিম উম্মাহ্‌কে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা থেকে তারা মুক্ত হউক।

আর তাদের নসীবে যদি হিদায়াত না থাকে তাহলে তাদের অনিষ্ট থেকে মুসলিম উম্মাহ্‌কে হিফাজত করুন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবিতাবস্থায় তাক্বলিদের প্রমাণ

১. হাদিস শরীফে আছে:

عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ أَتَانَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ مُعَلِّمًا وَأَمِيرًا فَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ وَالْأُخْتَ النِّصْفَ

-"আসওয়াদ ইবনে ইয়াজিদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- মু'আজ ইবনে জাবাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু ইয়ামনে আমাদের কাছে আসেন একজন শিক্ষক ও নেতা হিসেবে। আমরা তাঁর কাছে একব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যিনি মৃত্যুকালে [উত্তরাধিকার হিসেবে] এক মেয়ে ও এক বোন রেখে যান। তিনি সিদ্ধান্ত দেন যে, অর্ধেক সম্পদ মেয়ের হবে ও বাকী অর্ধেক বোনের।" [সহীহ বুখারী]

হযরত মুআজ বিন জাবাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু ইয়ামনে প্রেরিত হলেন নেতা হিসাবে। ইয়ামনবাসী তাঁকে বিনাপ্রশ্নে অনুসরণ করেন। সকল ব্যাপারে তারা তাঁর তাক্বলিদ করেছেন। এ সময় অবশ্যই দ্বীনের বিষয়াদি সম্পূর্ণরূপে লিপিবদ্ধ হয় নি। মুআজ রাদ্বিআল্লাহু আনহু শরয়ী ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নিজের জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও কিয়াসের মাধ্যমে। এই কিয়াসকে আজকাল সালাফি গায়র মুকাল্লিদরা অস্বীকার করেন।

ইয়ামন থাকাকালে হযরত মুআজ বিন জাবাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু কিভাবে শরয়ী ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতেন তার উপর একটু চিন্তা করুন।

সে যুগে 'রেডিও' ছিলো না যে, মোবাইল ফোন করে জিজ্ঞেস করা যাবে। মদীনা শরীফ থেকে ইয়ামন অনেক দূরে। প্রতিটি শরয়ী সিদ্ধান্ত নিতে যদি বার বার মদীনা শরীফ যাওয়া-আসার প্রয়োজন হতো তাহলে বিরাট সমস্যা দাঁড়াতো। সুতরাং ইয়ামনবাসী নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

একজন সাহাবীর সিদ্ধান্তকে বিনাবাক্যে মেনে নেন এই ভেবে যে, তাঁর দেওয়া ফায়সালা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অভিপ্রায় এবং সন্তুষ্টির অনুকূলে হবে। এভাবে দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে সিদ্ধান্ত মানার নামই তাক্বলিদ। গায়র মুকাল্লিদদের অভিযোগ অনুযায়ী রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি ইয়ামনবাসী 'শিরক', 'বিদআত' ও 'কুফরী'-তে লিপ্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে হযরত জাবাল রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে সেখানে পাঠিয়েছিলেন?[৮]

অনুরূপ হযরত মুসাইব ইবনে উমায়র রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের পূর্বে মদীনা শরীফ দ্বীনের উস্তাদ হিসাবে প্রেরণ করেন।

২. হাদিস শরীফে আছে:

عن البراء بن عازب - أنه قال : أول من قدم علينا المدينة من المهاجرين مصعب بن عمير وابن أم مكتوم فكانوا يقرءوننا فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قرأت سبح اسم ربك الأعلى وسورا من المفصل

-"হযরত বারা' বিন আজিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, মুহাজিরদের মধ্য থেকে মদীনায় আমাদের নিকট প্রথম আগমন করেন হযরত মুসআব ইবনে উমায়ির এবং ইবনে উম্মে মাকতুম রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা। তাঁরা আমাদেরকে কুরআন শরীফ শিক্ষা দিতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় আসেন তখন আমি সাব্বি হিসমা ও মুফাস্সালের কয়েকটি সূরা পাঠ করে নিয়েছি।" [মুসতাদরাকে হাকীম]

আকাবার বাইআতের সময় এরূপ একজন উস্তাদ প্রেরণের জন্য মদীনা শরীফের নও-মুসলিমরা অনুরোধ করেছিলেন। শরয়ী সিদ্ধান্ত প্রদানে তিনি বার বার মক্কা শরীফে অবস্থানরত নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যোগাযোগ করেন নি, করতে পারেন নি। তাঁর সকল সিদ্ধান্ত মদীনাবাসী সকলেই বিনাপ্রশ্নে মেনে নিয়েছিলেন। এ থেকেও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় তাক্বলিদের প্রমাণ পাওয়া যায়। হযরত উমায়র

[৮] দেখুন, আবু দাউদ, খ.২, পৃ: ১৪৯; মাযমাল জাওয়াইদ, খ.২, পৃ: ৪৫১; বুখারী, খ.২, পৃ: ৯৯৭।

রাদ্বিআল্লাহু আনহু উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন। হযরত মুসাইব রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে মদীনাবাসীর নিকট প্রেরণের উদ্দেশ্য কি ছিলো? শিক্ষা প্রদান। আর শিক্ষকের কথা বিনা প্রশ্নে সত্য বলে মানা ও শেখার নামই হলো তাক্বলিদ।

সাহাবায়ে কিরামের যুগে তাক্বলিদ

সাহাবায়ে কিরামের যুগে তাক্বলিদের ভুরি ভুরি প্রমাণ বিদ্যমান। নিম্নে আমরা কয়েকটি মাত্র প্রমাণ উপস্থাপন করলাম।

১. হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে কুরআন শরীফ সংকলিত হয়েছিল। মুসাইলামা বিন কাজ্জাবের বিরুদ্ধে ইয়ামামার যুদ্ধ (ডিসেম্বর, ৬৩২ ঈ.) হয়। অনেক কুরআনে হাফিজ সাহাবা শহীদ হন। হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু চিন্তিত হলেন। হাফিজদের অভাবে অবশেষে কুরআনের এক উল্লেখযোগ্য অংশ হারিয়ে যেতে পারে। সুতরাং তিনি খলীফা আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে বিষয়টি অবগত করলেন। প্রথমে খলীফা কুরআন শরীফ সংকলনে রাজী হলেন না, বললেন: "স্বয়ং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কাজটি করেন নি, আমি তা কোন্ সাহসে করবো?" হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু জবাবে বললেন, "এটা একটি ভালো কাজ।"

এরপর উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু একাধিকবার অনুরোধ জানালেন। অবশেষে খলীফা আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহু ব্যাপারটির গুরুত্ব অনুভব করেন। তিনি হযরত জায়িদ বিন ছাবিত রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে কুরআন সংকলনের দায়িত্ব দিলেন। উল্লেখ্য জায়িদ বিন ছাবিত রাদ্বিআল্লাহু আনহু ওহীর অনুলেখকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। হযরত জায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুও প্রথমত কিছুটা সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনিও সংকলনের গুরুত্ব অনুধাবন করেন। অবশেষে তিনি বিরাট সতর্কতা ও অক্লান্ত চেষ্টা করে বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট সংরক্ষিত কুরআনের আয়াতমালা সংকলন করেন।[৯]

উক্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদনের ফলে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে 'জামে-এ-কুরআন' বা কুরআনের সংকলক হিসাবে

[৯] দেখুন, বুখারী, খ.২, পৃ: ৪৫।

আখ্যায়িত করা হয়েছে। তাঁর এই কাজকে কি 'বিদআতী', 'কুফরী' কিংবা 'শেরেকী' বলা যাবে? [নাউযুবিল্লাহ]

হাজার হাজার আসহাবে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুম উক্ত কাজটির প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন এবং সকলেই বিনাবাক্যে এর প্রতি সমর্থন জানান। তারা সকলেই কি 'ভুল' করলেন? এ কাজটি করতে যেয়ে তাঁদের মধ্যে ইজমা, তাক্বলিদ, কিয়াস ইত্যাদি জড়িত ছিলো। এছাড়া হযরত আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহু দ্বীনি ব্যাপারে কোন ফাতওয়া প্রদান করলেই বলতেন, এটা তাঁরই ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত।[১০] মানুষ বিনা প্রশ্নে তাঁর সিদ্ধান্তগুলো মেনে নিয়েছিলেন। এটার নামই তাক্বলিদ। হযরত আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর ইজতিহাদের বিরুদ্ধে একজনও বিরোধিতা করেছেন, তার কোন নজির নেই। এটা 'তাক্বলিদে শাখসী' (এক ব্যক্তির তাক্বলিদ) হিসাবেও গণ্য।

২. তারাবী নামাযে বিশ রাকাআত জামাআতে পড়ার ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত নেন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু। তিনি তখন খলীফাতুল মুসলিমীন। তিনি ইজতিহাদী ফাতওয়া জারী করতেন।[১১] যে কোন সিদ্ধান্ত নিতে তিনি তাঁর কাজীদের প্রতি নির্দেশ দিতেন ইজতিহাদ করার জন্য।[১২] কোনো কিতাবে পাওয়া যায় নি যে, তাঁর এসব ইজতিহাদী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কেউ অভিযোগ করেছেন। সবাই বিনাপ্রশ্নে এগুলো মেনে নিয়েছিলেন ও আমল করেছেন। এর নামই তাক্বলিদে শাখসী।

৩. হযরত উসমান ইবনে আফ্‌ফান রাদ্বিআল্লাহু আনহু খলীফাতুল মুসলিমীন থাকাকালে পবিত্র কুরআন শরীফ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছিলেন। জরুরী মনে করেই তিনি এ কাজটি করেছিলেন। আসহাবে কিরামসহ মুসলিম জনতা তাঁর এই সিদ্ধান্তকে মেনে নেন। এটাও তাক্বলিদের প্রমাণ।[১৩]

[১০] জামি'উ বয়ানুল ইল্‌ম, খ.২, পৃ: ৫১।
[১১] মিজানুল কুবরা লি শা'রানী, খ.১, পৃ: ৪৯।
[১২] জামি'উ বয়ানুল ইল্‌ম, খ.২, পৃ: ৫৬।
[১৩] শরাহ, ফিক্বহে-আকবর, পৃ: ৭৯।

জুমু'আর নামাযে ইমাম কর্তৃক খুতবা প্রদানের পূর্বে দ্বিতীয় আযানের প্রথা শুরু করেন হযরত উসমান ইবনে আফ্‌ফান রাদ্বিআল্লাহু আনহু। এটাও ছিলো তাঁর ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত।[১৪]

দ্বিতীয় আযানের প্রথা চালু করার জন্য কি কোনো হাদিস শরীফে নির্দেশ আছে? সে যুগের এবং পরবর্তী যুগসমূহের কেউ কি এ প্রথা মানা ও আমল করার ক্ষেত্রে প্রশ্ন তুলেছেন? সবাই কি তাঁর এই সিদ্ধান্তকে অনুসরণ (তাক্বলিদ) করেন নি?

খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে তাক্বলিদের আরো অনেক প্রমাণ বিদ্যমান। উপরে বর্ণিত ক'টিই যথেষ্ট বলে মনে করি। সুতরাং আমরা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করলাম:

১. তাক্বলিদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে হয়েছে।

২. কুরআন শরীফে তাক্বলিদের নির্দেশ আছে।

৩. হাদিস শরীফে তাক্বলিদের নির্দেশ আছে।

৪. খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে তাক্বলিদ হয়েছে।

হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু সকলকে ফিকহী ব্যাপারে হযরত মুআজ বিন জাবাল রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে তাক্বলিদ করার পরামর্শ দেন। তিনি জাবিয়া নামক অঞ্চলে এক বক্তৃতায় বলেন: "হে লোকগণ! আপনাদের যারা ফিক্‌হ সম্পর্কে অবগত হতে চান তারা মুআজ বিন জাবালকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেবেন। আর যারা সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে ইচ্ছুক তারা আমার নিকট আসবেন। কারণ, আল্লাহ তা'আলা আমাকে বাইতুল মাল সংরক্ষণ ও বিতরণের দায়িত্ব দিয়েছেন।"

হযরত সুলাইমান বিন ইয়াসার রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাদ্বিআল্লাহু আনহু হজ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তিনি মক্কা শরীফের পথে নাযিয়া অঞ্চলে উপস্থিত হলেন। এখানে এসে তার রসদপত্র হারিয়ে ফেললেন। অপারগ হয়ে ১০ জিলহাজ্জ হযরত ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমার শরণাপন্ন হলেন। এদিন ছিলো আইয়্যামে

[১৪] দেখুন, খুলাফায়ে রাশিদীন, ইমাম সুয়ূতী রাহ.।

নহরের প্রথম দিন। হজ্জের দ্বিতীয় ফরয, অর্থাৎ উকুফে আরাফা ইতোমধ্যে শেষ হয়ে গেছে। আনসারী রাদ্বিআল্লাহু আনহু হযরত ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমাকে নিজের অবস্থার কথা জানিয়ে মাসআলা জিজ্ঞেস করলেন। হযরত ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা তখন বললেন, 'আপনি ঐসব কাজ সমাধা করেন, যেসব কাজ একজন উমরা পালনকারী করে থাকেন।' অর্থাৎ তাওয়াফ ও সাঈ করার জন্য বললেন। 'এরপর আপনি ইহরাম থেকে মুক্ত হতে পারেন। পরবর্তী বছর হজ্জের মৌসুমে পুনরায় হজ্জ পালন করবেন এবং যা-ই পারেন কুরবানী করুন।' [মুয়াত্তা ইমাম মালিক]

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাদ্বিআল্লাহু আনহু বিনা প্রশ্নে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমার ইজতিহাদী সিদ্ধান্তকে মেনে নেন ও এর উপর আমল করেন এই বিশ্বাস রেখে যে, এটা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের সন্তুষ্টির কারণ। তিনি কুরআন-হাদিস থেকে প্রমাণ তালাশ করেন নি। আর এটাই হলো তাক্বলিদ।

দ্বীনি ব্যাপারে ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিয়ম হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করেছেন:

عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَتَبَ إِلٰى عُمَرَ يَسْأَلُهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ اقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ فَإِنْ شِئْتَ فَتَقَدَّمْ وَإِنْ شِئْتَ فَتَأَخَّرْ وَلَا أَرَى التَّأَخُّرَ إِلَّا خَيْرًا لَكَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ

-"হযরত সুরাইহ্ রাদ্বিআল্লাহু থেকে বর্ণিত [তিনি বলেন], আমি উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নিকট পত্রযোগে কিছু প্রশ্ন করলাম। তিনি পত্রযোগে উত্তর দিলেন, আজ থেকে যে কেউ শরঈ সিদ্ধান্তের দায়িত্ব নেবেন, প্রথমে তা অবশ্যই কিতাবুল্লাহর আলোকে করবেন। যদি এমন কোনো বিষয় হয় যা কিতাবুল্লায় খুঁজে পাওয়া না যায় তাহলে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিদ্ধান্ত থেকে ফায়সালা দেবেন। যদি এ ব্যাপারে দিকনির্দেশনা

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেও (অর্থাৎ হাদিস শরীফ থেকে) পাওয়া না যায় তাহলে সিদ্ধান্তটি সালফে সালিহীনের সিদ্ধান্ত মুতাবিক করবেন। যদি কিতাবুল্লাহ, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিদ্ধান্ত এবং সালিহীনের সিদ্ধান্তেও বিষয়টি খুঁজে না পাওয়া যায়, তাহলে ইজতিহাদ করবেন।" [সুনানে নাসাঈ, খ.২, পৃ: ৩০৫]

সাহাবায়ে কিরামের যুগে তাক্বলিদ ও ইজতিহাদের এরূপ প্রমাণ উপস্থাপনের পর এ ব্যাপারে আর কারো সন্দেহ থাকা উচিৎ বলে আমরা মনে করি না।

গায়র মুকাল্লিদরা প্রশ্ন করেন, সাহাবায়ে কিরামের পর থেকে হযরত ইমামে আজম পর্যন্ত সময়ে কি তাক্বলিদ ওয়াজিব ছিলো?

সাহাবায়ে কিরামের সংখ্যা লক্ষাধিক ছিলো। হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, সাহাবায়ে কিরাম দু'টি দলে বিভক্ত ছিলেন। ছোট্ট একদল ছিলেন মুজতাহিদ ও বড় একদল মুকাল্লিদ। সাহাবায়ে কিরামের প্রায় সকলেই আরব বংশভূত ছিলেন। ইবনে কাইয়িম রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মতে ১৪৯ জন সাহাবী ফকীহ ছিলেন। এর মধ্যে ৭ জন ফাতওয়া প্রদান করতেন। ২০ জন কিছু কিছু ফাতওয়া দিতেন এবং ১২২ জন সর্বাধিক কম ফাতওয়া প্রদান করতেন। এসব মুফতির হাজার হাজার ফাতওয়া যেসব কিতাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে এগুলোর মধ্যে ক'টি হলো: মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক, তাহজিবুল আছার এবং মা'আনিল আছার ইত্যাদি। এসব কিতাবে মুফতির মাসআলার বর্ণনা আছে কিন্তু প্রমাণ হিসাবে কুরআনের আয়াত কিংবা হাদিস শরীফের মুতন উল্লেখিত হয় নি। এরপরও অন্যান্য সকল আসহাবে কিরাম এসব মাসআলার উপর আমল করেছেন, এজন্য মূল সূত্রদ্বয় থেকে প্রমাণ খোঁজেন নি। এটাকেই বলে তাক্বলিদ বা ইজতিহাদী সিদ্ধান্তের অনুসরণ। শাহ ওয়ালিউল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এসব মুফতি সাহাবা সম্পর্কে বলেন, এরা তখনকার মুসলিম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করতেন। তাঁদেরকে মুসলিম উম্মাহ্ অনুসরণ করতেন মাসআলা-মাসাইল ও আমলের ক্ষেত্রে। তিনি লিখেছেন:

মক্কা মুকাররমায় ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু।

মদীনা মুনওয়ারায় ছিলেন হযরত জায়িদ ইবনে ছাবিত রাদ্বিআল্লাহু আনহু।

কুফায় ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু।

ইয়ামনে ছিলেন হযরত মুআজ বিন জাবাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু।

বসরায় ছিলেন হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু।

উপরোক্ত ফুকাহাদের ইন্তিকালের পর তাবেঈদের যুগের সূচনা হয়। হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, প্রত্যেক তাবিঈ আলিমের অনুসারী একদল লোক ছিলেন। তাবিঈরা নিজ নিজ শহরে মুসলমানদের ইমাম হিসাবে স্বীকৃতি পান। মানুষ তাঁদেরকে অনুসরণ করে। সুতরাং তাবিঈনের যুগে তাক্বলিদের প্রচার-প্রসার ব্যাপকভাবে হয়েছিল। সেই যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মুসলমানরা তাক্বলিদ করে আসছেন। অবশ্য যুগে যুগে আজকের 'গায়র মুকাল্লিদদের' মতো সন্দেহবাদী একাধিক দলের যে আবির্ভাব ও বিলুপ্তি হয় নি, তা কিন্তু নয়। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এ যুগের সালাফি, মওদুদী, ওয়াহাবী ও আহলে হাদিস নামধারী সন্দেহবাদী গায়র মুকাল্লিদদের চিন্তা-চেতনারও বিলুপ্তি অচিরেই সাধিত হবে ইনশাআল্লাহ। তাক্বলিদ ও মাজহাব ছাড়া মুসলিম উম্মাহ্ সম্পূর্ণরূপে দিগভ্রান্ত হয়ে দ্বীনহারা হয়ে পড়বে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর পছন্দসই এই উম্মাহ্কে এভাবে বিপর্যস্ত করবেন না- এটাই আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রাখি। তবে আমাদের দায়িত্ব পালনে ত্রুটি থাকা কাম্য নয়। হক্ব এর পক্ষে ও এসব দলের মাজহাব-বিরোধী প্রচারণার স্বরূপ ও ভ্রান্তি মুসলিম উম্মাহ্কে যেভাবে সম্ভব অবগত করে সতর্ক থাকতে সহায়তা করতে হবে।

ইমাম মাহদী কোন্ মাজহাবের অনুসারী হবেন?

ইমাম মাহদী ঠিক কোন্ মাজহাবের অনুসারী হবেন তা নিশ্চিতভাবে বলা যাবে না। তবে তিনি যে আজকের সালাফি, মওদুদী, ওয়াহাবী কিংবা আহলে হাদিস নামধারীদের মতো গায়র মুকাল্লিদ হবেন না, তা অবশ্য নিশ্চিতভাবে বলা যায়। কারণ:

১. আমাদের সময়ে তাক্বলিদ ওয়াজিব বলে সাব্যস্ত হয়েছে। সাঈদ আহমদ তাহতাবী (হি. ১২৩৩) রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "মুক্তিপ্রাপ্ত দল হলেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতপন্থীরা। এরা চার মাজহাবের অন্তর্ভুক্ত

আছেন। এগুলো হলো হানাফী, শাফিঈ, মালিকী ও হাম্বলী মাজহাব। আর ওসব ব্যক্তি ও দল যারা এই চার মাজহাবের বাইরে অবস্থান করছে তারা 'বিদআতী' ও 'অগ্নিবাসী'।"[১৫]

২. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতপন্থীরা মহান ইমামদের প্রতিষ্ঠিত যে কোন চার মাজহাবের মুকাল্লিদ।

৩. এই চার মাজহাবের কোনোটি অনুসরণ করেন না এমন ব্যক্তি বা গোষ্ঠি হলো গায়র মুকাল্লিদ এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বাইরে অবস্থানকারী।

সুতরাং ইমাম মাহদী যখন আসবেন তখন নিম্নের দু'টির একটি সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকতে পারে।

১. হয় তিনি হবেন, মুজতাহিদে মুতলাক (যেমন আইম্মায়ে মুজতাহিদীন ছিলেন)।

২. না হয় তিনি হবেন মুকাল্লিদ (যেমন আজকের মুসলিম উম্মাহ্র বিরাট আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতপন্থীরা আছেন)।

তিনি প্রথমটি হলে ভালো কথা। আর দ্বিতীয়টি তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতভুক্ত হতে হলে অবশ্যই তাঁকে কোনো না কোনো মাজহাবের মুকাল্লিদ হতে হবে। তৃতীয় কোনো রাস্তা নেই।

গায়র মুকাল্লিদদের আরো প্রশ্ন, হযরত ঈসা আলাইহিস্সালাম পৃথিবীতে দ্বিতীয়বার আগমনের পর কোন্ মাজহাব অনুসরণ করবেন?

এ প্রশ্নেও লুকিয়ে আছে মানুষকে বিভ্রান্ত করার অপকৌশল। তবে আমরা এরও জবাবে উপরোক্ত যৌক্তিক আলোচনার আলোকে বলবো, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতভুক্ত হবেন। তিনি মুজতাহিদ কিংবা মুকাল্লিদ হবেন। তিনি অবশ্যই কখনো বিভ্রান্ত গায়র মুকাল্লিদদের দলভুক্ত হবেন না।

---

[১৫] حاشية السيد الطحطاوي على الدر المختار بشرح تنوير الابصار. তাহতাবী আ'লা দুররুল মুখতার, খ.4, পৃ: ১৫৩।

উপসংহারে এটাই উল্লেখ করা যায় যে, আমরা ইতোমধ্যে প্রমাণ করেছি, তাদের অভিযোগ: 'মুকাল্লিদরা কুফর, বিদআত ও শিরকের মধ্যে লিপ্ত', সম্পূর্ণরূপে ভুল ও অগ্রহণযোগ্য। এরা ১. কিয়াস ও ২. ইজমার উপর বিরোধিতা কিংবা সন্দেহ করে; ৩. তারা ফিকহের ইমামদের সমালোচনাকারী; ৪. অপ্রত্যক্ষভাবে হাদিস প্রত্যাখ্যানকারী; ৫. কল্পনা ও অলীক ধারণার উপর বিশ্বাসী; ৬. কুরআনের অপ্রত্যক্ষ অপব্যাখ্যাকারী; ৭. বিভ্রান্ত ও বিভ্রান্তকারী; ৮. সুন্নাতের প্রতি উদাসীন; ৯. সঠিকভাবে নামায আদায়ে মানুষকে বাধাদানকারী; ১০. ইসলামের নামে ভ্রান্ত পথ আবিষ্কারকারী।

হাদিস শরীফে আছে:

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ يَأْتُونَكُمْ مِنَ الْأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ

-"মুসলিম ইবনে ইয়াসার রাদ্বিআল্লাহু আনহু হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: শেষ যুগে মিথ্যাবাদী দাজ্জালদের অবির্ভাব হবে। তারা এমন হাদিস নিয়ে আসবে যা তোমারা ও তোমাদের বাপ-দারাও শুনেনি। তোমরা ওদের থেকে বেঁচে থেকো। তোমরা এদের কাছে যেয়ো না, তাদেরকেও তোমাদের নিকটে আসতে দেবে না।" [মুসলিম]

সুতরাং সালাফি (আসলে খালাফী), আহলে হাদিস (আসলে অপ্রত্যক্ষভাবে হাদিস প্রত্যাখ্যানকারী), মওদুদী ও ওয়াহাবী গায়র মুকাল্লিদদের অপপ্রচার থেকে সকলে বেঁচে থাকুন। তাদের আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিপূর্ণ কথার প্রতি মোটেই আস্থাশীল হবেন না। এ সবই আপনাকে-আমাকে বোকা বানানোর পাঁয়তারা মাত্র। একমাত্র সঠিক হক্বপন্থী দল হলো ইসলামের আগমন থেকে আজ পর্যন্ত বেঁচে থাকা এবং কিয়ামত পর্যন্ত অস্তিত্বশীল বৃহৎ মুসলিম দল 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত'। আর এরা সকলেই মুকাল্লিদ তথা কোনো না কোনো মাজহাবের অনুসারী।

লা-মাজহাবীদের ভ্রান্তি ও মাজহাবের গুরুত্ব সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য[১৬]

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত ইমাম গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহি বলেন, "কেউ ইসলাম ও ঈমানে অনুপ্রেবেশের পরই এটা তার জন্য ওয়াজিব হবে যে, সে শুধুমাত্র 'ইবাদাত ও দ্বীনি আমল' করবে। তার জন্য উচ্চ পর্যায়ের দ্বীনি গবেষণায় জড়িত হওয়া ঠিক হবে না। কারণ এসব ব্যাপার শুধুমাত্র ফকীহ উলামায়ে কিরামের জন্য খাস। সাধারণ কোন ব্যক্তির জন্য উচ্চ পর্যায়ের ইলমী ব্যাপার নিয়ে তর্ক-বিতর্কে জড়িত হওয়া তার জন্য ফায়দা থেকে ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কাই বেশী। এর কারণ হলো, যখন কোন অপরিপক্ক ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ের উপর তর্কে জড়িত হয় তখন এটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রায় নিশ্চিত যে, সে এমন কিছু মতামত পেশ করবে যা মূলত কুফরের কাছাকাছি। অথচ, ব্যাপারটি তার নিকট অনুদ্ঘাটিত থাকবে। এরূপ ব্যক্তির উপমা হলো সে লোকের মতো যে সাঁতার কাটতে না জেনেও মহাসাগরে স্বেচ্ছায় ঝাপিয়ে পড়ে।"[১৭]

সুতরাং সাধারণ মুসলমানদের জন্য উচিৎ হবে হক্কানী উলামায়ে কিরাম কর্তৃক ব্যাখ্যাত শরীয়তের আদেশ-নিষেধ বিনা বাক্যে মেনে নেওয়া। নিজেকে পরিপক্ক মুসলমান হিসাবে গড়ে না তুলে, দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ে দালিলিক প্রমাণ খোঁজ করা ও গভীরে যেয়ে অনুধাবনের চেষ্টা আসলে কোনো সুফল বয়ে আনবে না। একদা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এক ব্যক্তি হাজির হয়ে দ্বীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞানার্জনের আকাঙ্ক্ষা পেশ করলেন। নজীবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কয়েকটি পাল্টা প্রশ্ন করলেন: ১. তুমি কি আল্লাহকে চিনতে পেরেছো? ২. আল্লাহ তা'আলার ক'টি নির্দেশ তুমি মেনে চলো? ৩. তুমি কি মৃত্যু সম্পর্কে সচেতন আছো? ৪. মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিয়েছো কি? এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

[১৬] এ অংশের অধিকাংশ তথ্যের সূত্র হলো ভারতের আলিম মুফতি আবদুর রহীম লাজপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রণীত 'ফাতওয়ায়ে রাহিমীয়া'। বিভিন্ন বজুর্গের উদ্ধৃতির সূত্রও এই ফাতওয়ার কিতাব। হযরত লাজপুরী রাহমাতুল্লাহির নিকট এক 'গাইর মুকাল্লিদ' ব্যক্তি মাজহাব অনুসরণ সঠিক কি না প্রশ্ন করেছিলেন। এ প্রশ্নের উত্তরে মাজহাবের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য নিয়ে তিনি দীর্ঘ আলোচনা করেন এবং তা ফাতওয়ায়ে রাহিমীয়ায় স্থান পায়।

[১৭] ইহইয়া উলূমুদ্দীন, খ.৩, পৃ: ৩৫।

ওয়াসাল্লাম লোকটিকে বললেন, এসব ব্যাপারে তুমি নিজেকে প্রথমে পাকাপুক্ত করো এরপর ফিরে এসো দ্বীনের খুঁটিনাটি বিষয়ে অবগত হতে।[১৮]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "এমন এক সময় আসবে যখন মানুষ অজ্ঞদেরকে নেতা বানাবে ও [দ্বীন সম্পর্কে] তাদেরকে প্রশ্ন করবে। এরা তখন ফাতওয়া জারি করবে সঠিক জ্ঞান ছাড়া। তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে এবং অপরদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে।" [মিশকাত শরীফ]

গায়র মুকাল্লিদরা মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন বাটালভীকে খুব সম্মান করে। তিনিই লিখেছেন: "মাজহাবের অনুসরণ করে না এমন কারো পক্ষে কখনো সম্ভব নয়, মুজতাহিদীন থেকে দূরে সরে থাকা।"[১৯] একই গ্রন্থে তিনি আরো বলেছেন, "আমার ২৫ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, যারা মুজতাহিদীনকে ও কোনো মাজহাবের অনুসরণ করে নি, তারা অবশেষে ইসলাম থেকেই বের হয়ে গেছে। এদের অনেকে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেছে, এবং অন্যরা সম্পূর্ণ নাস্তিকে পরিণত হয়েছে। আর সর্বাধিক অল্প ক্ষতিগ্রস্তরাও শরীয়তের অনুসরণ থেকে সরে গিয়ে গোনাহগার হয়েছে। এদের অনেকে জুমু'আর নামায পড়ে না, জামাআতে শরীক হয় না এবং রোযাও রাখে না। ... দ্বীনদার কেউ অধার্মিক হওয়া ও দ্বীন থেকে অবশেষে বের হওয়ার অনেক কারণ থকালেও, একটি মূল কারণ হলো দ্বীন সম্পর্কে অল্প জ্ঞানী হয়েও তাক্বলিদ পরিহার করা।"[২০]

আহলে হাদিস ফিরকার পুনরুজ্জীবন দানকারী হিসাবে পরিচিত ছিলেন ভারতের ভূপালের মরহুম নবাব সিদ্দীক হাসান খান। নিজের দল সম্পর্কে এ কথাগুলো বলতে তিনি বাধ্য হয়েছেন: "আমাদের মধ্য থেকে একদল লোক বের হয়েছে যারা দাবী করে, তারা কুরআন-হাদিসের জ্ঞানে পারদর্শী। অথচ আসলে তারা এ থেকে অনেক দূরে। এটাও তাদের দাবী, তারাই কুরআন-হাদিসের অনুসরণকারী এবং আল্লাহর পরিচয় লাভকারী।"[২১]

[১৮] জামি' বয়ানুল ইলম, পৃ. ১৩৩।
[১৯] মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন বাটালভী, ইশা'আতুস সুন্নাহ, খ. ১, পৃ. ২১১।
[২০] সাবীলুর রাশাদ, পৃ. ১০, কালিমাতুল ফাসল, পৃ. ১০ এবং তাক্বলিদে আইম্মাহ, পৃ. ১৬-১৭।
[২১] আল-হিত্তা ফী জিকরী সিহাহিস সিত্তা, পৃ. ২৭-২৮।

তিনি আরো লিখেছেন: "কী অদ্ভুত ব্যাপার! কিভাবে এরা (ওসব গায়র মুকাল্লিদরা) নিজেদেরকে সঠিক তাওহীদে বিশ্বাসী বলে দাবী করতে পারে, যখন তারা অপরদেরকে (মুকাল্লিদ হওয়ার কারণে) মুশরিক বলে গালি দেয়? তারা নিজেরাই (অর্থাৎ, গায়র মুকাল্লিদরা) তো নিজেদের বিশ্বাসে সর্বাধিক কট্টরতা দেখাচ্ছে?" তিনি পরবর্তীতে উপসংহারে বলেন, "তাদের এরূপ আচরণ বিপর্যয়মুখী ও পথভ্রষ্টতা ছাড়া আর কিছু নয়।"[২২]

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন: "এটা সবার জানা থাকা উচিৎ যে, মাজহাব অনুসরণের মধ্যে বিরাট ফায়দা নিহিত। আর অনুসরণ থেকে দূরে থাকলে খুব বেশী ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা আছে।"[২৩]

একই গ্রন্থে মরহুম সিদ্দীক হাসান খান আরো লিখেছেন: "মাজহাব অনুসরণের দ্বিতীয় কারণ হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'উম্মাহ্র অধিকাংশের মতের অনুসরণ করো'। সুতরাং যেহেতু চারটি ছাড়া হক্বপন্থী আর কোনো মাজহাব নেই তাই, এগুলোকে অনুসরণের মাধ্যমেই অধিকাংশের মতের অনুসরণ হবে। যে কোন একটির অনুসরণ থেকে দূরে থাকার অর্থ হলো 'অধিকাংশের মতের' বাইরে চলে যাওয়া। আর এটা হবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ অমান্য করার সামিল।" [প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩]

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মাজহাব অনুসারীদেরকে 'অধিকাংশের মতৈক্যের অনুসারী' বলেছেন। অপরদিকে যারা কোন একটিও মাজহাব অনুসরণ করে না, তাদেরকে 'হারিয়ে যাওয়া উটের' সাথে তুলনা করেছেন, যে তার মন্দ নফসের অনুসরণে ব্যস্ত।

আমরা এখন তাক্বলিদ ও মাজহাব বিষয়ের উপর সম্পৃক্ত কিছু হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নে তুলে ধরছি।

১. "অধিকাংশ উম্মাহ্র মতের অনুসরণ করো।" [মিশকাত শরীফ]

২. "জামাআতের সঙ্গে জড়িত থাকো"। [প্রাগুক্ত]

[২২] তাক্বলিদে আইম্মাহ, পৃ. ১৭-১৮।
[২৩] উক্বদুল জীদ, পৃ. ৩১।

৩. "অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মাহ্‌র মধ্যে গোমরাহীতে মতৈক্য সৃষ্টি করবেন না।" [মিশকাত, মাক্বাদিসুল হাসানাহ, পৃ. ৪৬০]

৪. "আমার উম্মাহ্‌ কখনো গোমরাহীতে মতৈক্যে পৌঁছবে না।" [প্রাগুক্ত]

৫. "আল্লাহর কুদরতী হস্ত জামাআতের [আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত] সাথে আছে। যে কেউ জামাআত থেকে আলাদা হবে সে জাহান্নামে যাবে।" [মিশকাত]

৬. "মানুষের জন্য শয়তান হচ্ছে শিয়ালের মতো, ঠিক যেরূপ শিয়াল বকরীর পেছনে থাকে। নিজের দল থেকে দূরে সরে পড়া কোনো একটি বকরীকে সে সহজে শিকার করতে সক্ষম হয়। তোমরাও নিজেদেরকে সংঘাত থেকে দূরে রাখবে এবং জামাআত ও উম্মাহ্‌র মতৈক্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে থাকবে।" [প্রাগুক্ত]

৭. "আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত থেকে কেউ যদি এক হাত পরিমাণ দূরেও সরে পড়ে তাহলে, সে ইসলামের গলাবন্ধ নিজের গলা থেকে সরিয়ে নিলো।" [প্রাগুক্ত]

৮. "দু'জন একজন থেকে উত্তম, তিনজন উত্তম দু'জন থেকে এবং চারজন উত্তম তিনজন থেকে। সুতরাং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সাথে থাকা নিশ্চিত রাখো।" [মাওয়াইদুল আওয়াইদ, পৃ. ১২২]

৯. "যে কেউ মান্যতার বিরোধিতা করে এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত থেকে আলাদা হয়ে পড়ে, তার মৃত্যু হবে আইয়্যামে জাহিলিয়াতের মানুষের মতো।" [সুনানে নাসাঈ]

১০. "মুসলমানরা [মতৈক্যের মাধ্যমে] যাকিছু ভালো মনে করে, তা আল্লাহর দৃষ্টিতেও ভালো।" [মুসনাদে আহমদ, মাক্বাসিদুল হাসানাহ গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, পৃ. ৩৬৮]

তাক্বলিদের গুরুত্ব বর্ণনা করতে যেয়ে শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "তাক্বলিদ কেউ কখনো প্রত্যাখ্যান করেন নি। সাহাবায়ে কিরামের যুগ থেকে চার মাজহাব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময়

পর্যন্ত লোকজন সর্বদাই ওসব নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কিরামের তাক্বলিদ করেছেন। মাজাহিবের অনুসরণ ভুল হলে তাঁরা [সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈন] অবশ্যই এটা [অর্থাৎ, তাক্বলিদ] প্রত্যাখ্যান করতেন।"[২৪]

তিনি ইমাম বগভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যিনি বলেছেন: "এতে [মাজহাব অনুসরণের মধ্যে] অসংখ্য ফায়দা আছে, যা কারো নিকট গোপন নয়। এ যুগে এটা [মুকাল্লিদ থাকা] আরো বেশী জরুরী কারণ তাদের মধ্যে সাহসিকতা লোপ পেয়েছে। মানুষ তো এখন নফসানী খাহিশাতের দাসে পরিণত হয়েছে। তারা নিজেদের মনগড়া মতামতকে কট্টরভাবে আঁকড়ে ধরে বসে আছে।"[২৫]

অন্য একটি গ্রন্থে শাহ সাহেব লিখেছেন: "ইসলামী ইতিহাসের দ্বিতীয় শতকে কোন একজন মুজতাহিদ ইমামের অনুসরণ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সে সময় মাজহাব অনুসরণ করেন না এমন ব্যক্তির সংখ্যা খুব অল্প ছিলো। এরপর মাজহাব অনুসরণ 'ওয়াজিব' হিসাবে স্বীকৃত হয়।"[২৬]

হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগায় তিনি মন্তব্য করেন: "পুরো উম্মাহ্‌, বা যারা [যোগ্যতার ক্ষেত্রে অপরের প্রতি] নির্ভরশীল, মতৈক্যে পৌঁছেছেন যে, অক্লান্ত পরিশ্রমের বদলে প্রণালীবদ্ধ ও গ্রন্থিত চার মাজহাবের যে কোন একটি অনুসরণ সকলের জন্য বৈধ। এই মতৈক্য আজো বিদ্যমান।"[২৭]

তিনি আরো বলেছেন, "মোটকথা, মাজহাবের অসুসরণ একটি সূক্ষ্ম বিষয়। আল্লাহ তা'আলা উলামায়ে কিরামের অন্তরে অনুপ্রেরণা দান করেছেন এবং এর সূক্ষ্মতা সম্পর্কে তাদের অনেকে অবগত হয়ে বা না হয়েও তারা এই অনুসরণের ক্ষেত্রে ঐক্যমত্যে পৌঁছেছেন।"[২৮]

একই কিতাবে তিনি আরো লিখেছেন: "ভারতবর্ষের সাধারণ কোনো ব্যক্তি যদি এমন কোন স্থানে বসবাস করেন যা মূলত 'মা- ওয়ারা'উন নাহ্‌র' [সংখ্যাগরিষ্ঠ হানাফী মাজহাবের অনুসারীদের অঞ্চল] হিসাবে স্বীকৃত এবং

[২৪] উক্বদুল জীদ, পৃ. ২৯।
[২৫] হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, খ. ১, পৃ. ৩৬১।
[২৬] ইনসাফ, পৃ. ৫৯।
[২৭] হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, খ. ১, পৃ. ৩৬১।
[২৮] ইনসাফ, পৃ. ৪৭।

সেখানে শাফিঈ, মালিকী কিংবা হাম্বলী মাজহাবের কোন আলিম না থাকেন এবং এই মাজহাবত্রয়ের কোন কিতাবাদিও না থাকে, তাহলে ঐ ব্যক্তির জন্য হানাফী মাজহাব অনুসরণ ওয়াজিব হবে। এই মাজহাব থেকে বের হওয়া তার জন্য হারাম। এর কারণ হলো, এরূপ করলে সে তার গলা থেকে 'শরীয়তের গলাবন্ধ' সরিয়ে নেবে। ফলে সে হবে একটি অকেজো ও ব্যর্থ আত্মা।"[২৯]

উচ্চ পর্যায়ের মুজতাহিদ গবেষক হওয়া সত্ত্বেও শাহ ওয়ালিউল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে স্বয়ং রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছিলেন মাজহাবের অনুসরণ করতে। শাহ সাহেব তাঁর 'ফুয়ুযুল হারামাইন' গ্রন্থে [পৃ. ৬৪-৬৫] লিখেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে তিনটি জিনিস পালন করতে নির্দেশ দিয়েছেন যার উপর প্রথমতঃ তাঁর আকর্ষণ ছিলো না। বাস্তবে তিনি এগুলোর কট্টর বিরোধী ছিলেন। এগুলো পালনের প্রতি ফিরে আসা ছিলো: (তিনি লিখেছেন) এসব ব্যাপার সত্য হওয়ার দলিল। এ তিনটি বিষয়ের দ্বিতীয়টি ছিলো 'চার মাজহাবের একটির অনুসরণ ও একে কখনো পরিত্যাগ না করা'। তিনি আরো বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জানিয়েছেন, হানাফী মাজহাবের উসূল সর্বাধিক উত্তম ও সুন্নাতের সর্বাপেক্ষা কাছাকাছি। এসব উসূল ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও তাঁর সমসাময়িকদের যুগে লিপিবদ্ধ হয়েছিল।" [প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮]

গায়র মুকাল্লিদরা মানুষকে এই বলে বোকা বানাতে চেষ্টা করেন, 'হাদিস সংকলক মুহাদ্দিসীনে কিরাম কোনো মাজহাব অনুসরণ করেন নি।' কথাটি মূলত ভিত্তিহীন। মাত্র এক দু'জন ছাড়া প্রায় সকলেই তাক্বলিদ করেছেন।

ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মুজতাহিদ পর্যায়ের গবেষক হয়েও শাফিঈ মাজহাবের অনুসরণ করেছেন। গায়র মুকাল্লিদদের নেতা ভূপালের নবাব সিদ্দীক হাসান খান তার 'আল-হিত্তা ফী জিকরি সিহাহিস সিত্তা' গ্রন্থে বলেন: "ইমাম আবু আসিম শাফিঈ মাজহাবের অনুসারীদের তালিকায় ইমাম বুখারীর নামও লিপিবদ্ধ করেছেন।" একই বইয়ে ইমাম নাসাঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সম্পর্কে বলেন, "তিনি দ্বীনের এক বিশাল ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ছিলেন

[২৯] ইনসাফ, পৃ. ৭০-৭১।

হাদিস শাস্ত্রের এক শক্ত খুঁটি। তিনি স্বীয় যুগের মুহাদ্দিসীন ও ফকীহদের নেতা ছিলেন। বর্ণনাকারীদের উপর সমালোচনাকারী হিসাবে তিনি উলামায়ে কিরাম কর্তৃক উচ্চ প্রশংসা লাভে ধন্য হন। তিনি ছিলেন শাফিঈ মাজহাবের অনুসারী।" [উক্ত কিতাব, পৃ. ২৭]

নবাব সাহেব ইমাম আবু দাউদ সম্পর্কে বলেন, "তিনি হাদিসের হাফিজ ছিলেন। তিনি উচ্চ পর্যায়ের পরহেজগার, তাক্বওয়া অবলম্বনকারী, দ্বীনদার-জ্ঞানবান ব্যক্তি হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি কোন্ মাজহাব অনুসরণ করতেন এ ব্যাপারে মতানৈক্য আছে। কেউ বলেন তিনি ছিলেন হাম্বলী, অন্যদের মতে তিনি ছিলেন শাফিঈ।" [প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫]

উপরোক্ত মুহাদ্দিসীনে কিরাম ছাড়াও অধিকাংশ সহীহ বর্ণনানুযায়ী ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযি, ইমাম বাইহাকী, ইমাম দার কুতনী ও ইমাম ইবনে মাজাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম শাফিঈ মাজহাবের অনুসারী ছিলেন। মুহাদ্দিস ইমাম ইয়াহইয়া বিন মা'ঈন, ইমাম ইয়াহইয়া বিন আবি জাঈদাহ, ইমাম তাহাবী এবং ইমাম জাইলা'ঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম ছিলেন হানাফী মাজহাবের অনুসারী।[৩০]

আমাদের প্রশ্ন, উক্ত মুহাদ্দিসীনে কিরামসহ অসংখ্য ফকীহ উলামায়ে কিরাম এটা বুঝতে কী সক্ষম হন নি যে, তাক্বলিদ শিরক? অথচ এ কথাটিই বলছেন আজকের গায়র মুকাল্লিদরা। শুধুমাত্র দাউদ জাহিরী ও ইবনে হাজম ছাড়া আর কেউ বুঝি ব্যাপারটি অনুধাবন করেন নি? কী অদ্ভুত, অযৌক্তিক, অগ্রহণযোগ্য দাবী! গণনাতীত মুহাদ্দিসীন, ফকীহ উলামা, মাশাইখে কিরাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম যুগ যুগ ধরে তাক্বলিদ করে আসছেন। শুধুমাত্র আমাদের উপমহাদেশের উলামা ও আউলিয়ায়ে কিরামের প্রতি দৃষ্টিপাত করে দেখুন। বিখ্যাত একজনও পাবেন না যিনি তাক্বলিদ করেন নি। আর এঁদের প্রায় সকলেই ছিলেন এবং এখনো আছেন হানাফী মাজহাবপন্থী। আমরা দ্বীনের তারকাসদৃশ এসব মহাত্মনের মধ্য হতে কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করার প্রয়াস পাচ্ছি। নিম্নোক্ত সকলেই ছিলেন হানাফী মাজহাবের অনুসারী।

[৩০] হযরত মুফতি আবদুর রহীম লাজপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রণীত ফাতওয়ায়ে রাহিমীয়া দ্রঃ।

১. শায়খ আলী মুত্তাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ৯৭৫ হি.]। তিনি ছিলেন বিখ্যাত কিতাব ‘কানযুল উম্মাল’ এর লেখক।

২. শায়খ আবদুল ওয়াহ্হাব বুহানপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১০০১ হি.]।

৩. শায়খ মুহাম্মদ তাহির পাটনী গুজরাটী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ৯৮৭ হি.]। তিনি ছিলেন ‘মাজমু’আল বিহার’ কিতাবের লেখক।

৪. মুহাদ্দিস মুল্লা জিওয়ান সিদ্দীকি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১১৩০ হি.]।

৫. মুহাদ্দিস শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১১৫২ হি.]। বিখ্যাত এই মুহাদ্দিস ‘আশি’আতুল লাম’আত’ কিতাবের প্রণেতা। তাঁর পুত্র হযরত নূরুল হক দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিও [মৃ. ১০৭৩ হি.] একজন উচ্চ পর্যায়ের মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি বুখারী শরীফের শরাহ ‘তাইসিরুল ক্বারী’ গ্রন্থের রচয়িতা।

৬. মুহাদ্দিস শায়খ ফখরুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি বুখারী শরীফ ও হিসনুল হাসীন কিতাবদ্বয়ের উপর শরাহ লিখেন।

৭. মুহাদ্দিস শায়খ সালামুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১২২৯ হি.]। তিনি মুয়াত্তায়ে ইমাম মালিকের উপর শরাহ গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

৮. শাহ আবদুর রহীম মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। [মৃ. ১৭১৯ ঈ.]

৯. শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১১৭৬ হি.]।

১০. শাহ আবদুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১২৩৯ হি.]।

১১. শাহ আবদুল কাদির মুহাদ্দিস ও মুফাস্সিরে দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১২৩২ হি.]।

১৩. শাহ আবদুল গনি মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১২৯৬ হি.]।

১৪. শাহ ইসমাঈল শহীদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১২৪৬ হি.]।

১৫. শাহ কুতুবুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১২৮৯ হি.]। তিনি ‘মাজাহিরে হক্ব’ নামক গ্রন্থের লেখক।

১৬. শাহ রফীউদ্দীন মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১২৩৩ হি.]।

১৭. শাহ মুহাম্মদ ইয়াকুব মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১২৮২ হি.]।

১৮. কাজি মুহিবুদ্দীন বিহারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১১১৯ হি.]। উসূলে ফিক্হের বিখ্যাত গ্রন্থ ‘মুসাল্লামুছ ছুবুত’ এর রচয়িতা। তিনি ১১০৯ হিজরি সনে এটি প্রকাশ করেন।

১৯. মুহাদ্দিস ও মুফাস্সির কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১২২৫ হি.]। তাফসীরে মাজহারী কিতাবের রচয়িতা।

২০. শাইখুল ইসলাম আল্লামা নূরুদ্দীন আহমদাবাদী গুজরাটী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১১৫৫ হি.]। বুখারী শরীফের শরাহ ‘নূরুল ক্বারী’ গ্রন্থের রচয়িতা।

২১. শায়খ ওয়াজিহুদ্দীন আলাওয়ী গুজরাটী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ৯৯৮ হি.]।

২২. মুহাদ্দিস ও মুফতি আবদুল করীম নাহরাওয়ানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১১৪১ হি.]। বুখারী শরীফের শরাহ ‘নাহরুল জারী’ গ্রন্থের প্রণেতা।

২৩. আল্লামা মুহিউদ্দীন আহমদাবাদী গুজরাটী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১০৩৮ হি.]।

২৪. মুহাদ্দিস শায়খ খাইরুদ্দীন বিন মুহাম্মদ জাহিদ সুরতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১২০৬ হি.]।

২৫. বাহরুল উলূম শায়খ আবদুল আলী লৌক্ষনৌভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১২২৫ হি.]। 'মুসাল্লামুছ ছুবুত' ও অন্যান্য গ্রন্থের ব্যাখ্যাদাতা।

২৬. আল্লামা আবুল হাসানাত আবদুল হাই লৌক্ষনৌভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১৩০৪ হি.]। তিনি অনেক দ্বীনি গ্রন্থ রচনা করেছেন।

২৭. মুহাদ্দিস মাওলানা আহমদ আলী সাহারানপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১২৯৭ হি.]। তিনি বুখারী শরীফের উপর নোট লিখেছেন।

২৮. মুতাকাল্লিমুল ইসলাম মাওলানা কাসিম নানুতুবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১২৯৮ হি.]। বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা।

২৯. মুহাদ্দিসে কবীর হযরত মাওলানা শায়খ রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১৩২৩ হি.]।

৩০. মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব নানুতুবী মুজাদ্দিদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১৩০২ হি.]।

৩১. মুহাদ্দিস মাওলানা ফখরুল হাসান গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১৩১৭ হি.]।

৩২. শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১৩৯৯ হি.]।

৩৩. মুহাদ্দিসে কবীর আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১৩৫২ হি.]।

৩৪. মুহাদ্দিস মাওলানা খলীল আহমদ আম্বেটী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১৩৪৬ হি.]। আবু দাউদ শরীফের শরাহ 'বায্লুল মাজহুদ' এর লেখক।

৩৫. মাওলানা সাব্বির আহমদ উসমানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১৩৬৯ হি.]। সহীহ মুসলিম শরীফের শরাহ 'ফাতহুল মুলহিম' এর লেখক।

৩৬. মুফাস্সির, মুহাদ্দীস ও ফকীহ হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১৩৬২ হি.]। বিখ্যাত

কিতাব বেহেশতী জেওর ও তাসফীরুল কুরআন 'তাফসীরে আশরাফি' এর রচয়িতা।

এই তালিকা অনেক দীর্ঘ করা যায়। কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় এখানে থেমে যাচ্ছি। ভারতবর্ষে আরো হাজার হাজার উচ্চ পর্যায়ের উলামায়ে কিরাম জীবনভর দ্বীনের খেদমত করে গেছেন। এদের প্রায় সবাই ছিলেন হানাফী মাজহাবের অনুসারী। এছাড়া অসংখ্য পীর-আউলিয়া, শায়খ-মাশায়িখের পবিত্র পদচারণায় ধন্য আমাদের এই উপমহাদেশ। এসব মহাত্মন ব্যক্তিদের প্রায় সকলেই হানাফী মাজহাবপন্থী ছিলেন। এদের হাতে অসংখ্য মানুষ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছেন। সুতরাং মাজহাবপন্থীরা 'শিরক' করছেন বা করেছেন বলা সত্যিই পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না! মস্তিষ্ক বিকৃতি ছাড়া এরূপ উদ্ভট ও অসভ্য উক্তি কেউ করতে পারে না। অথচ মুসলিম নামধারী গায়র মুকাল্লিদদের কেউ কেউ এরূপ বলে থাকেন। নাউযুবিল্লাহ।

আমাদের সৌভাগ্য যে, আল্লাহ তা'আলা চারজন মহাত্মন ইমামের জন্ম দিয়েছিলেন যাদের জীবনভর গবেষণা ও ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের সন্তুষ্টির কারণ হয়েছে। 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত' এর অন্তর্ভুক্ত সকল মুসলমানের মধ্যে ঐক্যমত্য সৃষ্টি হয়েছে এই চারটি ফিক্হের অনুসরণ সঠিক দ্বীন পালনের পথ হিসাবে। প্রত্যেক যুগের উচ্চ পর্যায়ে উলামায়ে কিরাম বার বার এ সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন যে, কেউ যদি তাক্বলিদ পরিত্যাগ করে তাহলে তার জীবন হবে দিগভ্রান্ত, সে হয়ে ওঠবে নফসে আম্মারার তাবেদার এবং দ্রুত ধাববান হবে বিদআতের দিকে। সে কখনো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতভুক্ত থাকবে না। তার পরিণতি শিয়া, মুরজি, কারামতি, খারিজী, মুতাজিলীদের মতো হতে পারে। এমনকি ইসলাম থেকে বের হওয়ারও আশঙ্কা আছে। যেমন কাদিয়ানী, ইসমাঈলী ও বাহায়ীরা হয়েছে। মোটকথা, তাকলীদ ছাড়া একমাত্র 'মুজতাহিদ মতলক' ফকীহ ব্যক্তি ব্যতিত কেউ কখনো দ্বীনের উপর সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবে না। গায়র মুকাল্লিদরা এখনই বেশ কিছু আক্বীদা পোষণ করেন যা মূলত শিয়াদের আক্বীদার অনুরূপ। নিম্নে কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি।[৩১]

[৩১] এই তালিকা ফাতওয়ায়ে রাহিমীয়া থেকে উদ্ধৃত।

১. শিয়াদের একটি বড় ফিরকার নাম 'রাওয়াফিয'। এদের আক্বীদা হলো সাহাবায়ে কিরাম সত্যের মাপকাঠি নন। একই আক্বীদা পোষণ করেন গায়র মুকাল্লিদরা। মওদুদীবাদের তিন উসূলের প্রধান উসূলই তো এ'টি। অথচ 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতভুক্ত' সকল মুসলমানের আক্বীদাসমূহের গুরুত্বপূর্ণ একটি হলো, 'সাহাবায়ে কিরাম' সত্যের মাপকাঠি।

২. রাওয়াফিযদের মতো গাইর মুকাল্লিদরাও বিশ্বাস করে একসাথে তিনটি তালাক দিলে তা একটির সমান। এই ফাতওয়া ইবনে তাইমিয়্যা দিয়েছিলেন। এখন সালাফিরা একে আঁকড়ে ধরেছে।

৩. ঠিক রাওয়াফিযদের মতো গাইর মুকাল্লিদরা বিশ্বাস করে তারাবী নামায ২০ রাকাআত আদায় করা বিদআত। এ আক্বীদা দ্বারা তারা বলছেন, সমগ্র সাহাবায়ে কিরাম, তাবিয়ী, তাবে তাবিয়ীন বিদআতী ছিলেন। নাউযুবিল্লাহ! কারণ ২০ রাকাআত তারাবী নামায পড়ার ক্ষেত্রে বৃহত্তর ইজমা হয়েছে সাহাবায়ে কিরামের যুগে।

৪. রাওয়াফিযরা বিশ্বাস করে জুমু'আর নামাযে দ্বিতীয় আযান একটি বিদআত। গায়র মুকাল্লিদরাও একই কথা বিশ্বাস করে। অথচ হযরত উসমান ইবনে আফ্‌ফান রাদ্বিআল্লাহু আনহুর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সকল মসজিদে দ্বিতীয় আযান হচ্ছে। এ ব্যাপারে উম্মাহ্‌র মধ্যে মতৈক্য হয়েছে।

৫. সকল শিয়া ও রাওয়াফিয গোষ্ঠির মতো গাইর মুকাল্লিদরা হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু কর্তৃক মহিলাদেরকে মসজিদে এসে নামায পড়তে নিষিদ্ধকরণ মানে না। অথচ হযরত আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা বলেন: "এখন মসজিদে এসে মহিলারা যা করছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত থাকলে এদেরকে নিষেধ করে দিতেন।" মসজিদে মহিলাদের নামায আদায়ের নিষিদ্ধকরণের ব্যাপারে উম্মাহ্‌র মধ্যে ইজমা হয়েছিল।

এই তালিকা আরো দীর্ঘ করা যায়। গায়র মুকাল্লিদদের অনেক আক্বীদা যে শিয়াদের মতো, তার জন্য এটুকুই প্রমাণ হিসাবে যথেষ্ট মনে করছি।

একমাত্র শিয়া ও গায়র মুকাল্লিদরা ছাড়া উম্মাহ্‌র যাবতীয় উলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে একমত যে, তাক্বলিদ ওয়াজিব। তাঁরা বিভিন্ন গ্রন্থে এ

কথাটি বার বার লিখেছেন। মুসাল্লামুছ ছুবুত গ্রন্থে লেখা আছে: "যাঁরা এসব (দ্বীনের) ব্যাপারে অভিজ্ঞ তারা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা করে সবকিছু সারিবদ্ধভাবে বিভিন্ন পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করেছেন। তারা সব ধরনের প্রশ্ন বিবেচনায় এনেছেন, আলাদাকরণের কাজ করেছেন, প্রতিটি সিদ্ধান্তের কারণ বুঝিয়ে বলেছেন এবং খুব গভীরভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন [সাহাবায়ে কিরামের বর্ণনায় অনুরূপ গভীর আলোচনা না থাকায় সর্বসাধারণের জন্য বুঝা ও এ থেকে মাসআলা বের করা অনেকটা কঠিন]। সুতরাং মুসলমানদেরকে তাঁদের গবেষণার অনুসরণ একান্ত জরুরী। তাদের গবেষণার ফসলই হচ্ছে চার মাজহাব। মাজহাব ছাড়া বাইরে অবস্থানকারী কেউ এরূপ গভীর গবেষণা করতে সক্ষম হন নি। এ কারণেই আল্লামা ইবনে সালাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি চার মাজহাবের বাইরে অবস্থানকারী কাউকে অনুসরণ 'হারাম' বলেছেন। মাজহাবের ইমামরা ছিলেন ইমামদের ইমাম। তাদের একজন কুফার অধিবাসী (ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি), ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে সর্বোত্তম প্রতিদান দিন, এটাই আমাদের কামনা।"[৩২]

লা-মাজহাবীদের সম্পর্কে বিভিন্ন যুগের উলামায়ে কিরামের মন্তব্য[৩৩]

১. আল্লামা ইবনে নুজাইম মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ৯৭০ হি.) বলেন: "যেসব আইন দ্বারা চার ইমামের বিরোধিতা করা হয়, ওগুলো মূলত ইমজা বিরোধী [যা গ্রহণযোগ্য নয়]।"[৩৪]

২. আল্লামা ইবনে হুমাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ৮৬১ হি.] বলেন: "পরবর্তী যুগের অনেক উলামায়ে কিরাম বলেছেন, একমাত্র চার ইমামকে অনুসরণ করতে হবে। এর কারণ হলো তাঁদের মাজহাব সুস্পষ্ট দালিলিক

[৩২] হযরত মুফতি আবদুর রহীম লাজপুরী রাহ. ফাতওয়ায়ে রাহিমীয়া, পৃ. ৬২৯।
[৩৩] এ অংশের সকল উদ্ধৃতির সূত্র ফাতওয়ায়ে রাহিমীয়া।
[৩৪] আশবাহ ওয়ান নাযা'ইর, পৃ. ১৩১।

প্রমাণাদি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত যা অন্যগুলোর ক্ষেত্রে নয়। ... সুতরাং তাক্বলিদ শুধুমাত্র চার মাজহাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হলো সঠিক সিদ্ধান্ত।”[৩৫]

৩. প্রখ্যাত আলীমে দ্বীন শায়খ আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, যিনি আল্লামা মুল্লা জিওয়ান নামে সুপরিচিত [মৃ. ১১৩০ হি.], মোগল সম্রাট বাদশা আওরঙ্গজেব আলমগীর [১৬১৮-১৭০৭ ঈ.] রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উস্তাদ ছিলেন। তাঁর রচিত ‘তাফসীরাতে আহমদী’ [পৃ. ৩৪৬] কিতাবে বলেন: “শুধুমাত্র চার মাজহাবের অনুসরণ বৈধ হিসাবে ইজমা হয়েছে। এ কারণেই কোনো নতুন মুজতাহিদের চার মাজহাবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক গবেষণা ও মতামতের উপর আমল বৈধ হবে না।”

একই কিতাবে তিনি আরো লিখেছেন [পৃ. ৩৪৬]: “সবদিক থেকে বিবেচনা করলে বুঝাই যায়, চার মাজহাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে যে কোন একটির অনুসরণ আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত স্বরূপ। তাঁর নিকট এগুলোই [অর্থাৎ চার মাজহাব] গ্রহণযোগ্য। এ ব্যাপারে আর কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।”

৪. খ্যাতিমান মুফাস্‌সিরে কুরআন ও মুহাদ্দিস হযরত কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১২২৫ হি.] তাঁর রচিত ‘তাফসীরে মাজহারী’তে [খ. ২, পৃ. ৬৪] লিখেছেন: “তৃতীয় ও চতুর্থ শতক পরে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জাম’আহ চার মাজহাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। দ্বীন পালনের ক্ষেত্রে অন্য কোন মাজহাব অনুসরণ অবশিষ্ট থাকে নি। সুতরাং উম্মাহ্‌র মধ্যে মতৈক্য [ইজমা] সৃষ্টি হয়েছে এ ব্যাপারে যে, যে কোন মতামত যা চার মাজহাবের মতের সঙ্গে সাংঘর্ষিক, তা প্রত্যাখ্যাত হবে। আল্লাহ তা’আলা কুরআন শরীফে ঘোষণা দিয়েছেন: (অনুবাদ) “[যে কেউ] মু’মিনদের থেকে আলাদা পন্থাবলম্বন করে, আমি তাকে তা অনুসরণ করতে দিই যা সে করে, এবং তাকে প্রবেশ করাই জাহান্নামে। এটা নিকৃষ্ট স্থান।” [নিসা: ১১৫]”

৫. ইমাম ইব্রাহীম শারাখশী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “প্রথম [সাহাবাদের] যুগের পরে, চারটি ছাড়া অন্য কোনো মাজহাব অনুসরণ অবৈধ হয়। যে চারটি বৈধ হয় সেগুলো হলো: ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি

[৩৫] তাহরীর ফী উসূলিল ফিক্‌হ, পৃ. ৫৫২।

আলাইহি, ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং ইমাম আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাজহাব। ঠিক এ কথাই আল্লামা ইবনে সালাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন। এর কারণ হলো, এই চার মাজহাবের উসূল ও আইনকানুন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যারা এই চার মাজহাবের খাদিম ছিলেন তারা প্রত্যেকটি বিষয় অত্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন।”[৩৬]

৬. মুহাদ্দিস ইবনে হাজর মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ৮৫২ হি.] লিখেছেন, তাঁর সময়ে চারটি মাজহাব ছাড়া অন্য কোনো মাজহাব অনুসরণ অবৈধ ছিলো। এই চার মাজহাব হলো: ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমের মাজহাব।[৩৭]

৭. ‘রাহাতুল কুলুব’ গ্রন্থের লেখক খাজা নিযামুদ্দীন আওলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন: “খাজা সায়্যিদুল আবীদিন ফরিদুল হক গঞ্জে শকর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [শায়খ ফরিদুদ্দীন মাসউদ রাহ.] ১১ জিলহাজ্জ ৬৫৫ হিজরী তারিখে বলেছেন: যদিও চার মাজহাবই সত্য, এটা নিশ্চিতভাবে উল্লেখ্য যে, ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মাজহাব সর্বোত্তম এবং তিনিও ছিলেন সর্বোত্তম মুতাক্বাদ্দিমীন [আগের যুগের ফকীহ]। তাঁর মাজহাবের অনুসরণ করায় আমরা আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।”[৩৮]

৮. আল্লামা জালালুদ্দীন মাহাল্লী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “মুজতাহিদের স্তরে পৌঁছেন নি এমন কোনো ব্যক্তির জন্য চার মাজহাবের যে কোনো একটির অসুরণ ওয়াজিব।”[৩৯]

৯. মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাতা ইমাম মুহিউদ্দীন নববী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন: “উলামায়ে কিরাম বিশ্বাস করেন, [মুজতাহিদ হয়ে নতুনভাবে] ইজতিহাদ চার মাজহাবের ইমামের মাধ্যমে শেষ হয়ে গেছে।

[৩৬] ফিতনাতুল ওয়াহাবিয়া, পৃ. ১৯৯।
[৩৭] ফাতহুল মুবীন, পৃ. ১৯৬।
[৩৮] হাক্বাইক্বে হানাফিয়া, পৃ. ১০৪।
[৩৯] শাহরুল বিক্বায়া গ্রন্থের অনুবাদ নূরুল হিদায়া, পৃ. ১০।

সুতরাং উম্মাহ্র জন্য চারটি মাজহাবের যে কোন একটির অনুসরণ ওয়াজিব হিসবে সাব্যস্ত হয়েছে। বাস্তবে ইমামুল হারামাইন বর্ণনা করেছেন, উম্মাহ্র মধ্যে এ ব্যাপারে ইজমা সৃষ্টি হয়েছে।”[৪০]

একই সূত্রে উল্লেখিত আছে: “আমাদের যুগে তাক্বলিদ শুধুমাত্র চার মাজহাব অনুসরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ... (আদালতে) রায় ঘোষণা ও ফাতওয়া প্রদানের ক্ষেত্রেও চার ইমাম ছাড়া অন্য কারো অনুসরণ বৈধ নয়।” [প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫]

১০. ইমাম আবদুল ওয়াহ্হাব শারানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন: “যে কেউ কখনো আমার উস্তাদ হযরত আলী খাওয়াসকে জিজ্ঞেস করেছে তাক্বলিদ করা ওয়াজিব কি না, তিনি উত্তর দিতেন: ‘যে কোন একজন ইমামের অনুসরণ ও তাঁর মাজহাব মানা তোমার জন্য ওয়াজিব যতক্ষণ না তুমি নিষ্কলুষ পরহেজগারী ও ঐশী অনুপ্রেরণায় মুজতাহিদ হওয়ার স্তরে উন্নীত না হও।”[৪১]

১১. কুরআন-হাদিসের খ্যাতিমান গবেষক আলিম সাইয়েদ আহমদ তাহতাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১২৩৩ হি.] বলেন: “হে লোকগণ! তোমাদেরকে ঐ দলের অনুসরণ একান্ত জরুরী যারা জাহান্নামের আগুন থেকে নাজাত পাবে। আর এই দলটি হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জাম’আত। এদের সঙ্গে থাকলে আল্লাহর সাহায্য লাভ হবে। এদের বিরোধিতা করলে আল্লাহর সাহায্য থেকে বঞ্চিত এবং তাঁর গোস্বা ও অসন্তুষ্টি প্রাপ্ত হবে। এই সফল দলের মধ্যে এখন ইজমা হয়েছে যে, চার মাজহাবের অনুসরণ করতে হবে। এগুলো হলো: হানাফী, মালিকী, শাফিঈ ও হাম্বলী ফিক্হ। যে কেউ চার মাজহাবের বৃত্তের বাইরে থাকবে সে হবে বিদআতীদের অন্তর্ভুক্ত ও জাহান্নামী।”[৪২]

১৩. শাহ ইসহাক মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একটি প্রশ্নের উত্তরে নিম্নলিখিত কথাগুলো বলেছেন:

[৪০] রাওযাতুত্ তালিবীন, নূরুল হিদায়া থেকে উদ্ধৃত।
[৪১] মিযানুশ্ শারীয়াতিল কুবরা।
[৪২] তাহতাওয়ী ’আলা দুররুল মুখতার, খ, ৪, পৃ. ১৫৩, ফাতওয়ায়ে রাহিমীয়া থেকে উদ্ধৃত।

“প্রশ্ন ৬১: চার মাজহাবের অনুসরণ একটি ভালো বিদআত না মন্দ বিদআত? যদি এটা মন্দ বিদআত হয়ে থাকে তাহলে তা কোন্ পর্যায়ভুক্ত?

জবাব: চার মাজহাবের অনুসরণ ভালো কিংবা মন্দ বিদআত নয়, বরং একটি সুন্নাত। এর কারণ হলো, প্রথমতঃ মাজহাবসমূহের মধ্যে যেসব মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে তা সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুমের মধ্যেও ছিলো। এরপরও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন: “আমার সাহাবাগণ আকাশের অনুসরণযোগ্য তারকাদের মতো। তোমারা যাকেই অনুসরণ করো না কেনো, সঠিক পথনির্দেশনার উপর থাকবে।” দ্বিতীয়তঃ তাদের মতানৈক্যের কারণ হতে পারে, যৌক্তিকতায় তাদের মধ্যে পার্থক্য থাকা। আর এটা নাসের [কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত ও সর্বাধিক সহীহ হাদিসের] অন্তর্ভুক্ত। কারণ ওসব যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নাস দ্বারা প্রমাণিত। তৃতীয়তঃ তাদের মধ্যে মতানৈক্য হয়েছে কারো কারো মতে হাদিসের সরাসরি [শাব্দিক] অর্থের উপর গুরুত্ব ও আমলের উপর অগ্রাধিকারের কারণে। অপরদিকে অন্যরা মনে করেছেন, একই হাদিসের উদ্দেশ্যমূলক অর্থের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। যেমন: মুত্তাফাকুন আলাইহিতে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে: যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা রাদ্বিআল্লাহু আনহুমদেরকে নির্দেশ দিলেন, বনু কুরাইজায় ছুটে যাও এবং সেখানে পৌঁছার পূর্বে আসরের নামায আদায় করবে না। তখন, কিছু কিছু সাহাবা এই নির্দেশকে শাব্দিক অর্থে গ্রহণ করলেন এবং বনু কুরাইজায় পৌঁছে আসরের নামায পড়লেন, যদিও নামাযের ওয়াক্ত প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছিলো। কিন্তু অপর একদল রাস্তায় থাকাবস্থায় আসরের ওয়াক্ত হওয়ায় বনু কুরাইজায় পৌঁছার পূর্বেই নামায আদায় করে নিলেন। ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্ণগোচর হলে তিনি উভয় দলের কাউকেই কিছু বললেন না। বুঝা গেলো উভয়ের আমলই গ্রহণযোগ্য হয়েছে। অনুরূপ মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে চার মাজহাবের মধ্যে। সুতরাং একে কিভাবে বিদআত বলা যায়?”[৪৩]

১৪. মুফতি আবদুর রহীম লাজপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অনুরূপ একটি প্রশ্নের জবাবে বলেন:

[৪৩] মি’আহ মাসাঈল কিতাবের অনুবাদগ্রন্থ ইমদাদুল মাসাঈল, পৃ. ১০১-১০২।

“প্রশ্ন: মাজহাব অনুরাসীদেরকে বিদআতী বলা যায় কি না?

জবাব: মাজহাব অনুসরণকারী কখনো বিদআতী নয়। এর কারণ হলো চার মাজহাবের অনুসরণ মানে হাদিসের অভ্যন্তরীণ ও প্রকাশ্য ব্যাখ্যার অনুসরণ। হাদিস অনুসরণকারীদেরকে যে ব্যক্তি ‘বিদআতী’ বলে সে একজন দিগভ্রান্ত ব্যক্তি।[৪৪]

১৫. ইমামে রব্বানী হযরত আহমদ সিরহিন্দ মুজাদ্দিদে আলফে সানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “পক্ষপাতহীনভাবে বলা যায়, ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মাজহাব আলোকিত মনের অধিকারীদের নিকট একটি বিরাট মহাসাগর হিসাবে পরিলক্ষিত হয়, আর অপর তিনটি মাজহাব যেনো নদ-নদী ও জলাশয়। যখন আমরা গভীরভাবে লক্ষ্য করি তখন এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, পৃথিবীর সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান এই মাজহাব অনুসরণ করেন। একই সময় বিরাট সংখ্যক অনুসরণকারী থাকা সত্ত্বেও এই মাজহাবের মূলতত্ত্ব, সিদ্ধান্তসমূহ ও আইন প্রণয়ন পদ্ধতি অপর তিনটি থেকে আলাদা। এটা অত্যন্ত আশ্চর্যজনকভাবে লক্ষ্যণীয় যে, ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সুন্নাতের অনুসরণে কতো সতর্ক ছিলেন। তিনি যেমন একদিকে ‘মুরসাল’ হাদিসের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন ঠিক তেমনি ‘মুসনাদ’ হাদিসের প্রতিও বিশেষ দৃষ্টিপাত করেছেন। নিজের ব্যক্তিগত মতামতের উপর উক্ত দু’ধরনের হাসীদের প্রতি অগ্রাধিকার দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সুহবতের অধিকারী সাহাবায়ে কিরামের মতামতকে তিনি নিজের মতামত থেকে বেশী গুরুত্বসহ বিবেচনা করেছেন। অথচ অন্যরা অনুরূপ করেন নি। এরপরও তাঁর বিরোধীরা তাঁকে ‘ব্যক্তিগত মতামতের অনুসারী’ বলে দোষী সাব্যস্ত করার প্রয়াস পান। এছাড়া, তারা আরো কিছু অসাধু বক্তব্য দ্বারা তাঁকে আক্রমণ করে থাকেন। অথচ সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, তিনি ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানবান ও উচ্চপর্যায়ের পরহেজগার ব্যক্তি। আল্লাহ তা’আলা তাদেরকে বোধোদয় দান করুন। তারা যেনো ইসলামের এই মহাত্মন নেতাকে আর আক্রমণ করে বিশ্বের অধিকাংশ মুসলমানের হৃদয়ে আঘাত না দেন।

[৪৪] মি’আহ মাসাঈল কিতাবের অনুবাদগ্রন্থ ইমদাদুল মাসাঈল, পৃ. ১০২।

উক্ত আক্রমণকারীরা (গায়র মুকাল্লিদরা) যেনো মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে উড়িয়ে দিতে চান এ কথা বলে যে, মহাত্মন এই ব্যক্তিগণ (ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ ও ইমাম হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম) নাকি নিজেদের মতামত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিলেন। এরূপ বলে তারা প্রকারান্তরে এটাই বলছেন যে, উম্মাহ্‌র এক বিরাট অংশ বা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ অজ্ঞ! তারা এটাও বুঝাচ্ছেন যে, এই অজ্ঞতার ব্যাপারেও সবাই অজ্ঞ!! কারণ তারা অনুসরণ করছেন চারজন মানুষের ব্যক্তিগত মতামত। অথচ এই স্বল্পসংখ্যক অপরিপক্ক (গায়র মুকাল্লিদর) লোকগণ মাত্র কয়েকটি হাদিস পড়ে মনে করেন শরীয়তের সবকিছু তারা শিখে ফেলেছেন! তাদের ধারণা জন্মে, নিজেদের স্বল্প জ্ঞানের বাইরে আর কিছু নেই! তারা হচ্ছেন ঐ ক্ষুদ্র কেঁচোর মতো যে বাস করে তার ছোট্ট গর্তে। তারা জগতকে ঐ গর্তের মতো দেখেন। মনে করেন, এই গর্তই সমগ্র জগৎ। তারা কখনো দেখেন নি বাস্তব বিশ্বকে। এরূপ লোক পক্ষপাতদুষ্টে আক্রান্ত ও ব্যর্থ প্রচেষ্টায় লিপ্ত।”[৪৫]

১৬. শাহ মুহাম্মদ হিদায়াত আলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উল্লেখ করেন: “যার তাফসীর, হাদিস এবং ফিক্‌হের উপর বিশুদ্ধ জ্ঞান আছে, জ্ঞান আছে মানসুখ আয়াতমালা সম্পর্কে এবং আরবী ভাষার উপর পূর্ণাঙ্গ দক্ষতা অর্জিত হয়েছে, একমাত্র তিনিই ইজতিহাদের যোগ্যতা লাভ করেছেন। তার জন্য তাক্বলিদ জরুরী নয়। এসব বিষয়ে কারো জ্ঞানে পরিপূর্ণতার অভাব থাকলে অবশ্যই তাকে কোনো একজন ইমামের অনুসরণ করতে হবে- এটা তার জন্য ওয়াজিব। বাস্তবে, উক্ত বিষয়সমূহে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের অধিকারী এমন ব্যক্তির জন্যও কোনো না কোনো ইমামের অনুসরণ উত্তম।

এটা দেখতে অদ্ভুত লাগে, তাফ্‌সীর, হাদিস ও ফিক্‌হের জ্ঞানের কথা দূরে থাক, হরকত ছাড়া আরবীতে শুদ্ধ করে তিলাওয়াত করতে ব্যর্থ, এমন কিছু লোকও সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেছেন, কোনো ইমামকে অসুসরণ না করার। তারাও বলে বেড়ান, ইমামকে অনুসরণ নাকি শির্‌ক! অথচ কুরআন-হাদিস থেকে কিভাবে শরয়ী আইন বের করতে হয়, সে ব্যাপারে এসব লোকের কোনো ধারণাই নেই। তারা এটাও বুঝতে অপারগ যে, তাফসীর, হাদিস ও ফিক্‌হ শাস্ত্রে উচ্চ পর্যায়ের গবেষকরা পর্যন্ত ইমাম আবু হানিফাকে অনুসরণ

[৪৫] মাকতুবাতে ইমামে রব্বানী, খ.২, পৃ. ১৭৮-১৭৯।

করেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখানে শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী ও শাহ আবদুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমার কথা উল্লেখ করা যায়। এতো উচ্চ পর্যায়ের ফকীহ্ হয়েও তাঁরা ইমামে আজমের অনুসরণ করেছেন। এ যুগের ক'জন আলিম তাঁদের থেকেও জ্ঞানবান এবং পরহেজগার হওয়ার দাবী করতে পারেন? এই লোকগুলো (গায়র মুকাল্লিদরা) বাস্তবে মহাত্মন ব্যক্তিদের ছেড়ে কিছু অজ্ঞ লোকদের অনুসরণ করছেন। এরা আরবী তো দূরের কথা উর্দু ভাষার উপরও পর্যাপ্ত জ্ঞান রাখেন না। অথচ তাদের দাবী, তারা নাকি 'হাদিসের গোষ্ঠি' (আহলে হাদিস)! আপনি যদি এদের জিজ্ঞেস করেন, আপনারা কোথেকে দ্বীনের ঈমান-আমল শিখেছেন? তারা আপনাকে বলবেন, অমুক-তমুক ব্যক্তির নিকট থেকে শুনেছি ও শিখেছি। এটা যদি তাক্বলিদ না হয়, তাহলে তাক্বলিদ কি হতে পারে?"[৪৬]

শাহ হিদায়াত আলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আরো লিখেছেন: "মুজতাহিদ ইমামদের অনুসরণ ওয়াজিব। এর কারণ হলো, আরবী ভাষা, তাফ্সীর, হাদিস, ফিক্হ, উসূলে ফিক্হ, রহিত আয়াতমালা এবং আরবী বাগধারার উপর তাঁরা ছিলেন সর্বাধিক জ্ঞানবান। আর এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন: "জিজ্ঞেস করো জ্ঞানবানদের, যদি তুমি না জানো।" উক্ত বিষয়সমূহের একটির উপরও কারো জ্ঞানের ত্রুটি থাকলে তার জন্য একজন ইমামের অনুসরণ ওয়াজিব। ... এটা আজকের যুগের সর্বাপেক্ষা দুঃখজনক ঘটনা যে, যাদের জ্ঞানের সমষ্টিও ইমামদের সঙ্গে তুলনীয় নয়, তারাই ওসব মহাত্মনের বিরুদ্ধে বিষোদগার ছড়াচ্ছেন। তারা ইমামদের অনুসরণ থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে নিয়ে নিজেদের অপরিপূর্ণ ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্তকে অনুসরণে প্রেরণা যোগাচ্ছেন।"[৪৭]

১৭. আল্লামা আবদুল হক হক্কানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন: "যদি প্রত্যেক লোক এসব (শরয়ী) ব্যাপারে নিজেদের মতামত পেশ করে বসেন, তাহলে বিরাট বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। [প্রাথমিক যুগে] সাহাবায়ে কিরাম রিদ্বওয়ানুল্লাহি তা'আলা আজমাঈন যে কোনো ব্যাপার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতেন। কিন্তু পরবর্তীতে তৃতীয়

[৪৬] দুররে লাছানী, খ.২. পৃ. ৬১-৬২।
[৪৭] আহসানুল তাক্ববীম, পৃ. ১৩৭-১৩৮।

শতক থেকে যখন নতুন অবস্থার আবির্ভাব ঘটতে থাকলো তখন ইমামরা কুরআন ও হাদিস শরীফ গভীরভাবে অধ্যয়ন করে শরয়ী আইন-কানুন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লিপিবদ্ধ করলেন। এরপর থেকে সমগ্র উম্মাহ্ এসব আইন-কানুন এ যুগ পর্যন্ত মেনে এসেছেন। যে কেউ এসব আইন-কানুন ছাড়া ভিন্নমত পোষণ করে সে অবশ্যই উম্মাহ্র বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মতৈক্যের বিরোধিতা করলো।

আজকাল মহাত্মন মুজতাহিদীনে কিরামকে সমালোচনার এক অশুভ চক্রান্ত শুরু হয়েছে। এমনকি তারা ইমামে আজমকে এই বলে সমালোচনার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে যে, তিনি নাকি কুরআন-হাদিস বিরোধী! [নাউযুবিল্লাহ] এটা অবশ্যই বিভ্রান্তি ছড়ানোর অপচেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ মহামান্য মুজতাহিদ মতলক ইমামে আজম রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কোনো একটিও মতামত কুরআন-হাদিস বিরোধী নয়- বরং এর অনুকূলে। তাঁর মর্যাদাকে আল্লাহ তা'আলা সংরক্ষণ করেছেন। হাজার বছরের অধিক সময়ব্যাপী অসংখ্য মানুষ হানাফী মাজহাব অনুসরণ করে ধন্য হয়েছেন। হযরত আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মাজহাবকে যারা বিপথগামী বলে তারা মূলত সমগ্র উম্মাহ্র সর্বাপেক্ষা বড়ো অংশকে দোষী বলছে- যা আদৌ সম্ভব নয়। দীর্ঘদিন এভাবে গণনাতীত মানুষ বিপথগামী ছিলো এরূপ উদ্ভট দাবী কুরআন ও হাদিস শরীফের যেসব বর্ণনায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের দলকে প্রশংসা করা হয়েছে তার সঙ্গে সরাসরি সাংঘর্ষিক।"[৪৮]

১৮. শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেন: "যারা নিজেদেরকে 'আহলে হাদিস' বলে দাবী করে তারা শুধুমাত্র বর্ণনাকারীদের সনদ সংগ্রহ এবং কোন্‌টি গরীব কিংবা কোন্‌টি শায ইত্যাদি খুঁজে বের করেন অনেক মাওযু কিংবা মাক্বলুব হাদিস থেকে। তারা নিজেদেরকে হাদিসের শব্দাবলীর সঙ্গে জড়িত করেন না। হাদিসের অন্তর্নিহিত অর্থও তারা বুঝেন না। হাদিসের উপর গভীর গবেষণা করে শরয়ী আইন প্রতিষ্ঠা করার সামর্থও তাদের নেই। অথচ এই লোকগুলো আবার ফকীহদেরকে নিন্দা জানায়, এবং দাবী করে তারা নাকি কুরআন-হাদিস বিরোধী! এ লোকগুলো কখনো বুঝে না যে, আল্লাহ তা'আলা ফকীহ

[৪৮] আক্বাঈদুল ইসলাম, পৃ. ১১২-১১৩।

উলামাদেরকে যে জ্ঞান দান করেছেন তা তাদের ভাগ্যে কখনো জুটবে না। তারা সত্যিই এরূপ নেতিবাচক উক্তি দ্বারা নিজেদেরকে গোনাহগার করছে।”[৪৯]

শরয়ী আইন বুঝার জন্য হাদিস মুখস্ত থাকাই যথেষ্ট নয়

হাদিস মুখস্ত থাকা এবং এর শাব্দিক অর্থ বুঝাই শরয়ী আইন অনুধাবনের জন্য যথেষ্ট নয়। ‘ফিক্হ’ বিষয়ের উপর গভীর জ্ঞান একান্ত জরুরী। এছাড়া ফিক্হ শাস্ত্রের উসূল জানাও দ্বীনকে সঠিকভাবে বুঝার চাবিকাঠি। এসব জ্ঞানের অধিকারী না হলে শরয়ী আইন-কানুনের সূক্ষ্ম ও সঠিক অর্থ কখনো বোধগম্য হবে না। হাদিসের বাহ্যিক অর্থকে যারা খুব বেশী অগ্রাধিকার প্রদানে কট্টরতা দেখায় তারা এমন কিছু মাসআলা প্রকাশ করেছে বলে জানা যায়, যা কখনো গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। নিম্নে এর কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হলো।

১. হাদিসের বিখ্যাত গ্রন্থ ‘কানযুল উম্মাল’-এ নিম্নলিখিত কথাগুলো লিপিবদ্ধ আছে।

“মুজাহিদ বলেন: “আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা একদা নামায আদায় করছিলেন। এ সময় হযরত আ’তা, হযরত তাউস, হযরত ইকরিমা ও আমি [বর্ণনাকারী হযরত মুজাহিদ] পাশেই বসা ছিলাম। আমরা সকলেই ছিলাম তাঁর [সাহাবী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর] ছাত্র। এক ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ‘এখানে কোনো মুফতি আছেন কি?’ আমি জবাব দিলাম, ‘আপনার প্রশ্ন করুন?’ তিনি বললেন, ‘প্রত্যেকবার যখন আমি প্রস্রাব করি, শেষের দিকে কিছু তরল পদার্থ ফিনকি দিয়ে বের হয়ে আসে।’ আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ‘এটা কি ঐরূপ পদার্থ যার দ্বারা শিশু জন্ম নেয়?’ তিনি যখন হাঁসূচক জবাব দিলেন তখন আমরা ফাতওয়া দিলাম: [প্রত্যেকবার এরূপ হওয়ার পর] তিনি যেনো গোসল করেন। তিনি একথা শুনে ‘ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজীউন’ বলতে বলতে ফিরে যাচ্ছিলেন। এদিকে

[৪৯] ইনসাফ, পৃ. ৫৩।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা সালাম ফিরিয়ে দ্রুত নামায শেষ করে বললেন, ‘ইকরিমা! যাও, ঐ লোকটিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসো!’ হযরত ইকরিমা যখন তাকে নিয়ে আসলেন, হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা আমাদের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, ‘আমাকে বলুন, আপনারা এই লোকটিকে যা বললেন, তার সূত্র কি কিতাবুল্লাহ্?’ আমরা স্বীকার করলাম, ‘জি না!’। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘তাহলে কি এর সূত্র হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম?’ আমরা যখন এবারও স্বীকার করলাম, ‘জি না!’, তিনি বললেন, ‘তাহলে এর সূত্র কি আসহাবে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুম?’ এবারও জবাব দিলাম, ‘জি না!’। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘তাহলে তোমরা এই ফাতওয়া কোত্থেকে শিখলে?’ বললাম, ‘আমরা নিজেদের বিবেচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি।’ তিনি একথা শুনে মন্তব্য করলেন: ‘এরূপ কারণ হেতুই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “শয়তানের জন্য কোনো একজন ফকীহকে পথভ্রষ্ট করা এক হাজার উপাসককে পথভ্রষ্ট করার চেয়েও কঠিন”। এরপর তিনি লোকটির দিকে ফিরে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, ‘বলুন, যখন এরূপ ঘটনা ঘটে তখন কি হৃদয়ে কোনো উত্তেজনা অনুভূত হয়?’ তিনি জবাব দিলেন, ‘এরূপ কোন কিছু অনুভব করি না।’ আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, ‘তাহলে আপনি কি কোন ধরনের দুর্বলতা অনুভব করেন?’ তিনি এবারও জবাব দিলেন, ‘না, তা-ও অনুভব করি না।’ হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা তাকে বললেন, (দেহের মধ্যে) ঠাণ্ডা থাকায় এটা ঘটে থাকে। সুতরাং অযু করাই যথেষ্ট হবে (গোসলের প্রয়োজন নেই)।” [খণ্ড, ৫, পৃ. ১১৮]

উক্ত রিওয়ায়েত গবেষণা করে ফুকাহায়ে কিরাম লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা বুঝতে সক্ষম হন যে, তাঁর ছাত্ররা ‘ফিনকি দিয়ে বের হওয়া তরল পদার্থ’ কথাটিকে বীর্য হিসাবে ধরে নিয়েছিলেন। সুতরাং গোসল জরুরী হিসাবে তাঁরা ফাতওয়া দেন। ফকীহ মুজতাহিদ না থাকার কারণে গোসল জরুরী হওয়ার মূল কারণ খোঁজ করেন নি। তাঁরা যদি গোসল জরুরী হওয়ার কারণগুলো নিয়ে আরো ভাবতেন তাহলে বুঝতে সক্ষম হতেন যে, যেহেতু বীর্যপাতের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য ব্যাপার এখানে সম্পৃক্ত নয় তাই গোসল করার জরুরত সৃষ্টি হয় নি। কিন্তু লক্ষ্য

করুন, হযরত মুজাহিদ, হযরত তাউস এবং হযরত ইকরিমা রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম ছিলেন তাবিঈ ও উচ্চ পর্যায়ের মুহাদ্দিস। পরবর্তী যুগের অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনে কিরামের উস্তাদও এই তিনজন ছিলেন। কিন্তু তাঁরা আসলে ফকীহ মুজতাহিদ ছিলেন না। আর এ কারণেই উক্ত মাসআলার ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ কারণ খোঁজ করেন নি।

সত্যিকার ফকীহ মুজতাহিদ ব্যক্তিদের সংখ্যা খুব কম ছিলো। এ কারণেই রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের প্রশংসা করতে যেয়ে বলেছেন, 'শয়তানের জন্য একজন ফকীহ আলিমকে পথভ্রষ্ট করা হাজার উপাসককে দিগভ্রান্ত করার চেয়েও কঠিন।' শয়তানের উদ্দেশ্য হলো মানুষকে এমন কিছু আমলের প্রতি আকৃষ্ট করা যা মূলত শরীয়তবিরোধী। সাধারণ উপাসকের হাতে এটুকু সময় নেই যে, তিনি শরয়ী বিভিন্ন আইন-কানুনের কারণ সম্পর্কে গভীর গবেষণা করবেন। এমনকি উচ্চ পর্যায়ের মুহাদ্দিসীনে কিরামও এই গবেষণায় জড়িত হতে অপারগ এ কারণে যে, তাঁরা সর্বদা ব্যস্ত থাকেন বর্ণনাকারীদের সত্যবাদিতা, সনদ পরীক্ষা ইত্যাদি নিয়ে। তাঁরা শরয়ী আইন প্রণয়নের সুযোগই পান না। ফকীহ গবেষকরা হলেন শরয়ী আইনজ্ঞ। তাঁরা এ ফিল্ডে বিশেষজ্ঞ। তাঁরা কুরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াতমালা ও হাদিস শরীফ সামনে রেখে বুঝতে সক্ষম হন, শরীয়তের ক্ষেত্রে এগুলোর মূল উদ্দেশ্য কি। "প্রত্যেক ক্ষেত্রে একজন বিশেষজ্ঞ থাকেন"- সত্য এ কথাটি কী সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে![৫০]

২. আল্লামা ইবনে যাওজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন, যখন কিছু লোক শুনলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপরের জমিতে পানি দেওয়া নিষিদ্ধ করেছেন, তখন তারা বলতে লাগলেন: "আমরা আল্লাহর দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী। যখন আমাদের জমিতে অতিরিক্ত পানি জমে তখন তা পার্শ্ববর্তী জমিতে ছেড়ে দিই।" কেউই বুঝতে সক্ষম হন নি যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাস্তবে বুঝাতে চেয়েছেন, ঐ ব্যক্তির কথা যে অন্তঃসত্ত্বা দাসীর সঙ্গে সহবাস করে।[৫১]

[৫০] হাক্বিক্বাতুল ফিক্হ, খ, ১, পৃ. ৯।
[৫১] তাবলিস ইবলিস, পৃ. ১৬৬।

৩. আল্লামা খাত্তাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন, একজন শায়খ দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর যাবৎ জুমুআর নামাযের পূর্বে মাথা মুণ্ডান নি। এর কারণ হলো, তিনি একটি হাদিস থেকে জেনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা নিষেধ করেছেন। এরপর আল্লামা খাত্তাবী তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন, হাদিসের শব্দটি হলো 'حَلَقٌ' [লামের উপর যবর] যার অর্থ 'দলভুক্ত হওয়া' এবং 'حَلْقٌ' [লামের উপর সাকিন] নয়- যার অর্থ, 'মাথা মুণ্ডন করা'। সুতরাং মসজিদের ভেতর নামাযের পূর্বে আলোচনার জন্য দলসৃষ্টি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এর কারণ হলো এসময় মানুষ নামায আদায় করে মনোযোগসহ খুতবা শুনবেন।[৫২]

৪. একদা একজন মুহাদ্দিস একটি হাদিস শুনালেন যেখানে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'জ্যান্ত জিনিসকে শিকারে পরিণত করতে' নিষেধ করেছেন। কিন্তু তিনি 'রূহ' শব্দকে 'রাওহ্' হিসাবে ভুল বুঝার কারণে এরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছেন।[৫৩]

৫. অপর একজন মুহাদ্দিস ছিলেন যার অভ্যাস ছিলো বিত্‌র নামায আদায়ের পূর্বে সর্বদাই টয়লেটে যেয়ে নিজেকে পরিষ্কার করতেন। তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে জবাব দেন, আমি হাদিস শুনেছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিত্‌র নামায আদায়ের পূর্বে টয়লেটে যেয়ে নিজেকে পরিষ্কার করবে। তিনি যা বুঝতে পারেন নি তাহলো এই: যে শব্দটির অর্থ তিনি বাথরুমে যেয়ে পরিষ্কার করা হিসাবে বুঝেছেন তার অসল মা'না হলো, 'বেজোড় সংখ্যায় কিছু করা'। সুতরাং হাদিসের অর্থ হলো যখন কেউ বাথরুমে যেয়ে নিজেকে ধুয়ে পরিষ্কার করে, সে যেনো বেজোড় সংখ্যকবার [তিন, পাঁচ ইত্যাদি] কাজটি করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকে (মনের দিক থেকে) খুশী রাখুন, যে আমার কথা শ্রবণ করে, স্মরণ রাখে এবং অপরের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়।"

[৫২] তাবলিস ইবলিস, পৃ. ১৬৬।
[৫৩] মুসলিম শরীফের ভূমিকা, খ. ১, পৃ. ১৮।

প্রায়শঃই এরূপ হয় যে, যার নিকট শব্দগুলো বলা হলো তিনি ওগুলোর অর্থ সংবাদ প্রদানকারী ব্যক্তির চেয়েও বেশী ভালো বুঝে থাকেন।"[৫৪]

৬. দাউদ জাহিরীর প্রতি গায়র মুকাল্লিদরা বেশ আস্থাশীল। তিনি একদা একটি ফাতওয়া জারী করলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধুমাত্র 'অপ্রবাহিত' [স্থির] পানির মধ্যে প্রস্রাব নিষিদ্ধ করেছেন। কারণ এরূপ করলে পানি অপবিত্র হয়ে যাবে। এটা তিনি হাদিসের বাহ্যিক অর্থ বুঝে বলেছেন যেখানে বলা হয়েছে: "কেউ যেনো কখনো স্থির থাকা পানির মধ্যে প্রস্রাব করে না।" সুতরাং তার ফাতওয়া মতে যদি কেউ কোনো পাত্রে প্রস্রাব করে এবং পানির মধ্যে তা ছেড়ে দেয় তাহলে তা অপবিত্র হবে না! তিনি আরোও বলেছেন, কেউ যদি পানির নিকটে প্রস্রাব করে এবং তা গড়িয়ে পানিতে পড়ে যায় তাহলেও পানি অপবিত্র হবে না। এর কারণ হলো, এ ব্যক্তিরা তো 'অপ্রবাহিত' কোনো পানিতে প্রস্রাব করে নি।

ইমাম নববী রাহামাতুল্লাহি আলাইহি উক্ত ফাতওয়া বর্ণনা করে বলেন: বর্ণনার বাহ্যিক অর্থ গ্রহণে কট্টরভাবে অটল ব্যক্তিরাই এরূপ উদ্ভট ফাতওয়া দিতে পারে।[৫৫]

৭. হাফিজ ইবনে হাজম রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকেও গায়র মুকাল্লিদরা খুব আস্থাশীল ভাবেন। তিনি অবশ্য বড় মাপের মুহাদ্দিস ও মুতাকাল্লিম ছিলেন। একদা তিনি দাবী করলেন, সফররত ব্যক্তি যতটুকু দূরত্বেই ভ্রমণ করুক না কেনো, এমনকি তার নিজের এলাকায় করলেও সে কসর নামায আদায় করতে পারবে। তিনি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেন পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতের বাহ্যিক অর্থ বুঝে; যেখানে বলা হয়েছে: (অনুবাদ) "যখন তোমরা পৃথিবীর জমিনে ভ্রমণ করবে, তোমাদের উপর গোনাহ নেই যদি তোমরা নামায সংক্ষিপ্ত করো।" [নিসা : ১০১]

ইবনে হাজম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। কিন্তু তিনি এ ব্যাপারটি অনুধাবন করেন নি যে, এরূপ সিদ্ধান্ত আইনে পরিণত হলে

[৫৪] মিশকাতুল মাসাবিহ, পৃ. ৩৫।
[৫৫] ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রণীত মুসলমি শরীফের শরাহ, খ. ১, পৃ. ১৩৮; ফাতহুল বারী, খ. ২. পৃ. ৭২।

প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের মহল্লার মসজিদে নামাযের জন্য উপস্থিত হলেও কসর নামায পড়তে হবে।[৫৬]

৭. গায়র মুকাল্লিদদের কর্তৃক ঘোষিত শায়খুল ইসলাম ও মুহাদ্দিস মাওলানা আবদুল জলিল সামরদী তার এক বুকলেটে লিখেছেন, হানাফী মাজহাব মতে স্ত্রীসহবাস করলে রোযা ভাঙ্গবে না, বীর্যপাত হোক বা না। তিনি এটাও বলেছেন, হানাফী মতে এমতাবস্থায় [নাকি] গোসলও ফরয হবে না।

বাস্তবে উক্ত কথাগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। মাওলানা সাহেব আসলে 'দুররুল মুখতার' [খ. ২, পৃ. ১০৩] গ্রন্থে বর্ণিত এ বিষয়টি ভুল বুঝেছেন। এখন ভেবে দেখুন, তিনি যদি একটি গ্রন্থের বর্ণনা অনুধাবন ও বুঝতে অপারগ হন তাহলে কিভাবে কুরআন-হাদিসের ভাষ্য সঠিকভাবে বুঝতে সক্ষম হবেন? তাছাড়া গায়র মুকাল্লিদদের 'শায়খুল ইসলাম' ও 'মুহাদ্দিসদের' অবস্থা যদি এরূপ হয়ে থাকে, তাহলে তাদের বৃহত্তর জনতার অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, চিন্তা করুন।[৫৭]

এ মুহূর্তে মনে পড়ছে এক ফার্সি লোকের কথা। সে দেখলো তার বন্ধুকে বখাটে এক গুণ্ডা কিল-ঘুষি মারছে। সে ছুটে গেলো ঘটনাস্থলে এবং তার বন্ধুর উভয় হাত শক্ত করে ধরে ফেললো। ফলে বেচারা নিজেকে আত্মরক্ষা করতে ব্যর্থ হলো। অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করলো গুণ্ডা লোকটি। খুব ভালো করে উত্তম-মাধ্যম দিয়ে ফার্সি লোকের বন্ধুকে আহত করে চলে গেল। কেউ এসে বোকা সেই ফার্সিকে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি নিজের বন্ধুর হাত ধরে রাখলে কেনো?' সে জবাব দিলো, "আরে, আপনি কি শায়খ সাদীর কবিতা পাঠ করেন নি? তিনি বলেছেন, যখন তুমি দেখবে তোমার বন্ধু বিপদগ্রস্ত, তখন তার হাতে ধরো ..." প্রশ্নকারী জবাব দিলেন, "আরে বোকা! কবিতার অর্থ বিপদে পড়লে বন্ধুকে সাহায্য করা উচিৎ! এর অর্থ নয়, বাস্তবে হাত ধরে রাখা?"

উক্ত ঘটনার সাথে মির্জা মাজহার জানে জাহান রাহমাতুল্লাহি আলাইহির একটি ঘটনার মিল আছে। তিনি একদা খাদিমকে বললেন, "ফ্লাক্সটি নিয়ে

[৫৬] ফায়যুল বারী, খ. ২, পৃ. ৭৩।
[৫৭] ফাতওয়ায়ে রাহিমীয়া দ্রঃ।

এসো, আসার সময় পেটে ধরে রাখবে।” ফিরে আসার সময় দেখা গেলো খাদিম এক হাতে করে ফ্লাক্স নিয়ে আসছে, আর তার অপর হাত নিজের পেটের উপর! মির্জা সাহেব যে বুঝাতে চেয়েছিলেন, ফ্লাক্সের পেটে ধরে নিয়ে এসো। গলা ধরে নিয়ে আসলে তা ভেঙ্গে যেতে পারে। খাদিম এ কথাটি বুঝতে পারে নি। সে বরং হুজুরের নির্দেশের শাব্দিক অর্থের উপর আমল করলো।

কোনো বর্ণনার অন্তর্নিহিত অর্থ না বুঝে যখন তা শাব্দিক অর্থে গ্রহণ করা হয় তখন উক্তরূপ ফলাফল হয়ে থাকে। ঠিক এ জিনিসটাই এ যুগের গায়র মুকাল্লিদরা করে যাচ্ছেন। তারা কিছু হাদিস মুখস্ত করেন ঠিকই কিন্তু এগুলোর সঠিক অর্থ ও উদ্দেশ্য অনুধাবন করেন না। এরপরও তারা দাবী করে বসেন, ‘মুজতাহিদ’ হয়ে গেছেন! শুধু তাই নয়, এভাবে নিজে নিজে মুজতাহিদ বনে তারা আসল মুজতাহিদ মহাত্মনদের সমালোচনা করার ধৃষ্টতা দেখান।

তারা এটা বুঝতে অক্ষম যে, মতামত মূলত দু ধরনের হয়ে থাকে। প্রথমটি হলো ঐরূপ যার দ্বারা আল্লাহ তা’আলার সুস্পষ্ট নির্দেশকে অমান্য করা হয়। যেমন ইবলিস আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার কারণ হিসাবে বলেছিল:

قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ

-“সে বলল: আমি তার চেয়ে উত্তম, আপনি আমাকে আগুনের দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটির দ্বারা।” [সূরা ছোয়াদ : ৭৬]

সে আদম থেকে শ্রেষ্ঠ হওয়ার যুক্তি উপস্থাপন করে সিজদা দিতে অস্বীকৃতি জানায়। এরূপ যৌক্তিক মতামত ভ্রান্ত ও নিন্দনীয়।

দ্বিতীয় ধরনের মতামত ও যুক্তি ঐরূপ যার দ্বারা সরাসরি কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশ অমান্য করা হয় না। বরং এর দ্বারা কুরআন ও হাদিসের বর্ণনাকে স্পষ্ট করা উদ্দেশ্য। এরূপ যুক্তিতর্ক ও মতামত প্রশংসনীয়। ঠিক এটাই ঘটেছে যখন সাহাবায়ে কিরাম রিদ্বওয়ানুল্লাহি তা’আলা আজমাঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ, ‘বনী কুরাইজায় না পৌঁছে আসরের নামায

পড়বে না’, শাব্দিক ও ভাবার্থে গ্রহণ করছিলেন। তাই একদল আসরের ওয়াক্তের উপর গুরুত্ব দিয়ে পথেই নামায আদায় করলেন আর আরেকদল নির্দেশকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করে বনী কুরাইজায় পৌঁছে নামায আদায় করলেন, যদিও এতে কিছুটা দেরী হয়েছে। প্রথমোক্ত দল নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশের আসল উদ্দেশ্যকে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ তাড়াতাড়ি মার্চ করা। দ্বিতীয় দল সরাসরি অর্থ গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ বনী কুরাইজায় না পৌঁছে নামায পড়া যাবে না, যদিও ওয়াক্ত শেষ হওয়ার উপক্রম হয়। ইবনে কাইয়িমের মতে প্রথম দলের আসহাবে কিরাম ছিলেন ফুকাহা। তাঁরা ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা গ্রহণও করেছেন।

দ্বীনের ভিত্তি দু’টি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল

আমাদের দ্বীন মূলত দু’টি ভিত্তির উপর নির্ভরশীল: ১. সঠিক রিওয়ায়েত (বর্ণনা) এবং ২. সঠিক ব্যাখ্যা (দিরায়াহ)। সুতরাং কুরআন ও হাদিস শরীফের সঠিক শব্দাবলী সংরক্ষণ ও ফুকাহায়ে কিরামের নিকট হস্তান্তরের দায়িত্ব পালনে একদল লোকের প্রয়োজন। এই দলই হলেন মহাত্মন মুহাদ্দিসীনে কিরাম। আর ফুকাহায়ে কিরাম হলেন ফিক্হ শাস্ত্র ও এর উসূলের উপর সুদক্ষ। তাঁরা বর্ণনার অন্তর্নিহিত অর্থ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্যক অবগত। তাঁরাই শেষ পর্যন্ত বর্ণনাগুলোর সঠিক অর্থ উম্মাহ্‌কে অবগত করেন।

আল্লামা ইবনে কাইয়িম জাওযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রতি গায়র মুকাল্লিদরা খুব বেশী আস্থাশীল। তিনি বলেন, “দু’টি জিনিস (প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে) জানানো হয়। প্রথমটি হলো শব্দাবলী [মুত্ন] ও দ্বিতীয়টি হলো এর অর্থ ও উদ্দেশ্য। সুতরাং উম্মাহ্‌র উলামায়ে কিরাম দু’টি দলে বিভক্ত। প্রথম দলে আছেন হাদিসের হুফ্‌ফাজ যারা হাদিস শরীফ মুখস্ত করেছেন এবং শুদ্ধ ও অশুদ্ধ হাদিসগুলো নির্ণয় করেন। তারা উম্মাহ্‌র নেতা। উম্মাহ্‌র চালিকাশক্তি। তাঁরা ইসলামের দূর্গকে সংরক্ষণ করেছেন। শরীয়তের স্রোতস্বিনীসমূহকে নিরাপদ রেখেছেন ভেজাল বস্তুর মিশ্রণ থেকে। দ্বিতীয় দল হলেন উম্মাহ্‌র ফুকাহায়ে কিরাম। তাঁরা শরয়ী আইন খোঁজে বের করেন ও ফাতওয়া দেন। তাঁদেরকে বেছে নেওয়া হয়েছে হালাল ও হারামের মধ্যে

পার্থক্য নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে। তাঁরা আকাশের তারাগুলোর মতো। যেসব তারা দেখে পথহারা মানুষ সঠিক পথের দিশা খোঁজে পায়। অস্পষ্ট ও জটিল প্রশ্নের সমাধান তাঁরাই বের করেন। মানুষ সর্বদাই তাঁদের মুখাপেক্ষী এবং এদেরকে মানা নিজের মা-বাবা থেকেও বেশী গুরুত্বপূর্ণ। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে মানো, আল্লাহর রাসূলকে মানো এবং তাদেরকে মানো যারা তোমাদের মধ্যে নির্দেশের অধিকারী [ফুকাহা] (সূরা নিসা: ৫৯"।"[৫৮]

দ্বীনের গভীরার্থ বুঝা মূলত আল্লাহর পক্ষ থেকে দয়া ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে গোটা কয়েকজনকে এ দয়া দ্বারা আলোকিত করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "যার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করেন ভালো জিনিস প্রকাশ করতে, তাঁকে দান করেন দ্বীনের গভীর জ্ঞান।"[৫৯]

পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে: "যাকে ইচ্ছা আল্লাহ গভীর (আল্লাহর দ্বীনকে বুঝার প্রজ্ঞা) জ্ঞানদান করেন। আর যাকে জ্ঞানদান করা হলো সে অবশ্যই অধিকারী হলো এক বিরাট সাফল্যের।" [সূরা আলে-ইমরান]।

যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা দ্বীনের সঠিক জ্ঞানদান করেছেন একমাত্র তিনিই অপরকে দিকনির্দেশনা দিতে পারেন। সহযোগিতা করতে পারেন শরয়ী সূক্ষ্ম ব্যাপারে এবং মুক্ত রাখতে পারেন শয়তানের বেড়াজাল থেকে। আর এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন: "শয়তানের জন্য একজন মাত্র ফকীহ্ আলিমকে পথভ্রষ্ট করতে হাজার জন উপাসক থেকেও কঠিন কাজ।" (মিশকাত)

গায়র মুকাল্লিদরা দ্বীনকে গভীরভাবে বুঝতে অক্ষম থাকায় ফিক্হ ও তাফাক্কুহ (দ্বীনকে গভীরভাবে বুঝা) শাস্ত্রের প্রতি বৈরিতা দেখান। তাদের নেতা হিসাবে স্বীকৃত মাওলানা আবদুল জলিল সারমদী তার 'বূ'ই গিল্লীন'

[৫৮] ই'লামুল মুয়াক্কী'ঈন, খ, ১, পৃ. ৯।
[৫৯] মিশকাতুল মাসাবিহ, পৃ. ৩৩।

কিতাবে লিখেছেন: "ফিক্হ ও উসূলে ফিক্হ না থাকলে উম্মাহ্র মধ্যে কখনো মতপার্থক্য সৃষ্টি হতো না।" তিনি আরো লিখেছেন, "সবার উচিৎ সকল ফিক্হের গ্রন্থাদি থেকে দূরে থাকা।" এছাড়া সর্বাধিক বে-আদবীপূর্ণ, অনৈসলামিক ও দ্বীনবিরোধী তার মন্তব্যটি হলো: "কুরআন ও সুন্নাহ প্রশস্ত হবে যদি কোন সঠিক শাসক যেমন উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু, নির্দেশ দেন, 'গর্ত খনন করো, এতে বিভিন্ন মাজহাবের ফিক্হ শাস্ত্রের সকল গ্রন্থ ফেলে ভরে দাও। তারপর আগুন লাগাও!'"

উক্ত মন্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়েছে, মানুষ কিভাবে অজ্ঞতার সর্বনিম্ন স্তরে পৌছ্তে পারে। লক্ষ্য করুন, যে বিষয়ের উপর তাদের জ্ঞান সীমিত তার প্রতি কিরূপ ঘৃণা জন্মেছে দিগ্ভ্রান্ত ওসব গায়র মুকাল্লিদদের![৬০]

ফিক্হ শাস্ত্র ও দ্বীনের উপর গভীর জ্ঞানার্জনকে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাস প্রশংসাসূচক বাণী দ্বারা ভূষিত করেছেন। যেমন:

১. "সবকিছুর খুঁটি আছে, দ্বীনের খুঁটি হলো ফিক্হ।" [বাইহাকী, দার কুতনী, ফাতওয়ায়ে সিরাজিয়া থেকে উদ্ধৃত]

২. "যার দ্বারা উত্তম কিছু করানোর ইচ্ছা পোষণ করেন, তাকেই আল্লাহ তা'আলা দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করেন।" [বুখারী, মুসলিম, মিশকাত]

৩. আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন: "ফুকাহাদের দৃষ্টান্ত হলো [দেহের মধ্যে] হাত।" [মুফীদুল মুফতি, পৃ. ৯]

৪. "ফিক্হের উপর একটি দার্স [আলোচনা] ষাট বছরের [নফল] ইবাদত থেকেও উত্তম।" [তাবারানী]

ফিক্হের গুরুত্ব অনুধাবনে আমরা রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি দু'আর প্রতি দৃষ্টিপাত করতে পারি। তিনি একদা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমার জন্য দু'আ করলেন: "হে আল্লাহ! তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করুন এবং কুরআনের ব্যাখ্য শিক্ষা দিন।" [তারজুমানুস্ সুন্নাহ, খ. ৪, পৃ. ২৫৮]

[৬০] ফাতওয়ায়ে রাহিমীয়া।

হাদিস শরীফ সঠিকভাবে বুঝার দায়িত্ব হলো ফুকাহায়ে কিরামের। যারা শুধুমাত্র হাদিস বর্ণনা করেন তারা কোনো কোনো সময় মারাত্মক ভুলও করে থাকেন। এর ফলে বিরাট সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। ইমাম মুসলিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর বিখ্যাত হাদিস সংকলনে একটি উদ্ধৃতি লিপিবদ্ধ করেছেন: "হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু একদা বললেন, যখন কোনো হাদিস বর্ণনা করা হয় ওসব ব্যক্তির নিকট যারা তা বুঝতে অপারগ, তখন এটা তাদের জন্য বিরাট অস্বস্থির কারণে পরিণত হয়।" [মুসলিম শরীফ, খ. ১, পৃ. ৬]

ইমাম সুফিয়ান বিন ওয়াইয়ানা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমার উস্তাদ। তিনি বলেন: "ফুকাহায়ে কিরাম ছাড়া সকলেই হাদিস দ্বারা দিগ্‌ভ্রান্ত হতে পারেন।" এর অর্থ হলো, যখন কেউ দ্বীনের গভীর জ্ঞান থেকে বঞ্চিত থাকে তখন সে নিজের নফসের ইচ্ছানুযায়ী হাদিসের ব্যাখ্যা করে থাকে। ফলে সঠিক রাস্তা থেকে দূরে সরে পড়ে। শিয়া, রাওয়াফিয, খারিজী, মু'তাজিলা, কারামতি, মুরজি, কাদিয়ানী, ঈসমাইলী, বাহায়ী ইত্যাদি অনেক পথভ্রষ্ট দল এই হাদিসকেই ব্যবহার করেছে তাদের ভ্রান্ত ঈমান-আক্বীদা প্রতিষ্ঠায়। কিন্তু বাস্তবে এ সবই নিজেদের নফসানী সিদ্ধান্ত ছিলো।

হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন: 'কোনো ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশ না পেলে আমাকে কি করতে হবে?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন: "ফুকাহা ও পরহেজগার উপাসনাকারীদের জিজ্ঞেস করে সিদ্ধান্ত নেবে।" [মা'আরিফুস সুনান, খ. ৩, পৃ. ২৬৪-৫]

মোটকথা, কেউ যদি ফুকাহায়ে কিরামের দিকনির্দেশনা ব্যতিত দ্বীনের ব্যাপারে নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নিতে যায় তাহলে সে অবশ্যই পথভ্রষ্ট হবে। এ কারণেই এ যুগের গায়র মুকাল্লিদরা ২০ রাকাআত তারাবী, তিন তালাক এবং আরো অনেক ক্ষেত্রে বিরাট ভুল করে ফেলেছেন।

স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা কুরআনে করীমে দ্বীনের গভীর জ্ঞানার্জনের ব্যাপারে ইরশাদ করেন:

চার মাজহাবের আলো

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

"আর সমস্ত মু'মিনের বের হওয়ার প্রয়োজন নেই, তাই তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হলো না, যাতে দ্বীনের জ্ঞান লাভ করে এবং সতর্ক করে স্বজাতিকে, যখন তারা তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, যেন তারা সতর্ক হতে পারে।" [সূরা তাওবাহ : ১২২]

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "(হে আমার সাহাবারা!) মানুষ তোমাদেরকে অনুসরণ করবে। মানুষ পৃথিবীর শেষ সীমানা থেকে তোমাদের নিকট আসবে দ্বীনের ব্যাপারে গভীর জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে। যখন তারা আসবে, তোমরা তাদের প্রতি উত্তম আচরণ করবে।" [তিরমিযি, মিশকাত]

কী আশ্চর্যের ব্যাপার! যখন স্বয়ং রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীনের গভীর জ্ঞানার্জন অনুসন্ধানীদের [ফুকাহায়ে কিরাম] প্রতি ভালো আচরণের জন্য সাহাবায়ে কিরামকে নির্দেশ দিচ্ছেন, তখন আজকের গায়র মুকাল্লিদরা তাদের গ্রন্থাদি পুড়িয়ে ফেলার ইচ্ছা পোষণ করেন? অথচ আসহাবে কিরাম ছিলেন সত্যিকার মুহাদ্দিসীন। সুতরাং গায়র মুকাল্লিদদের উচিৎ আইম্মায়ে মুজতাহিদীনসহ সকল ফুকাহায়ে কিরামের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। নীচে কয়েকটি বর্ণনা তুলে ধরছি যার দ্বারা এই শ্রদ্ধাশীলতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে।

১. বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম আ'মাস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন ইমাম শু'বা, ইমাম সুফিয়ান বিন ওয়াইয়ানা এবং ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম মহাত্মনদের উস্তাদ। এরপরও শরয়ী কোনো সূক্ষ্ম বিষয় তার সম্মুখে আসলে তিনি একথা বলতে দ্বিধা করতেন না: "নু'মান বিন ছাবিত [ইমাম আবু হানিফা] এ ব্যাপারে সঠিক জবাব দিতে সক্ষম হবেন। কারণ আমি মনে করি তাঁর জ্ঞান অবশ্যই ঐশীপ্রাপ্ত।" [খাইরাতুল হিসান, পৃ. ৩১]

২. হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, তিনি একদা ইমাম আ'মাশের সাথে বসা ছিলেন যখন সেথায় ইমাম আবু হানিফা

উপস্থিত হলেন। কোনো এক ব্যক্তি এসে দ্বীন সম্পর্কে খুব সূক্ষ্ম একটি প্রশ্ন করলেন। ইমাম আ'মাশ নীরব রইলেন। এরপর ইমাম আবু হানিফার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, এটার জবাব কি হতে পারে? ইমাম আবু হানিফা যখন গ্রহণযোগ্য উত্তর প্রদান করলেন তখন ইমাম আ'মাশ পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোন্ বর্ণনার উপর ভিত্তি করে এই জবাব দিয়েছেন? তিনি বললেন, আপনিই এই রিওয়ায়েতের বর্ণনাকারী! প্রশ্নের জবাবে তিনি কিভাবে পৌঁছলেন তা-ও তিনি বুঝিয়ে বললেন। সবশেষে ইমাম আ'মাশ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মন্তব্য করলেন, "আমরা (মুহাদ্দিসীন) হলাম শুধুমাত্র ঔষধ প্রস্তুতকারক আর আপনি [ইমাম আবু হানিফা - ফুকাহা] হলেন ডাক্তার।"

ঔষধ প্রস্তুতকারকের কাজ হলো বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণে নানান ধরনের ঔষধ তৈরী করে সাজিয়ে রাখা। আর ডাক্তারের কাজ হলো কোন্ রোগের ঔষধ কোন্টি তা নির্দিষ্ট করা- অর্থাৎ ব্যবস্থাপত্র প্রদান। অনুরূপ, মুহাদ্দিসীনে কিরামের দায়িত্ব হলো হাদিস শাস্ত্রকে সংরক্ষণ ও স্তরবিন্যস্ত করা [সহীহ, হাসান, গরীব, জঈফ ইত্যাদি নির্ণয়করণ]। আর ফুকাহায়ে কিরামের দায়িত্ব হলো এসব হাদিস থেকে শরয়ী আইন বের করা। [খাইরাতুল হিসান, পৃ. ৬১]

৩. ইমাম আবু ইউসুফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন, একদা ইমাম আ'মাশ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাকে একটি প্রশ্ন করলেন। তিনি জবাব দেওয়ার পর ইমাম আ'মাশ জানতে চাইলেন, তিনি কোত্থেকে এই উত্তর পেলেন। ইমাম আবু ইউসুফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জবাব দিলেন: "আপনার বর্ণিত একটি হাদিস থেকে!" একথা শুনে ইমাম আ'মাশ মন্তব্য করলেন, "তোমার মা-বাবা একত্রিত হওয়ার [অর্থাৎ তাদের বিয়ের] পূর্বেই আমি এই হাদিসখানা মুখস্ত করে রেখেছি। অথচ এইমাত্র এর সঠিক অর্থ বুঝতে সক্ষম হলাম!" [জামি'উ বয়ানুল ইলম, পৃ. ১৩১]

৪. ইমাম আ'মাশ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকেও আরো বিখ্যাত তাবিঈ ছিলেন ইমাম আমির শা'বি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি ৫০০ আসহাবে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুমের সাক্ষাৎ লাভ করেন। তিনি বলেন: "আমরা [মুহাদ্দিসীন] ফকীহ নয়। আমরা শুধু হাদিস শ্রবণ করি ও তা ফুকাহাদের নিকট পৌঁছে দিই।" [তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ]

উপরের বর্ণনাগুলো থেকে স্পষ্ট হয়েছে, প্রাথমিক যুগের বড় বড় মুহাদ্দিসীনে কিরাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম ফুকাহাদের প্রতি কিরূপ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। যে কোনো মাসআলার ক্ষেত্রে তাঁরা নিজেরা সমাধান না দিয়ে ফুকাহায়ে কিরামের প্রতি তা ন্যস্ত করতেন এ কারণে যে, ফকীহ মুজতাহিদ ছাড়া হাদিসের অন্তর্নিহিত গভীরার্থ ও উদ্দেশ্য অনুধাবন অন্যদের দ্বারা সম্ভব ছিলো না। আর আজকের তথাকথিত 'হাদিসের লোকগণ' [গায়র মুকাল্লিদ আহলে হাদিসরা] যাদের অধিকাংশ হাদিসের মূল আরবী মুত্ন দেখে পড়তেই সক্ষম নন, তারা মহাত্মন আইম্মায়ে মুজতাহিদীনসহ প্রাথমিক যুগের ইমাম পর্যায়ের ফুকাহায়ে কিরামকে শুধু সমালোচনা করছেন না, তাদেরকে কুরআন-হাদিসের বিরোধী বলার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছেন! এসব গায়র মুকাল্লিদ নিজেদেরকে ফুকাহায়ে কিরামের চেয়েও বেশী বিজ্ঞ মনে করেন। বাতুলতা কাকে বলে!

গায়র মুকাল্লিদদেরই নেতা হওয়ার দাবীদার কাজি আবদুল ওয়াহহাব কানপুরীও নিজেদের ভ্রান্তি ও অজ্ঞতা স্বীকার করেছেন। তিনি 'আত-তাওহীদ ওয়াস সুন্নাহ ফী রাদ্দি আহলিল ইলহাদ ওয়াল বিদ'আহ' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি এতে মন্তব্য করেছেন: "আহলে হাদিসদের সম্পর্কে বলতে হয়, তারা বিদ'আতী, কারণ তাঁরা পরহেজগার পূর্বসুরীদের বিরোধী এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন সে ব্যাপারে বাস্তবে অজ্ঞ। খুব দ্রুত এরা শিয়া ও রাফিজীদের বেতনহীন কর্মচারী হচ্ছে। ঠিক এভাবেই শিয়া, মুলাহিদা ও জানাদিক্বাহ দল মুনাফিক্বদের দরজার সিঁড়ি এবং উত্তারাধিকারী হয়েছিল।" [তাক্বলিদে আইম্মাহ, পৃ. ১৮]

আহলে হাদিস দলের একজন মাওলানা ওয়াহিদুজ্জামান লিখেছেন: "একদিকে আহলে হাদিসরা ঘোষণা দিয়েছেন, ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির অনুসরণ হারাম, অপরদিকে তারা অন্ধভাবে অনুসরণ করে মুহাদ্দিস ইবনে তাইমিয়া, ইবনে কাইয়িম, হযরত শওকানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম ও নবাব সিদ্দীক হাসান খানকে!" [আসরারুল লুগ্বা, পৃ. ৩৪]

তাক্বলিদের মর্যাদা ও প্রমাণ

ইসলামের মূল দাবী হলো আল্লাহ তা'আলার নির্দেশনাবলী মানা। বাস্তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ হচ্ছে ওয়াজিব। এর কারণ হলো তাঁর কথা ও কর্ম ছিলো আল্লাহ তা'আলার নির্দেশনাবলীর সম্পূর্ণ আওতাভুক্ত। তিনি হালাল ও হারামের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য নির্ণয় করে গেছেন। আমরা তাঁকে মানি এ কারণে যে, তিনি আল্লাহর নির্দেশনাবলী আমাদের নিকট সুস্পষ্টভাবে রেখে গেছেন। সুতরাং, রাসূলের [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] অনুসরণ মানেই আল্লাহর নির্দেশনাবলী মানা ও তাঁর সন্তুষ্টির কারণ। মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর কালামে পাকে ইরশাদ করেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ

-"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের (সাঃ) আনুগত্য কর এবং নিজেদের কর্ম বিনষ্ট করো না।" [সূরা মুহাম্মদ : ৩৩]

সুতরাং মুসলমান হিসাবে আমরা একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অনুসরণ করি। যে কেউ দাবী করে, রাসূল ছাড়া সে এককভাবে আল্লাহকে অনুসরণ করে, সে ভ্রান্ত ও নিন্দার যোগ্য। মোটকথা, আমাদের মাঝে আছে দু'টি পথনির্দেশক যা অনুসরণ করতে হবে। এগুলো হলো আল্লাহর কালাম কুরআনে করীম এবং হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

কুরআন ও হাদিসে কিছু আইন-কানুন সুস্পষ্ট। এগুলোকে 'মানসূস' আইন বলে। কিন্তু আরো অনেক আইন-কানুন আছে যা খুব বেশী স্পষ্ট নয় কিংবা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। কুরআন ও হাদিসের কিছু বর্ণনা আছে যা একাধিক অর্থবোধক, কিছু আছে 'মুহকাম' ও কিছু 'মুতাশাবিহ'। আরো আছে 'মুশতারাক' ও 'মুআউয়াল' বর্ণনা। বেশ কিছু আয়াত ও হাদিস আছে যা আপাতদৃষ্টিতে অন্য আয়াত ও হাদিসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বলে মনে হয়। আমরা এখানে এক দু'টো দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে পারি।

১. পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

-অর্থাৎ "এবং তালাকপ্রাপ্তা মহিলারা [পুনরায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পূর্বে] তিনটি 'কুরু' অপেক্ষা করবে ..." [সূরা বাক্বারা : ২২৮]

উক্ত "কুরু" শব্দটির দু'টি ভিন্ন অর্থ আছে। তাহলো মহিলাদের 'মাসিক হওয়ার কাল' ও 'পবিত্র হওয়ার কাল' [তুহর]। আয়াতে উভয় অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারে এবং প্রতিটির আলাদা ব্যাখ্যা ও ফলাফলও হবে। অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদেরকে পুনরায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পূর্বে ইদ্দত পালনে তিনটি মাসিক হওয়ার সময় পর্যন্ত অথবা তিনটি পবিত্রতার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

২. সহীহ হাদিস শরীফে আছে: "যখন কারো ইমাম থাকেন, তখন ইমামের কিরাআতই তার কিরাআত।" আরোও একটি সহীহ হাদিসে আছে: "ইমামকে অনুসরণের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তিনি যখন তাকবীর বলেন তোমরাও বলবে এবং যখন তিনি নীরব থাকেন তোমরাও নীরব থাকবে।" [মুসলিম শরীফ, খ. ১, পৃ. ১৭৪]

উক্ত হাদিস দু'টোর আপাতদৃষ্টিতে বিপরীতার্থমূলক একটি হাদিস আছে: "যে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না, তার নামায হয় না।" [বুখারী, খ. ১, পৃ. ১০৪] এখানে একা একা নামায পালনকারী, মুক্তাদী, ইমাম না সবার জন্য সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে তা স্পষ্টভাবে বলা হয় নি।

অনুরূপ আরো অনেক হাদিস আছে যা একটি অন্যটির বিরোধী বলে মনে হয়। একজন মুজতাহিদ ইমামকে এসব ক্ষেত্রে গভীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধান করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

অসংখ্য শরয়ী সমস্যা আছে যে সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা কুরআন ও হাদিস শরীফে নেই। এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে গবেষককে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। যে কোনো ব্যক্তি সিদ্ধান্ত গ্রহণে দু'টি পথের একটি বেছে নিতে পারেন: ১. ব্যক্তিগত বিবেচনা ও ২. বিষয়টি সম্পর্কে আসহাবে কিরাম, তাবিঈ ও তাবে তাবিঈদের থেকে দিক-নির্দেশনা খোঁজে দেখা ও সে মুতাবিক সিদ্ধান্তগ্রহণ করা। শেষোক্ত পদ্ধতি উত্তম এ কারণে যে, সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈ ও তাবে তাবেঈগণ ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটস্থ যুগের মানুষ। এ যুগগুলো সম্পর্কে স্বয়ং রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা দিয়েছেন:

خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِينَ يَلُونِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

-"সর্বোত্তম যুগ হলো আমার যুগ, তারপর এর পরের যুগ, তারপর এর পরেরটা।" [সহীহ মুসলিম]

প্রথম তিন যুগের [খাইরুল কুরুন] মুসলমানরা যে পরবর্তী সকল যুগের তুলনায় সর্বাধিক পরহেজগার ও দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞানী ছিলেন তা উক্ত হাদিস শরীফ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত।

আমাদের জাগতিক কাজ-কর্মে কোন্ উদ্দেশ্যে কার কাছে যেতে হয় তা একটু ভাবলে দ্বীনের ব্যাপারেও যে তাক্বলিদের প্রয়োজন তা সহজেই বুঝে আসবে। যেমন: রোগ হলে যেতে হবে ডাক্তারের কাছে, আইনী সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন হবে আইনজীবীর, পরনের বস্ত্র তৈরী করতে হলে যেতে হবে দর্জির নিকট এবং ভবন নির্মাণে দরকার হবে দক্ষ ইঞ্জিনিয়ারের ইত্যাদি। মোটকথা মানুষ যেভাবে প্রয়োজনের তাগিদে বিশেষজ্ঞের দ্বারস্থ হয় ঠিক তেমনি দ্বীনি কোন বিষয় জানার জন্য দ্বারস্থ হবে মুজতাহিদের নিকট। জাগতিক কাজে-কর্মে যেভাবে আমরা বিশেষজ্ঞদের উপর আস্থাশীল থাকি, ঠিক তেমনি মুজতাহিদ ইমামের সিদ্ধান্তের উপরেও আমরা আস্থাশীল থাকি। সেটা কুরআন-হাদিসের অনুকূলে এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির সূত্র হিসাবে মেনে নিই। আর এটাই হচ্ছে তাক্বলিদ বা অনুসরণ।

মুকাল্লিদরা জানেন ও বিশ্বাস করেন, তাক্বলিদ করার মাধ্যমে ইমামের কোন ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নয় বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ করা হচ্ছে। ইমাম শুধুমাত্র একজন গবেষক যিনি মুকাল্লিদরা যা সঠিকভাবে বুঝতে অপারগ তা বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব পালনকারী। তিনি হচ্ছেন কুরআন-হাদিসের সঠিক ব্যাখ্যাতা। ব্যাপারটি আরো স্পষ্ট হবে সচরাচর সংঘটিত একটি বিষয় নিয়ে আমাদেরকে ভাবলে।

আমরা জামাআতে নামায আদায়কালে ইমামকে অনুসরণ করি। তার তাকবীর শুনে আমরা রুকু সিজদায় যাই। তবে জামাআত বড় হলে পেছনের মুক্তাদিরা অবশ্যই ইমামের তাকবীর শুনবেন না। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় এক বা ততোধিক মুকাব্বিরের। ইমামের তাকবীর যারা শুনতে পান না তাদেরকে মুকাব্বিরের অনুসরণ করতে হয়। কিন্তু তারা জানেন এভাবে অনুসরণের

মাধ্যমেই আসলে তারা ইমামকেই অনুসরণ করছেন, মুকাব্বিরকে নয়। আর মুকাব্বির নিজেই বুঝেন, তিনি ইমাম নন বরং অন্যদের মতো একজন মুক্তাদী। অনুরূপ মাজহাবের ইমামরাও জানতেন যে, তারা নিজেরাও মু'মিন মুসলমান। শুধুমাত্র আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের অনুসরণের একেকজন মধ্যস্ততাকারী মাত্র। তাঁদেরকে আল্লাহ তা'আলা শরয়ী মাসআলা আবিষ্কারের ক্ষমতা দান করেছিলেন। তাই তাঁরা এ দায়িত্ব পালন করে গেছেন। রেখে গেছেন সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণভিত্তিক চারটি ফিক্হ যুগ যুগ ধরে আগত মু'মিন মুসলমানদের সুবিধার্থে। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের এ কাজকে কবুল করেছেন। হে আল্লাহ! তাঁদের মর্যাদা বুলন্দ করুন এবং অধিষ্ঠিত করুন জান্নাতুল ফিরদাউসের সর্বোচ্চ মাক্বামে। আমীন।

গায়র মুকাল্লিদরা [অনেকটা বাধ্য হয়েই] নিজেদের খেয়ালখুশীর অনুসরণ করেন যখন কোন শরয়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন দাঁড়ায়। এর কারণ হলো, যুগ যুগ ধরে প্রতিষ্ঠিত ও অনুসরণীয় মাজহাবী সিদ্ধান্তসমূহ তারা প্রত্যাখ্যান করেছেন। এখন, মাসআলা আবিষ্কারের একমাত্র রাস্তা হলো, নিজে নিজে কুরআন-হাদিস গবেষণা করা। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস তারা নিজেরাও একমত হবেন যে, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন ও তাঁদের বিজ্ঞ ছাত্রদের থেকেও অধিক বেশি কুরআন-হাদিস বুঝার ক্ষমতা তাদের নেই। তাহলে কোত্থেকে মাসআলা আসবে? অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের সিদ্ধান্ত আসে নফসানী খাহিশাত পূরণের তাড়না থেকে। কুরআনে পাকে অনেক আয়াতে নফসের অনুসরণ থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা। যেমন:

১.

فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

-"অতঃপর তারা যদি আপনার কথায় সাড়া না দেয়, তবে জানবেন, তারা শুধু নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে আল্লাহর হিদায়াতের পরিবর্তে। যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? নিশ্চয় আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।" [সূরা ক্বাসাস : ৫০]

২.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

-"এরপর আমি আপনাকে রেখেছি ধর্মের এক বিশেষ শরীয়তের উপর অতএব, আপনি এর অনুসরণ করুন এবং অজ্ঞদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না।" [সূরা জাসিয়া : ১৮]

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ইরশাদ করেন:

১. "তোমাদের কেউই সত্যিকার ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা নিজেদের নফসের অনুসরণ থেকে মুক্ত হয়ে আমি যা শিক্ষা দিয়েছি তা কায়মনোবাক্যে মেনে নেবে ও অনুসরণ করবে।" [মিশকাত শরীফ, পৃ. ২২]

২. "এমন এক সময় আসবে যখন কিছু মানুষের আবির্ভাব হবে যাদের দেহের মধ্যে প্রবাহিত হবে নফসানী খাহিশাত, ঠিক যেভাবে দেহের কোনো শিরা কিংবা পেশী পাগলা কুকুরের বিষাক্ত কামড়ের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকে না।" [প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০]

৩. "জান্নাত [দুনিয়ার] কষ্ট-সাধনা দ্বারা পরিবেষ্টিত, আর জাহান্নামের চতুর্দিকে ঘিরে আছে [দুনিয়ার] নফ্সে আম্মারার খাহিশাত।" [মুত্তাফাকুন আলাইহি]

আসহাবে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুম ও আগের যুগের উলামায়ে কিরামও নফসে আম্মারার কুমন্ত্রণা থেকে বেঁচে থাকতে মানুষকে সতর্ক করেছেন। যেমন:

১. একদা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু মানুষকে ডেকে বললেন: "আপনারা আজ এমন এক সময় অতিক্রম করছেন, যখন মানুষের মধ্যে [দ্বীনি] জ্ঞানার্জনের প্রাবল্য নাফসানী খাহিশাত থেকে অধিক। কিন্তু ভাবিষ্যতে এমন এক দিন আসবে যখন জ্ঞান আত্মসমর্পণ করবে নাফসানী খাহিশাতের নিকট।" [ইহইয়া উলূমিদ্দীন, খ. ১, পৃ. ৯৩]

২. শাইখুল মাশাইখ হযরত জুনায়িদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির শাগরিদ ও ছাত্র হযরত শায়খ আবু উমর জুযাজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "আইয়্যামে জাহিলিয়াতের সময় মানুষ মনগড়া মতামতের উপর চলতো। এরপর

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভাগমন ঘটলো। তিনি শরীয়ত ও এর প্রতি তাদেরকে আনুগত্যশীল করলেন। সুতরাং প্রাজ্ঞ মন হলো সেটি যেটি শরীয়ত প্রবর্তিত সবকিছু সমর্থন ও অনুসরণ করে এবং যা শরীয়ত বিরোধী তা প্রত্যাখ্যান করে ও আমলে নেয় না।" [ই'তিসাম, খ. ১, পৃ. ৬৭]

৩. ইমাম শাবতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "মানুষের নফসে আম্মারার ইচ্ছাকে বিলুপ্ত করতেই শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।" [প্রাগুক্ত]

৪. শায়খুল মাশায়িখ হযরত আবদুল কাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "শিরক মানে শুধুমাত্র মূর্তিপুজা নয়, তোমার নফসে আম্মারার ইচ্ছা মুতাবিক আমলও শিরকের অন্তর্ভুক্ত।" তিনি কুরআনের এই আয়াতের ব্যাখ্যায় এ কথাটি বলেন: "আপনি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখেছেন যে তার ইচ্ছাকে প্রভু বানিয়েছে?"[৬১]

৫. শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন: "মনে রেখো নফসের স্বাভাবিক আকর্ষণ হলো পাপ কাজের প্রতি। সর্বদাই তাতে সে আনন্দবোধ করে। তবে ঈমানের আলো নফসকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম।" [হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, খ. ২, পৃ. ৩০৬]

৬. হযরত যুননূন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মতে মানুষ দুর্নীতিতে লিপ্ত হয় ৬টি কারণে:

১. আখিরাতের মুক্তির উদ্দেশ্যে আমলের ক্ষেত্রে নিয়তে দুর্বলতা।

২. নফসে আম্মারার ইচ্ছা পূরণে দেহকে মাধ্যম বানানো।

৩. জীবন সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘ কামনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া।

৪. প্রভুর সন্তুষ্টি উপেক্ষা করে সৃষ্টির সন্তুষ্টির প্রতি আকর্ষণ।

৫. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতকে অনুসরণ না করে নিজের নফসের অনুসরণ।

---

[৬১] ফাতওয়ায়ে রাহিমীয়া থেকে উদ্ধৃত।

৬. পূর্ববর্তীদের ভুলকে প্রমাণ হিসাবে মানা ও উত্তম কাজকে প্রত্যাখ্যান করা।[৬২]

মোটকথা, নফসে আম্মারার ইচ্ছাকে অনুসরণ কুরআন-হাদিসে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। উলামায়ে কিরাম এর নিন্দা করেছেন। মানুষের জন্য নফসে আম্মারার কুমন্ত্রণা থেকে বেঁচে থাকার সর্বোত্তম রাস্তা হলো সঠিকভাবে দিকনির্দেশনাপ্রাপ্ত ইমামদের অনুসরণ। তাঁদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শরয়ী আইন-কানুন মেনে চলা। কারণ এসব আইন কুরআন-হাদিসের সঠিক ব্যাখ্যা ও উদ্দেশ্যের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। এটাই হলো আল্লাহ তা'আলার নির্দেশিত রাস্তা এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উপায়। তাই চার ইমামের যে কোন একজনকে অনুসরণ হলো, যে কোনো মুসলমানের জন্য নিরাপত্তার কারণ।

আমাদের গায়র মুকাল্লিদ ভাইগণকে অনুরোধ জানাচ্ছি একটু গভীরভাবে চিন্তা করার। তাক্বলিদ যে জরুরী, খোলা মনে ভাবলে অবশ্যই তাদের নিকট ধরা পড়বে। তাক্বলিদ মানে অপরের সঠিক সিদ্ধান্ত ও উত্তম আমলের অনুসরণ। আমাদের জাগতিক জীবনচলার ক্ষেত্রেও অপরকে মানা ও অনুসরণ করা একান্ত জরুরী। বাচ্চারা মা-মাবার কথা ও কাজকে সত্য ও সঠিক বলে মানে। তারা বড়দের অনুসরণ করে। উস্তাদের কথার প্রতি আস্থা রেখে তা সত্য বলে মুখস্ত করে।

গায়র মুকাল্লিদদের মহিলারা তো আর মুহাদ্দিস বা তাদের মতো মুজতাহিদ নন যে, নিজে নিজে হাদিস পড়ে আমল করবেন। মহিলারা তো পুরুষদেরকে জিজ্ঞেস করে সে মুতাবিক আমল করতে বাধ্য। তাহলে তারাও কি পুরুষদেরকে অনুসরণ করার কারণে 'শিরক' ও 'বিদআতে' লিপ্ত আছেন? বাস্তবে পৃথিবীর সকল ব্যবসা-বাণিজ্য ও পেশা তাকৃলিদের উপর নির্ভরশীল। এটাই যদি দুনিয়ার জীবন চলার ক্ষেত্রে সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে আখিরাতের অনন্ত জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দের নিশ্চয়তা লাভে দ্বীনের ব্যাপারে বিজ্ঞ আলিমের দ্বারস্থ হয়ে তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী প্রতিটি আমল সঠিকভাবে পালন তো আরো বেশী গুরুত্ববহ। এ কারণেই তো দ্বীন-ইসলাম কায়েম হওয়ার পর থেকে এ যুগ পর্যন্ত অসংখ্য মানুষ তাক্বলিদের আমল করে আসছেন। তাক্বলিদ শিরক কিংবা বিদআত বলা সত্যিই বাতুলতা ও জ্ঞানের সংকীর্ণতার পরিচায়ক। মানুষকে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করা থেকে

[৬২] ই'তিসাম, খ. ১, পৃ. ৬৪-৬৫।

এখনই ক্ষান্ত হওয়ার জন্য আমরা গায়র মুকাল্লিদ সকল গোষ্ঠির প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। মনে রাখা দরকার, বালিত কখনো স্থায়িত্ব লাভে সমর্থ নয়। অতীতের মতো এ যুগের সকল বাতিল গায়র মুকাল্লিদ দলও ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হবে। তবে ইতিহাসের এই করুণ পরিণতির শিকারে পরিণত হওয়ার পূর্বে তাদের বোধোদয় হবে এবং তারা তাওবাহ করে ভ্রান্তির পথ পরিত্যাগ করবেন ও তাক্বলিদ তথা মজাহাব অনুসরণের রাস্তায় ফিরে আসবেন, আমরা আল্লাহর দরবারে মুক্ত মনে এটাই কামনা করছি।

সবশেষে এটা মনে রাখা দরকার: "একজন নকল ডাক্তার যেরূপ স্বাস্থ্যের জন্য বিপদ, তদ্রূপ একজন নকল আ'লিম ঈমানের জন্য মহাবিপদ স্বরূপ।" এক দু'টো হাদিসের কিতাব [অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনূদিত ভাষায়] পাঠ করেই তারা আ'লিম এমনকি মুজতাহিদ হয়ে গেছেন বলে দাবী করে বসেন! এরাই হচ্ছেন 'নকল' আলিম। আর এরাই আবার আসল উলামা ও মুজতাহিদীনে কিরামকে পর্যন্ত 'শিরক' ও 'বিদআতী' হিসাবে সাব্যস্ত করতে একটুও দ্বিধাবোধ করেন না? বাস্তবে গায়র মুকাল্লিদরা নিজেদের নফসে আম্মারাকে অনুসরণ করছেন তাওহীদ ও দ্বীনি আমল মনে করে।

আমাদের গায়র মুকাল্লিদ ভাইগণ প্রায়শঃই কুরআন-হাদিসের ভুল ব্যাখ্যা দ্বারা নিজেদের বাতিল আক্বীদাকে প্রমাণ হিসাবে তুলে ধরেন। এরপর মারাত্মক আক্রমণ করেন মুকাল্লিদদেরকে এই বলে: "আল্লাহর প্রতি কোটি কোটি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি আমাদেরকে [গায়র মুকাল্লিদদেরকে] মাজহাব অনুসরণের শিরক থেকে বাঁচিয়ে রাখা ও 'হানাফি', 'শাফিঈ', 'মালিকী' কিংবা 'হাম্বলী' হিসাবে পরিচিত না হওয়ায়। অনেক লোক এরই মধ্যে আটকা পড়ে গেছে। অথচ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ অমান্য হলো শিরক। যেমন কুরআনে ঘোষণা এসেছে, যেখানে বলা আছে, মানুষ তাদের আলিম ও ধর্মীয় নেতাদেরকে আল্লাহর বদলে প্রভু হিসাবে মেনে নিয়েছে। আদি বিন হাতিম রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদিস দ্বারাও এ কথাটি প্রমাণিত।"[৬৩]

কী মারাত্মক ভ্রান্তি! কী জগন্য বিষোদগার মুকাল্লিদদের প্রতি! কুরআনের উক্ত আয়াতে ইয়াহুদী-খৃস্টানদের ভ্রান্তির কথা বলা হয়েছে। তারা তাদের দুর্নীতিপরায়ণ পাদ্রী ও রাবিদের অনুসরণ করেছিল। এই ধর্মীয় নেতারা আসলে নিজেদের ধর্মের নির্দেশনাবলীর তোয়াক্কা না করে ইচ্ছেমাফিক হালালকে হারাম ও

[৬৩] ফিক্বহে মুহাম্মদী, পৃ. ৪।

হারামকে হালাল বলেছিল। আর খৃস্টান ও ইয়াহুদীরা তাদেরই অনুসরণ করে। হযরত আদি বিন হাতিম রাদ্বিআল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ইয়াহুদী-খৃস্টানরা কিভাবে নিজেদের ধর্মীয় নেতাদেরকে প্রভু হিসাবে গ্রহণ করেছিল? কারণ তারা তো কখনো তাদের উপাসনা করে না। তিনি জবাব দিলেন: "যদিও তারা ওদের উপাসনা করে নি, তারা বিশ্বাস করেছে এসব লোক [মনগড়া] যা কিছু আইনসঙ্গত বলে ঘোষণা দেয় তা সত্যি ও [মনগড়া] যা কিছু আইনসঙ্গত নয় বলে ঘোষণা দেয় তা-ও সত্য।" [তিরমিযি]

তাক্বলিদ ও ইয়াহুদী-খৃস্টানদের তরীকার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য হলো, মুসলমানরা ইমামকে কখনো শরীয়তের মনগড়া আইনপ্রণেতা ইমাম হিসাবে মানেন না। অথচ ইয়াহুদী-খৃস্টানরা এ জিনিসটিই করে থাকে। এমনটি এই আধুনিক যুগেও এটা অহরহ ঘটছে। মহিলাদেরকে পাদ্রী বানানো বাইবেলে নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও উচ্চ পদস্থ পুরুষ পাদ্রীরা মিলে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে নারীদেরকে পাদ্রী বানানোর অনুমতি দিয়েছে। অনুরূপ কাজ ইসলামের ক্ষেত্রে কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না। মুসলমানদের ইমামগণ আল্লাহর নির্দেশনাবলীকেই সঠিক ব্যাখ্যা করে শরয়ী আইন প্রণয়ন করেন সবার সুবিধার্থে। এ ব্যাপারে এই গ্রন্থের অনেক জায়গায় ব্যাখ্যা তুলে ধরা হয়েছে। সুতরাং উপরোক্ত আয়াতে করীমা তাক্বলিদের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কহীন।

সবশেষে শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির একটি উদ্ধৃতি দ্বারা এ প্রসঙ্গের ইতি টানছি। আল্লাহ তা'আলা সবাইকে দ্বীন ইসলাম বুঝার তাওফিক দিন। আমীন।

শাহ সাহেব লিখেছেন: "মূল নির্দেশনাবলী এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে। হালাল হারামের পার্থক্য নির্ণয়ের কাজটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কথা ও কাজ দ্বারা স্পষ্ট করেছেন। এগুলো অবশ্যই আল্লাহর নির্দেশনাবলীর নিদর্শন। মুজতাহিদীনে কিরাম এগুলোকে আরো স্পষ্ট করেছেন উম্মাহ্‌র জন্য। তাঁরা রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাস থেকেই বর্ণনা করেছেন এবং যা তিনি বলেছেন তা থেকেই শরয়ী আইন-কানুন প্রতিষ্ঠিত করেছেন।" [হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, খ. ১, পৃ. ১২৭][৬৪]

[৬৪] এ পরিচ্ছেদের অধিকাংশ সূত্র হযরত আবদুর রহীম লাজপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রণীত 'ফাতওয়ায়ে রাহীমিয়া', খ. ১. পৃ. ৪০৭-৪৪২।

২. *আধুনিক তথাকথিত 'সালাফিরা' মনে করেন আল্লাহ পাক উর্ধ্বাকাশে একখানা চেয়ারে বসে আছেন। তাঁর যাবতীয় গুণাবলী আক্ষরিক। আমরা যেভাবে এগুলোকে বুঝি সেরূপই তার অর্থ। সুতরাং সালাফিদের বিশ্বাস: প্রভু বসেন, উপরে উঠেন ও নীচে নামেন ইত্যাদি যেমনটি কোন মানুষ করে থাকে। তিনি যে অসীম, সর্বত্র বিরাজমান, বস্তু জগতের সঙ্গে তাঁর কোন সামঞ্জস্য নেই, তিনি সবকিছু থেকে ভিন্ন ইত্যাদি সালাফিরা বিশ্বাস করেন না।*[৬৫]

৩. *তারা বলেন আল্লাহ তাআ'লার হাত, পা, মুখ ইত্যাদিও আছে। অর্থাৎ তাঁর দেহ আছে। কারণ হিসাবে তারা বলেন বিভিন্ন হাদিস ও কুরআনের আয়াতে আল্লাহর 'হাত', 'পা' ইত্যাদি বর্ণিত আছে। এসব শব্দ দ্বারা যে মানবিক হাত, পা কিংবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বুঝাচ্ছে না এ কথাটি তারা গ্রহণ করতে নারাজ। তারা আক্ষরিক অর্থের উপর বেশী গুরুত্বারোপ করেন। এমনকি তাদের অনেকে বলেন, কুরআন শরীফকে 'ব্যাখ্যা' বা তাফসীর করার অধিকার কারোর নেই। বরং কুরআনের প্রতিটি বাক্য ও শব্দকে 'আক্ষরিক' দিক থেকে বুঝতে হবে।*[৬৬]

তাদের এই আক্বীদাগুলোর খণ্ডন: তাদের এই (উক্ত ২ ও ৩ -এ বর্ণিত) আক্বীদা সত্যিই মারাত্মক ভ্রম। হযরত ইবনে হাজর হাইসামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর প্রণীত 'মিনহাজুল ক্বাওয়িম শারহুল মুক্বাদ্দিমাহাল হাদ্বরামিয়া' [মূল কিতাবের লেখক: হযরত ফকীহ আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান ফজল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি] গ্রন্থের ১৪৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন: "জেনে রাখো, শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবনে ইদ্রিস আল-মালিকী ক্বারাফী এবং অন্যান্য বুজুর্গ ইমাম শাফিঈ, ইমাম মালিক, ইমাম হাম্বল এবং ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম থেকে রিওয়ায়েত করেন, তাঁরা বলেছেন 'যারা বলে আল্লাহ কোনো দিকে আছেন, কিংবা তাঁর দেহ আছে তারা কুফরী করলো- এবং তাদের জন্য এই ফাতওয়াই প্রযোজ্য'।" হযরত জালালুদ্দীন সুয়ূতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর

[৬৫] ইবনে বায, তাঁর রচিত 'তানবিহাত হাম্মা', কুয়েত, জামিয়া ইহিউত্ তুরাছ আল-ইসলামী, পৃ: ২২ দ্র; আরেক সালাফী লেখক, মুহাম্মদ খলিল হাররাস অনুরূপ বলেছেন তার রচিত ইবনে তাইমিয়ার কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'শরহে আক্বিদাতুল ওয়াসিতিয়া', পৃ: ৭৩।
[৬৬] উপরোক্ত (১) ও (২) কিতাব দ্রঃ।

'আস-আশবাহ ওয়ান-নাজাইর' গ্রন্থের ৪৮৮ পৃষ্ঠায় বলেন, "ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, 'যে কেউ আল্লাহর দেহ আছে বলে বিশ্বাস করলো, সে কুফরী করলো'।" আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ইমাম হযরত আবুল হাসান আশআরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'আন-নাওয়াজির' গ্রন্থে বলেন, "যে কেউ বলে আল্লাহর দেহ আছে, সে আল্লাহকে জানে নি এবং সে (এ বিশ্বাসের কারণে) কাফির হয়ে গেছে।" কাজি আবদুল ওয়াহহাব ইবনে আলী ইবনে নাসির আল-বাগদাদী আল-মালিকী [মৃ. ৪২২ হি.] রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "তাঁর [আল্লাহর] প্রতি 'কিভাবে' শব্দপ্রয়োগ ব্যবহার বৈধ নয়। কারণ ইসলাম ধর্ম এ ধরনের বিশ্বাস নিয়ে আসে নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ বলেন নি, তাঁর আসহাবে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুমও তাঁকে এ ধরনের প্রশ্ন করেন নি। এর কারণ হলো, এরূপ শব্দ ব্যবহারের সাথে সম্পৃক্ত আছে, নড়াচড়া, এখান থেকে ওখানে যাত্রা, স্থান দখল ইত্যাদি। এর মাধ্যমে আল্লাহর দেহ আছে বলে ধারণা জন্মে। অথচ আল্লাহ তা'আলা এ থেকে পবিত্র। এটা সকল মুসলমানের বিশ্বাস, এরূপ বলা কুফরী।"[৬৭] শায়খ কামাল ইবনে হুমাম হানাফী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন: "যে কেউ বলে, অপর কোনো দেহ থেকে ভিন্ন একটি দেহ আল্লাহর আছে, সে কুফরী করলো।"[৬৮]

সুতরাং সর্বোচ্চ পর্যায়ের বুজুর্গানে দ্বীনের ঐকমত্য হলো, সৃষ্ট বস্তুর মতো আল্লাহর দেহ, হাত, পা ইত্যাদি আছে বলে বিশ্বাস করা এবং তিনি কোনো বিশেষ দিকে, বিশেষ স্থান দখল করে বসে আছেন বলে মনে করা মূলত কুফরীর নামান্তর। আমরা এরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে আল্লাহর দরবারে পানাহ চাই। তথাকথিত সালাফিরা সেই দার্শনিক যুক্তিবাদের ফাঁদে আটকা পড়েছে: 'আল্লাহর যদি দেহ না থাকে, তিনি যদি কোনো স্থান দখল না করে থাকেন, তিনি যদি নিরাকার হন তাহলে তাঁর অস্তিত্বই তো অস্বীকার করা হলো!'। এ যুক্তি যদি সত্য হয় তাহলে প্রশ্ন থাকে, 'স্থান ও দিক সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ কোথায় ছিলেন?'। এর জবাবে হয় বলতে হবে তিনি ছিলেন না, যা কুফরী, অথবা তাঁর জন্য দেহ, দিক, স্থান ইত্যাদি প্রযোজ্য নয়। তিনি এসব গুণ থেকেও পবিত্র। আর এটাই সঠিক আক্বীদা। আমরা সত্যিকার সালফে-সালিহীনের অন্তর্ভুক্ত মহাত্মন ইমামে আজম হযরত আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির একটি উক্তি দ্বারা বিষয়টি আরো

[৬৭] শরহে আক্বীদা মালিক আস-সাগির, পৃ: ২৮

[৬৮] ফাতহুল কাদির।

বুঝিয়ে বলতে চাই। তিনি তাঁর ফিকহুল আকবর গ্রন্থে বলেন: "তিনি (আল্লাহ) কোনো কিছুর মতো নন এবং কোনে কিছুই তাঁর মতো নয়। সুতরাং যে কেউ তাঁকে তাঁর সৃষ্টির কোনো এক বা একাধিক বস্তুর সঙ্গে তুলনা করবে সে কুফরী করবে।"[৬৯]

পবিত্র কুরআনের একটি মাত্র আয়াতে করীমার অংশ দ্বারা তাদের ভ্রান্ত এই আক্বীদা রদ করা যায়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

-"কোনো কিছুই [যে কেনো দিক থেকেই হোক না কেন] তাঁর অনুরূপ নয়, এবং তিনি সবকিছু শুনেন ও দেখেন"। [সূরা শুরা : ৪৫]

সুতরাং সৃষ্ট যে কোন বস্তুর সাথে তাঁর তুলনা মূলত শিরক ও কুফরীর নামান্তর। লক্ষ্য করুন, তিনি কোনো কিছুর সঙ্গে তুল্য নন ঘোষণা দিয়ে বলেছেন, তিনি সবকিছু শুনেন ও দেখেন। অর্থাৎ তাঁর শুনা ও দেখা সৃষ্ট কোন প্রাণীদের শুনা ও দেখার সাথে তুল্য নয়। কারণ, প্রাণীদের শুনার সাথে জড়িত আছে শব্দতরঙ্গ ও তা বহনের জন্য মাধ্যম। অনুরূপ দেখার সাথে জড়িত আছে আলো ও এর প্রতিবিম্ব ইত্যাদি। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার উক্ত আয়াত থেকে এটাও স্পষ্ট হলো যে, কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে তাঁর হাত, পা, দেখা, শুনা, সাথে থাকা ইত্যাদি উক্তি দ্বারা আমরা যেভাবে বুঝি সেভাবে তিনি তাঁর এসব কুদরতী গুণাবলীর উল্লেখ করতে যেয়ে এরূপ বলেছেন। এ থেকে এটা বুঝায় না, প্রাণীদের মতো তাঁর হাত, পা কিংবা শুনা ও দেখার জন্য দেহ ও দেহাংশ কিংবা কোনো ধরনের ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন? মোটকথা, সৃষ্ট কোন বস্তুর সঙ্গেই তাঁর কোনো গুণাবলীর তুলনা করা যাবে না। আল্লাহর যাত সম্পর্কে অতিরিক্ত চিন্তা-গবেষণা উলামায়ে কিরাম নিষিদ্ধ করেছেন, তাই এখানেই প্রসঙ্গের ইতি টানলাম।

[৬৯] ফিকহুল আকবর, পৃ: ৪৯০। তথাকথিত সালাফিরা বলে, ইমামে আজম এই গ্রন্থটি লিখেন নি। জানা থাকা দরকার যে, তাদের এই দাবী ভ্রান্ত। তিনি নিজেই গ্রন্থটি লিপিবদ্ধ করার জন্য তাঁর ছাত্রদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। যুগের এসব শ্রেষ্ঠ অনুলেখক, গবেষক ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন হযরত মাম্মাদ ইবনে আবুহানিফা, হযরত কাজি আবু ইউসুফ, আবু মু'তি আল-হাকাম ইবনে আবদুল্লাহ বলখী এবং আবু মাক্বাতিল হাফস ইবনে সালমাস সমরকন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম। [হাফিজ মুহাম্মদ মুরতাজা জাবিদী রাহ. প্রণীত ইতাফাস সাদাল মুত্তাকীন, খ.২, পৃ:14]

৪. *তাওয়াসসুল বা মৃত ব্যক্তির নেক আমলের ওয়াসিলা নিয়ে দু'আ করা তারা মানে না।*[৭০] *অথচ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আক্বীদা হলো তাওয়াসসুল বা যে কোন মৃত ব্যক্তির নেক আমলের ওয়াসিলাসহ দু'আ করা জায়িয।*

মুতাজিলাদের মতো নাসিরুদ্দীন আলবানি 'তাওয়াস্সুল' [ওয়াসিলার অন্বেষণ], ওয়াসিলা নিয়ে আল্লাহর নিকট সাহায্য চাওয়া এবং 'তাশাফ্ফু' [নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়াত কামনা] ইত্যাদি উপায়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াসিলা নিয়ে কামনা করা ইসলামে অবৈধ বলে তিনি ঘোষণা দিয়েছেন। অনুরূপ আওলিয়ায়ে কিরামের নেক আমলের ওয়াসিলা নিয়ে কোন নেক কিছু অর্জনের কামনাও তিনি অবৈধ বলেছেন। তিনি 'হারাম' বলেই থামেন নি, বরং এসব আমল তার মতে 'শির্ক' বলেছেন। তার প্রণীত বই 'আত-তাওয়াস্সুল'-এ এই ফাতওয়া জারি করেছেন। একই ফাতওয়া তার বন্ধু ও সালাফিদের অপর ইমাম আবদুল্লাহ বিন বাযও দিয়েছেন। তাদের আরেক আলিম কাহতানীও তার রচিত 'আল-ওয়ালা' ওয়াল বারাআ'' গ্রন্থে এর সমর্থন করেছেন।

তাদের এই দাবীর খণ্ডন: তাওয়াসসুলের প্রমাণ হাদিস শরীফে বিদ্যমান। যেমন একটি হাদিসে আছে: হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আর সময় বলতেন:

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ

-"হে আল্লাহ! আমি আপনাকে সওয়াল করছি আপনার প্রতি হক্ব সাওয়ালকারীদের মাধ্যমে।" [সুনানে ইবনে মাজাহ][৭১]

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াসিলা নিয়ে হযরত আদম আলাইহিস্সালাম দু'আ করেছেন। আদম আলাইহিস্সালাম কর্তৃক তাওয়াস্সুল করার কারণ ছিলো, তিনি আরশে আজীমে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু

[৭০] বিন বায, ফাতহুল বারী কিতাবের উপর মন্তব্য। সালাফীদের এই আক্বীদা সম্পর্কে সকলেই অবগত।

[৭১] হাফিজ ইবনে হাজর আসকালানী রাহ. এই হাদিসটি সহীহ বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মুবারক দেখেছিলেন। এই বর্ণনার সত্যতা একটি হাদিস শরীফ থেকে পাওয়া যায়:

عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لما اقترف آدم الخطيئة قال : يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لى فقال الله : يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه قال : يا رب لأنك لما خلقتنى بيدك ونفخت فى من روحك رفعت رأسى فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك فقال الله : صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلى ادعنى بحقه فقد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك

-হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আদম আলাইহিস্সালাম যখন ভুল করলেন, তখন বললেন: "হে আমার পালনকর্তা! আপনার নিকট সওয়াল করছি মুহাম্মদের ওয়াসিলা নিয়ে। আপনি আমাকে ক্ষমা করুণ। আল্লাহ বললেন; হে আদম! তুমি মুহাম্মদকে চিনলে কিভাবে? আমি তো তাঁকে সৃষ্টিই করি নি? তিনি বললেন; হে রব! আপনি যখন আমাকে স্বহস্তে সৃষ্টি করলেন ও আমার মধ্যে রূহ ফুৎকার করলেন, তখন মাথা তুলেই আরশে আজীমের খুঁটিতে লেখা দেখি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মাহম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'। এতে আমি বুঝলাম, আপনার নামের সঙ্গে যার নাম যুক্ত আছে নিশ্চয়ই তিনি আপনার কাছে সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি হবেন। আল্লাহ বলেন: হে আদম! তুমি সত্যি বলেছো। তিনি আমার সবচেয়ে প্রিয় বান্দাহ। তাঁর ওয়াসিলা নিয়ে আমাকে ডেকেছো, তাই আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম। যদি মুহাম্মদ না হতেন তবে আমি তোমাকে সৃষ্টিই করতাম না।" [মুসতাদরাকে হাকিম। কিতাবের প্রণেতা হাদিসের সনদ সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন]

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লামের ইন্তকালের পরও সাহাবায়ে কিরাম কর্তৃক তাওয়াস্‌সুলের প্রমাণ বিদ্যমান। নিম্নে এ সম্পর্কিত একটি বর্ণনা তুলে ধরলাম।

عن أنس قال :كانوا إذا قحطوا على عهد النبى صلى الله عليه وسلم استسقوا بالنبى صلى الله عليه وسلم فيستسقى لهم فيسقون فلما كان بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم فى إمارة عمر قحطوا فخرج عمر بالعباس يستسقى به فقال : اللهم إنا كنا إذا قحطنا على عهد نبيك صلى الله عليه وسلم واستسقينا به فسقيتنا وأنا نتوسل إليك اليوم بعم نبيك صلى الله عليه وسلم فاسقنا قال : فسقوا

-"হযরত আনাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে অনাবৃষ্টির শিকার হলে লোকজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাথে নিয়ে বৃষ্টির জন্য দু'আ করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও বৃষ্টির জন্য দু'আ করতেন এবং আল্লাহ তাদেরকে বৃষ্টি দান করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর যুগে তারা যখন অনাবৃষ্টির শিকার হন, তখন উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু হযরত আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন ও তাঁর [হযরত আব্বাসের] ওয়াসিলা নিয়ে বৃষ্টির কামনা করলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আমরা তোমার নবীর যুগে অনাবৃষ্টির সময় তোমার নবীর উসিলায় পানি চাইতাম। আপনি পানি দান করতেন। আর আজকে তাঁর চাচার ওয়াসিলা নিয়ে বৃষ্টি চাচ্ছি, আমাদেরকে দান করুন। বর্ণনাকারী বলেন, এর পরই তারা বৃষ্টি লাভ করেন।" [সহীহ ইবনে হিব্বান]

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লামের মান-মর্যাদা রোজ কিয়ামতেও প্রকাশ পাবে। তিনি সকল মানুষের জন্য সুপারিশ করবেন। যেমন বুখারী শরীফে আছে:

إِنَّ الشَّمْسَ تَدْنُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَبْلُغَ الْعَرَقُ نِصْفَ الْأُذُنِ فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ اسْتَغَاثُوا بِآدَمَ ثُمَّ بِمُوسَى ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فَيَوْمَئِذٍ يَبْعَثُهُ اللهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجَمْعِ كُلُّهُمْ

-হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "সত্যিই, রোজ কিয়ামতের দিন সূর্য এতো নিকটবর্তী হবে যে, মানুষের ঘাম কান পর্যন্ত তাকে ডুবিয়ে দেবে। তারা তখন আদম আলাইহিস্‌সালামকে সুপারিশের জন্য বলবে, তারপর মূসা আলাইহিস্‌সালামকে সুপারিশের জন্য বলবে, এরপর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুপারিশ করবেন। ... এবং এদিন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে [মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে] প্রশংসিত স্থানে অধিষ্ঠিত করবেন। ফলে সমবেত সকলে তাঁর প্রশংসা করবে।"

৫. আম্বিয়ায়ে কিরাম এবং বিশেষ করে আমাদের নজীবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে তাঁর কবর শরীফে জিন্দা আছেন এই আক্বীদায় তারা বিশ্বাসী নয়। অর্থাৎ 'হায়াতুন্নাবী' আক্বীদা তারা মানে না।[৭২]

আলবানি বলেছেন: "যারা তাঁর কবরে যেয়ে সালাম জানায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিয়েছেন বলে কোন প্রমাণ আমি খুঁজে পাই নি।"[৭৩] আরো বলেছেন: "আমি জানি না, কোত্থেকে ইবনে তাইমিয়া এরূপ দাবী করলেন যে, কবরের নিকটে যেয়ে সালাম দিলে তিনি (নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সালাম শ্রবণ করেন ও জবাব দেন।"[৭৪]

তাদের এই আক্বীদার খণ্ডন: হাদিস শরীফে আছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك رضى الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم : اَلْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءٌ فِي قُبُوْرِهِمْ يُصَلُّوْنَ

-"হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নবীগণ কবরে জীবিত। তাঁরা নামাযও আদায় করেন।"[৭৫]

অন্য হাদিসে আছে: হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من صلى علىّ عند قبرى سمعته ومن صلى علىّ نائيا أبلغته -

[৭২]নাসিরুদ্দীন আলাবানী পাঁচটি কিতাবে উল্লেখ করেছেন, 'সবুজ গম্বুজ ভেঙ্গে শায়খাইনের কবরদ্বয় ও নজীবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাসের করব মুবারক সমজিদের বাইরে নেওয়ার দরকার'।
[৭৩] মাজমুআল ফাতওয়া, খণ্ড ২৭, পৃ: ৩৮৪।
[৭৪] নুমান আল-আলুসি রাহ. এর 'আয়াতুল বায়্যিনাতের' কিতাবের তার লেখা নোটে, পৃ: ৮০ এবং তার 'সিলসিলা জায়িফা' কিতাবে, পৃ: ২০৩।
[৭৫]হায়াতুল আম্বিয়া লিলবাইহাক্বী, পৃ.১; সাফাউস্ সাক্বাম, পৃ: ১৩৪, হযরত মাওলানা সাফরাজ খান সাফদার রাহ. প্রণীত 'তাসকীনুস সুদুর' কিতাব থেকে উদ্ধৃত।

-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "যে আমার কবরের পাশে গিয়ে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে, আমি তা নিজেই শুনি। আর যে দূর থেকে পড়বে, তা আমার নিকট পৌঁছানো হয়।" [বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান; মিশকাত]

অপর আরেক হাদিস শরীফে আছে: হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসীর রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত:

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ وَإِنَّ أَحَدًا لَنْ يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا قَالَ قُلْتُ وَبَعْدَ الْمَوْتِ قَالَ وَبَعْدَ الْمَوْتِ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ

-"আবি দাদরা রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: জুমু'আর দিন আমার উপর বেশী করে সালাত পড়ো। কারণ এটি হলো মাশহুদ দিবস [একত্রিত হওয়ার দিন], ফিরিশতাগণ এদিন উপস্থিত হন। কেউ যখন আমার উপর দরূদ পাঠ করবে, সে এ থেকে ফারিগ না হওয়া পর্যন্ত আমার কাছে তা পৌঁছানো হয়। আমি [অর্থাৎ আবু দারদা রা.] জিজ্ঞেস করলাম, মৃত্যুর পরও কি? বললেন, হ্যাঁ মৃত্যুর পরও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা নবীগণের দেহ গ্রাস করতে মাটিকে নিষেধ করেছেন। আল্লাহর নবী জীবিত, তাঁকে খাবারও দেওয়া হয়।" [সহীহ ইবনে মাজাহ]

উপরোক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী ক্বারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন:

فإن الله تعالى قال فى حق الشهداء من أمته بل أحياء عند ربهم يرزقون آل عمران فكيف سيدهم بل رئيسهم لأنه حصل له أيضا مرتبة الشهادة مع مزيد السعادة بأكل الشاة المسمومة وعود سمها المغمومة وإنما عصمه الله تعالى من

الشهادة الحقيقية للبشاعة الصورية ولإظهار القدرة الكاملة بحفظ فرد من بين أعدائه من شر البرية

অর্থাৎ: "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের শহীদদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তাঁরা বরং জীবিত, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁরা খাবার গ্রহণ করেন' [সূরা আলে-ইমরান : ১৬৯], সুতরাং যিনি শহীদদের সরদার, তাঁর শান কিরূপ হবে? অন্যদিকে তিনি তো শাহাদাতের দরজা লাভেও ধন্য। তিনি এই দরজা লাভ করেছেন বিষ মিশ্রিত বকরির মাংস খাওয়ার কারণে। [জীবনের শেষ পর্যায়ে] এই মারাত্মক বিষের ক্রিয়া আবার শুরু হয়েছিল। তবে বাহ্যিক শাহাদাত থেকে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এজন্য মুক্ত রেখেছেন, যেনো দেহের চেহারা বিকৃতি না হয়। তাছাড়া তাঁর সামনে নিকৃষ্ট শত্রুদের থেকে রক্ষা করে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজ পরিপূর্ণ কুদরতের বিকাশ ঘটিয়েছেন।"[৭৬]

হাদিস শরীফে আরো আছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ,رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أن رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلا رَدَّ اللهُ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ.

-"হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "কোন মুসলমান আমার উপর দরূদ ও সালাম পেশ করলে আল্লাহ তা'আলা আমার রূহকে আমার মধ্যে এনে দেন এবং আমি তার জবাব দেই।"[৭৭]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর শরীফ জিয়ারত করলে কী উপকার হয় তা হুজুর নিজেই ইরশাদ করেছেন: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

[৭৬] মিরকাতুল মাফাতিহ শরহে মিশকাতুল মাসাবিহ।

[৭৭] আবু দাউদ, মুসনাদে আহমদ।

من زار قبرى وجبت له شفاعتى

-"যে আমার কবর জিয়ারত করবে তার জন্য শাফায়াত করা আমার জন্য ওয়াজিব হবে"।[৭৮]

পবিত্র কুরআন শরীফে আল্লাহ তা'আলা ইশাদ করেন:

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَـٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ

-"আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদের মৃত বলো না বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বুঝ না।" [সূরা বাক্বারাহ : ১৫৪]

উপরোক্ত কুরআনের আয়াত ও হদীস শরীফসমূহ থেকে আম্বিয়া আলাইহিমুস্সালাম যে তাঁদের কবরে জিন্দা আছেন তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল। উল্লেখ্য সালাফিদের 'বড় খালাফি ইমাম' ইবনে তাইমিয়া কিন্তু এই আক্বীদার বিরোধিতা করেন নি। এজন্য অবশ্য আলাবানী তার উপরও দোষারোপ করেছেন!

হযরত রাসূলে মবকুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকালের পর করব শরীফ থেকে সালামের জবাব দিয়েছেন বলে বেশ কিছু নির্ভরযোগ্য বর্ণনা পাওয়া যায়। অবশ্য আলবানি সাহেব এসব বর্ণনায় বিশ্বাস করেন না- এটা আমাদের জানা আাছে। এরপরও পাঠকদের অবগতির জন্য একটি বিখ্যাত বর্ণনা এখানে তুলে ধরছি।

হযরত উতবি' রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণিত ঘটনা: হাফিজ ইবনে কাসীর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন, হিজরী তৃতীয় শতকের কথা। হযরত উতবি' নামক এক বুজুর্গ বলেন, "আমি একদা হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র কবরের পাশে বসা ছিলাম। একজন বেদুঈন আসলেন। তিনি কবর শরীফের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন: 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনার প্রতি সালাম পেশ করছি। আমি শুনেছি আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন:

[৭৮] দারে কুতনী, ইমাম হাফিজ তুবকী প্রণীত 'শিফাউ সিকাম' এবং হাফিজ আবদুল হক শিবলী প্রণীত 'আহকাম শরীয়াতুল উসতা'।

“আর যদি তারা নিজেদের প্রতি জুলুম করে থাকে, তাহলে তারা আপনার নিকট আসে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহর রাসূলের উচিৎ, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা; অবশ্যই আল্লাহ তা’আলা সর্বাধিক ক্ষমাকারী ও দয়ালু।” [সূরা নিসা : ৬৪]

এরপর তিনি আরো বললেন: ‘সুতরাং আমি আপনার নিকট এসেছি, আমার পাপ মোচনের জন্য আল্লাহর দরবারে আপনি সুপারিশ করবেন এই আশায়।’ এরপর তিনি এই কবিতাটি পাঠ করলেন আবেগভরে:

يا خير من دفنت فى الترب أعظمـه * فطاب من طيبهـن القـاع والأكـم

نفسى الفـداء لقبـر أنـت ساكنـه * فيه العفاف وفيـه الجـود والكـرم

অর্থাৎ: “হে মৃত্তিকার মধ্যে শায়িতদের সর্বোত্তম জন / যাঁর মর্যাদায় মাটি ও পর্বত হয়েছে ধন্য। আমার আত্মা আপনার সমাধির জন্য উৎসর্গ হোক / কারণ এখানে পবিত্রতা, দয়ার্দ্রতা ও মাহাত্ম্য বিদ্যমান।”

উতবি’ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “এরপর বেদুঈন লোকটি চলে গেলেন। আমার তন্দ্রা এসে গেল। স্বপ্নযোগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটলো। তিনি আমাকে বললেন: “হে উতবি’! ঐ বেদুঈনকে ডেকে সুসংবাদ দাও, আল্লাহ তা’আলা তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন”।”[৭৯]

[৭৯]প্রখ্যাত এই ঘটনাটি ইবনে কাসীর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া ইমাম বাইহাকী তাঁর শুয়াবুল ঈমান, ইবনে কুদামা হাম্বলী তাঁর মুগনী, ইমাম নববী তাঁর মুজমু’ এবং ইবনে আসাকির তাঁর তারিখে ইবনে আসাকীরে এটি বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি সত্য হওয়ার ব্যাপারে কোন মতানৈক্য নেই।

৬. *কিয়াস ও তাওয়িল ব্যবহারের মাধ্যমে তারা ‘অমুসলিম’ সৈন্যসামন্তদেরকে [ইয়াহুদ-নাসারা] মুসলিম দেশ ও জনপদে প্রবেশ ও অবস্থানের অনুমতি দিয়ে ফাতওয়া জারী করায় আজ অসংখ্য মুসলমানের জানমালের বিরাট ক্ষতি হচ্ছে।*[৮০]

তাদের এই ফাতওয়ার খণ্ডন: প্রথমেই আমরা প্রমাণ করবো পবিত্র কুরআনের আলোকে, ইয়াহুদ-নাসারা কখনো মুসলমানদের বন্ধু বা শুভাকাঙ্ক্ষী হবে না। কুরআন শরীফে আল্লাহ তা’আলা ঘোষণা দিয়েছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

“হে মু’মিনগণ! তোমরা ইয়াহুদী ও খ্রীস্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালিমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।”। [সূরা মায়িদাহ : ৫১]

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

-“হে ঈমানদারগণ! মুশরিকরা তো অপবিত্র সুতরাং এ বছরের পর তারা যেন মাসজিদুল-হারামের নিকট না আসে। আর যদি তোমরা দারিদ্র্যের আশঙ্কা কর, তবে আল্লাহ চাইলে নিজ করুণায় ভবিষ্যতে তোমাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়”। [সূলা তাওবাহ : ২৮]

লক্ষ্য করুন, আল্লাহ তা’আলা তাদেরকে নিজ করুণায় ভবিষ্যতে ধন-সম্পদ দানের ইঙ্গিত দিয়েছেন। আজ তারা ধন-সম্পদের মালিক হয়ে আল্লাহর নির্দেশকে অমান্য করলেন। এর ফলে লক্ষ লক্ষ মুসলমান প্রাণ হারালেন।

[৮০]আবদুল্লাহ বিন বাযের ফাতওয়াহ: আল-ফিকহিয়্যাতুল মা’আসিরা, নং ৬, ১৯৯০, উপসাগর যুদ্ধ প্রসঙ্গ, পৃ: ১৮৪-১৮৮, এবং আলবানির ‘সিলসিলাতুল আহাদিসুস সাহিহা’ গ্রন্থ দ্রঃ।

ওয়াহাবী ও সালাফিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হুকুমতের চাপে বিন বায ও আলবানি এই ফাতওয়া দ্বারা কিরূপ মারাত্মক ক্ষতি করেছেন তা সকলে আজ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন।

এবার আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদের সম্পর্কে কী নির্দেশ দিয়েছেন তা তুলে ধরছি। পাঠকরা এ থেকেই আবদুল্লাহ বিন বায ও আলবানির উপরোক্ত ফাতওয়া যে ইসলাম এবং মুসলমানদের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর ও কুরআন-হাদিসের বিরুদ্ধে ছিলো, তা অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন।

হাদিস শরীফে এসেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ

-"মুশরিকদেরকে আরব ভূখণ্ড থেকে বের করে দাও।" [বুখারী]

অন্য হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাস করে ইয়াহুদ-নাসারাদেরকে নির্দিষ্ট করে বলেন:

لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّىٰ لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا

-"আমি অবশ্যই ইয়াহুদ ও নাসারাদের আরব ভূখণ্ড থেকে বের করে দেবো। এমনকি মুসলমান ছাড়া এখানে কাউকে থাকতে দেবো না"। [মুসলিম]

৭. ***সহীহ হাদিসগ্রন্থ যেমন বুখারী ও মুসলিম শরীফের মূল অনুলিপির সুবিধাজনক অনুবাদ ও ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রকাশ করে তারা মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় ও মক্কা শরীফে স্থাপিত উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়কে 'সালাফি/ ওয়াহাবী/ খারিজী' সৃষ্টির কেন্দ্রে রূপান্তরিত করেছে। এ দু'টো বিশ্ববিদ্যালয় এখন 'ব্রেনওয়াশ' সেন্টার নামে খ্যাত হয়েছে।***

ক্ষমার অযোগ্য ও নিন্দনীয় এসব কাজের প্রমাণ: সালাফি/ওয়াহাবীদের কর্তৃক মূল মুতনসহ অনূদিত গ্রন্থে 'পরিবর্তনের' বহু প্রমাণ আছে। যে বিষয়টি তাদের পছন্দ হয় নি বা তাদের আক্বীদা বিরোধী হিসাবে দৃশ্যত হয়েছে, সেটি 'জাল' করে নিয়েছে।

তারা এই 'জালকরণ' বা তাদের ভাষায় 'সঠিককরণ' কাজ চারটি উপায়ে সম্পাদন করে যাচ্ছে:

১. মূল গ্রন্থগুলোর 'অপছন্দনীয়' অংশ রদবদল: যেখানে মূল মুত্ন বা লেখা বদলানোর সুযোগ নেই, যেমন কুরআন ও সহীহ হাদিসগ্রন্থ, সেখানে তারা বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে অর্থে রদবদল করছে তাদের ভ্রান্ত আক্বীদা প্রতিষ্ঠা করতে।

২. মূল গ্রন্থগুলোকে 'সঠিককরণ': আলবানি, বিন বায ও উসাইমিন প্রমুখ 'স্কলার' এ কাজে সিদ্ধহস্ত। আলবানি তো সহীহ হাদিস শরীফের 'সংক্ষিপ্ত সংস্করণ' প্রকাশ করার ধৃষ্টতাও দেখিয়েছেন। এরূপ মারাত্মক কাজ কেউ কোনদিন করে নি। ভেবে দেখুন, আজ থেকে শত বছর পর এসব 'সংক্ষিপ্ত সংস্করণ'ই সবার নিকট মূল কিতাব হিসাবে স্বীকৃত হতে পারে কি না।

৩. তাদের কর্তৃক 'নিন্দিত' সকল গ্রন্থের সংস্করণ পুনঃমুদ্রণ বন্ধ করা: গ্রন্থের লেখক যেই হন না কেনো, তাদের ভ্রান্ত আক্বীদা বিরোধী কিছু চোখে পড়লেই তারা এর পুনঃমুদ্রণ নিষিদ্ধ করে দেয়।

৪. সুফী-পীর-আউলিয়া এবং আশ'আরী-মাতুরিদীপন্থী মুক্বাল্লিদদের উপর আক্রমনাত্মক নতুন গ্রন্থ রচনা ও প্রচার: পীর-মুরিদী ও মাজহাব (এবং বিশেষ করে হানাফী মাজহাব) তারা ঘৃণা করে। প্রতিনিয়ত এ বিষয়গুলোর

উপর সূত্র 'জাল' করে ছোট-বড় গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করা হচ্ছে। এতে বিভ্রান্ত হচ্ছেন নতুন প্রজন্ম ও এমনকি অপরিপক্ক আলিমরাও।

তাদের এসব কার্যকলাপের কিছু নমুনা নিম্নে সূত্রসহ প্রমাণ হিসাবে তুলে ধরছি।

১. মূল গ্রন্থগুলোর 'সঠিককরণ' প্রক্রিয়ার প্রমাণ: তারা অতীতের মুসলিম মহাত্মন লেখক-গবেষকদের মূল কিতাবে কৌশলে 'জালকরণ' প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছে। অপছন্দনীয় শব্দাবলী বা এমনকি পুরো প্যারাগ্রাফ তুলে দেওয়া হয়েছে। ইমাম নববী ও ইবনে আবিদীনের কিতাবাদি, তাফসীরে জালালাইন, তাফসীরে সাওয়ী এবং আবদুল্লাহ ইউসুফ আলীর তাফসীর পুনঃমুদ্রণ করেছে রদবদল এনে। নিম্নে কিছু প্রমাণ তুলে ধরছি।

ক. তাফসীরে জালালাইন শরীফের হাশিয়ায় রদবদল: আমাদের মাদ্রাসাসমূহে জালালাইন শরীফ পাড়নো হয়। দুই 'জালাল' এই গুরুত্বপূর্ণ তাফসীর গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এরা হলেন হযরত জালালুদ্দীন মাহাল্লী (মৃ: ৮৬৪ হি.) এবং তাঁর ছাত্র হযরত জালালুদ্দীন সুয়ূতী (মৃ: ৯১১ হি.) রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা। জালালাইন শরীফের একখানা গুরুত্বপূর্ণ হাশিয়া রচনা করেন প্রখ্যাত মালিকী শায়খ হযরত আহমদ সাওয়ী (১২৪১ হি.) রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। এই গ্রন্থের নাম, 'হাশিয়া আস-সাওয়ী 'আলাল জালালাইন'।

হযরত সাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিম্নোক্ত সূরা ফাতিরের ৬ নং আয়াতের উদ্ধৃতি ও জালালাইন শরীফের ব্যাখ্যা তুলে ধরেন:

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ

-"শয়তান তোমাদের শত্রু; অতএব তাকে শত্রু রূপেই গ্রহণ কর। নিশ্চয় সে তার দলবলকে আহ্বান করে যেন তারা জাহান্নামী হয়।"। [সূরা ফাতির : ৬]

জালালাইন শরীফের ব্যাখ্যা:

{ إِنَّ الشيطان لَكُمْ عَدُوٌّ فاتخذوه عَدُوّاً } بطاعة الله ولا تطيعوه { إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ } أتباعه فى الكفر { لِيَكُونُواْ مِنْ أصحاب السعير } النار الشديدة .

অর্থাৎ: "[শয়তান তোমাদের শত্রু; অতএব তাকে শত্রু রূপেই গ্রহণ কর] আল্লাহর আনুগত্যের দ্বারা, আর তার আনুগ্য করো না। [নিশ্চয় সে তার দলবলকে আহ্বান করে] কুফরে তার অনুসরণ করতে [আহ্বান করে], [যেন তারা জাহান্নামী হয়] ভয়ঙ্কর আগুনের বাসিন্দা।"

এরপর তিনি নিজের মন্তব্য দিয়েছেন:

الزمان إلى آخره، فله المغفرة والأجر الكبير. قوله: (ونزل في أبي جهل وغيره) أي من مشركي مكة، كالعاص بن وائل، والأسود بن المطلب، وعقبة بن أبي معيط وأضرابهم، ويؤيد هذا القول آيات منها: ﴿ليس عليك هداهم﴾. ومنها: ﴿ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر﴾. ومنها: ﴿فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً﴾ وغير ذلك. ففي هذه الآيات تسلية له ﷺ على كفر قومه، وقيل: هذه الآية نزلت في الخوارج الذين يحرفون تأويل الكتاب والسنة، ويستحلون بذلك دماء المسلمين وأموالهم، لما هو مشاهد الآن في نظائرهم وهم فرقة بأرض الحجاز يقال لهم الوهابية يحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون، استحوذ عليهم الشيطان، فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، نسأل الله الكريم أن يقطع دابرهم. وقيل: نزلت في اليهود والنصارى. وقيل: نزلت في الشيطان، حيث زين له أنه العابد التقى، وآدم العاصى، فخالف ربه لاعتقاده أنه على شيء.

(উপরের ছবিতে হাইলাইট অংশের - বঙ্গানুবাদ) "বলা হয়েছে, এই আয়াতটি নাজিল হয়েছে খারিজী সম্প্রদায় সম্পর্কে [তাদের আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী হিসাবে], যারা কুরআন ও সুন্নার ব্যাখ্যায় পবির্তন এনেছিল। আর এরই ভিত্তিতে তারা ঘোষণা দেয়, মুসলমানদেরকে হত্যা ও তাদের জানমাল লুটপাট বৈধ। একই অবস্থা তাদের আধুনিক উত্তরসূরীদের মধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে [মনে রাখা দরকার, সাওয়ী যখন এই ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণয়ন করেন তখন ওয়াহাবীরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতপন্থী সুন্নী মুসলমানের উপর হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছিলো। গ্রন্থটি প্রকাশ পায় ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে]। এরা হলো হিজাজে আবির্ভাব হওয়া 'ওয়াহাবী' ফিরকা। তারা ভাবে 'তারা একটা কিছু করছে', বাস্তবে এরা মিথ্যুক। তাদের উপর শয়তানের আধিপত্য বিস্তার করেছে। ফলে তারা আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল হয়েছে। তারাই হলো শয়তানের দল [হিজবুশ-শাইতান], সত্যিই শয়তানের দল। তারাই ক্ষতিগ্রস্ত

দল। [কুরআন: সূরা মুজাদালাহ : ১৮-১৯] আমরা আল্লাহর দরবারে আবদার জানাই, এদেরকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করে দিন।"[৮১]

قوله: ﴿إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ﴾ إلخ بيان لوجه عداوته وتحذير من طاعته. قوله: (هذا) أي قوله: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ إلى آخره، والمعنى من كفر من أول الزمان إلى آخره، فله العذاب الشديد، ومن آمن من أول الزمان إلى آخره، فله المغفرة والأجر الكبير. قوله: (ونزل في أبي جهل وغيره) أي من مشركي مكة، كالعاص بن وائل، والأسود بن المطلب، وعقبة بن أبي معيط وأضرابهم، ويؤيد هذا القول أيات منها: ﴿ليس عليك هداهم﴾. ومنها: ﴿ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر﴾. ومنها: ﴿فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً﴾ وغير ذلك. ففي هذه الآيات تسلية له ﷺ على كفر قومه، وقيل: هذه الآية نزلت في الخوارج الذين يحرفون تأويل الكتاب والسنة، ويستحلون بذلك دماء المسلمين وأموالهم، استحوذ عليهم الشيطان، فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، نسأل الله الكريم أن يقطع دابرهم. وقيل: نزلت في اليهود والنصارى. وقيل: نزلت في الشيطان، حيث زين له أنه العابد التقي، وآدم العاصي، فخالف ربه لاعتقاده أنه على كل شيء.

تم حذف عبارة: (لما هو مشاهد الآن في نظائرهم و هم فرقة بأرض الحجاز يقال لها الوهابية ... الخ) !!

এই কিতাবখানা আশির দশকে 'সালাফি / ওয়াহাবী' কর্তৃকও প্রকাশিত হয়। কিন্তু তাদের সংস্করণে 'জালকরণ' ও 'কর্তন' কাজ সম্পাদিত হয় (উপরের চিত্রটি দেখুন)। গ্রন্থের ৩০৮ পৃষ্ঠার প্রথম লাইন সম্পূর্ণরূপে মুছে দেওয়া হয়, যেখানে লিখা ছিলো 'এরা হলো হিজাজে আবির্ভাব হওয়া 'ওয়াহাবী' ফিরকা'। পরে অপর এক সংস্করণেও অনুরূপ কর্তন কাজ সম্পাদিত হয় মানুষকে এটা বুঝানোর জন্য যে, লেখক ওয়াহাবীদের বিরুদ্ধে কিছু লিখেন নি![৮২]

খ. আবু হাইয়ান আন-নাহয়ী (মৃ: ৭৫৪ হি / ১৩৫৩ ঈ.) রাহ. প্রণিত প্রখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ 'তাফসীর আন-নাহর আল-মাদ্দ' [সুদূর বিস্তৃত নদীর ব্যাখ্যা] এর পরিবর্তন: নূহ হা মীম কেলারের প্রবন্ধে এই প্রখ্যাত কিতাবটির

[৮১]সাওয়ী, হিশায়া আস-সাওয়ী 'আলাল জালালাইন, খ.৩, পৃ:২৫৫; এই অংশ মিশরের কায়রো শহরে ১৯৩০ সালে প্রকাশিত 'ইসা আস-বাবিল হালাবি' সংস্করণ থেকে উদ্ধৃত, নূহ হা মীম কেলারের ইংরেজী প্রবন্ধ 'দ্যা রিফোর্মারস অব ইসলাম, দ্যা মাসউদ কুয়েশ্চন' (মাসউদ.কো.ইউকে) থেকে আমরা বঙ্গানুবাদ করেছি। কিতাবখানা ১৯৩৯ ঈসায়ীতেও কায়রোতে 'মাকতাবাল মাশহাদুল হুসাইনী' সংস্করণ হিসাবে প্রকাশিত হয় [খ.৩, পৃ: ৩০৭-৩০৮]। একই সংস্করণ পরে অফসেটে পুনঃমুদ্রিত হয় বৈরুতের 'দার ইহয়াউল তুরাল 'আরাবী [খ.৩, পৃ: ৩০৮-৩০৮] থেকে ১৯৭০ সালে।

[৮২]সালাফী নিয়ন্ত্রিত দার-আল ফিক্র, 'হিশায়া আস-সাওয়ী 'আলাল জালালাইন' খ.৩. পৃ: ৩৭৯, বৈরুত, ১৯৯৩।

পরিবর্তনের প্রমাণ বিদ্যমান। ইংরেজীতে লেখা প্রবন্ধটি থেকেই আমরা নিম্নোক্ত অনূদিত কথাগুলো তুলে ধরছি পাঠকদের সুবিধার্থে। অবশ্য প্রয়োজনীয় সূত্র ফুটনোটে উল্লেখিত হয়েছে।

গ্রন্থকার কিতাবটি ৮ খণ্ডে সমাপ্ত করেন। উক্ত সংস্করণ হলো সংক্ষিপ্ত। কিতাবের মূল শিরোনাম ছিলো, 'আল-বাহরুল মুহিত'। গ্রন্থটি আরবী ব্যাকরণের উপর ভিত্তি করে রচিত।

আবু হাইয়ান রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জন্ম আন্দালুসিয়ায় (আধুনিক স্পেনে)। পরে তিনি দামেস্কে যেয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তিনি ইবনে তাইমিয়ার সমসাময়িক ছিলেন এবং তার সঙ্গে গভীর সম্পর্ক ছিলো। তিনি তাঁকে একজন উঁচু মাপের মুহাদ্দিস হিসাবে সম্মান করতেন। কিন্তু একদিন হযরত তাজ মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হাক্ব বারিনবারি (মৃ: ৭১৭ হি / ১৩১৭ ঈ.) ইবনে তাইমিয়ার স্বহস্তে লিখিত কিতাব, 'কিতাবুল আরশ' যখন তার নিকট দিলেন তখন ইবনে তাইমিয়ার প্রতি সম্মানবোধ একেবারে মুছে যায়। কারণ এই কিতাবে ইবনে তাইমিয়ার আল্লাহর যাত সম্পর্কে 'মানবিক গুণাবলীর মতো' আক্বীদা ফুটে ওঠে। ইবনে তাইমিয়ার এরূপ ভ্রান্তি দেখে তিনি তার সম্পর্কচ্ছেদই করেন নি, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাকে অভিশপ্ত হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। এ ব্যাপারটি প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হাফিজ তক্বীউদ্দীন সুবকী তাঁর প্রণীত 'আস-সাইফুস্ সাক্বিব' [পৃ: ৮৫] গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

হযরত আবু হাইয়ান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর তাফসীর গ্রন্থে সূরা বাক্বারার ২৫৮ নং আয়াতের (আয়াতুল কুরসীর) ব্যাখ্য করতে যেয়ে তাঁর মনে পরিবর্তন এসে যায় বলে উল্লেখ করেন। তিনি লিখেছেন: "আমি আহমদ ইবনে তাইমিয়ার সমসাময়িক। আমি তার স্বহস্তে লিখিত কিতাব যার নামকরণ তিনি করেছেন 'কিতাবুল আরশ' পাঠ করেছি, "আল্লাহ তা'আলা কুরসীর উপর বসে (ইয়াজলিসু) আছেন, কিন্তু এর একাংশ শূন্য রেখেছেন যাতেকরে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এসে বসতে পারেন।"

হযরত তাজ মুহাম্মদ বারিনবারি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইবনে তাইমিয়াকে বোকা বানানোর জন্য তার একান্ত ভক্ত হওয়ার ভান করেন। তিনি এভাবে উক্ত 'কিতাবুল আরশ' গ্রন্থখানা সংগ্রহ করতে সক্ষম হন। আর এটাই

আমরা তার এই কিবাতে পাঠ করলাম।" [আন-নাহয়ী, 'তাফসীর আন-নাহর আল-মাদ্দ', খ.১, পৃ: ২৫৪]।

ইসলামের একজন বিখ্যাত গবেষকের কলমে এই ঘটনাটি লিখিত থাকায় এটাই প্রমাণিত হলো যে, তাওহীদ তথা আল্লাহর যাত সম্পর্কে ইবনে তাইমিয়ার 'ডবল আক্বীদা' ছিলো। একটি সর্বসাধারণের জন্য আর অপরটি তার চতুর্দিকের একান্ত আপনজন ও ছাত্রদের জন্য।

পরবর্তীতে অবশ্য 'সালাফি' নিয়ন্ত্রিত একটি মিশরী প্রেস থেকে আবু হাইয়ানের 'আল-বাহরুল মুহিত' এর নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। তবে এ সংস্করণে উক্ত কথাগুলো সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলা হয়েছে![৮৩]

পরবর্তীতে মুহাম্মদ জাহিদ কাওসারীর নিকট অবশ্য দোষিরা এই কর্তনকরণ স্বীকার করেছে। কাওসারী সাহেব তাঁর রচিত 'আস-সাইফুস্ সাক্বিল' গ্রন্থের ফুটনোটে উক্ত কথাগুলো তুলে ধরে মন্তব্য করেন: "এই কথাগুলো আল-বাহরুল মুহিত গ্রন্থের প্রিন্ট সংস্করণে নেই। এটির সম্পাদক আমাকে জানান, তিনি এই কথাগুলো এতোই ঘৃণিত বলে মনে করেছেন যে, এগুলো কোনো মুসলামানের লেখা হিসাবে দাবী করা অন্যায় হবে। সুতরাং তিনি তা মুছে ফেলেন, যাতেকরে ধর্মান্ধরা এগুলোকে কাজে না লাগায়। এই কথাগুলো এখানে রেকর্ড হিসাবে সম্পৃক্ত করার জন্য তিনিই আমাকে অনুরোধ জানিয়েছেন। এর ফলে মুসলমানদের জন্য হয়তো এটা নসিহত হতে পারে।[৮৪]

হযরত আবু হাইয়ানের তাফসীর গ্রন্থ 'তাফসীর আন-নাহার আল-মাদ্দ' নামকরণে সালাফিরা বৈরুতের দারুল ফিক্র প্রকাশনা থেকে ১৯৮৩ সালে প্রকাশ করে। অবশ্য উপরোক্ত প্যারাগুলো এ সংস্করণেও অনুপস্থিত ছিল।

তবে সত্যের সৈনিকরা এখনও জীবিত আছেন। বৈরুতের দারুল জাহান এবং মুয়াস্সালাল কুতুবুল তাহাক্বাফিয়া তাফসীর গ্রন্থের মূল পাণ্ডুলিপি হুবহু ছাপিয়ে প্রকাশ করেছে ১৯৮৭ সালে। আল্লাহ তাদেরকে উত্তম জাযা দিন।

গ. কুরআন শরীফের আয়াতের অনুবাদে পরিবর্তন: ১. মুহসিন খান ও হিলালি নামক দু'জন সালাফি পবিত্র কুরআন শরীফের ইংরেজী অনুবাদ

[৮৩]আল-বাহরুল মুহিত, মাকতাবা আস-সা'দা, ১৯১০।

[৮৪]জাহিদ কাওসারী, 'আস-সাইফুস সাক্বিল', পৃ: ৮৫।

করেছেন। দেখুন, কুরআনের সূরা বনী ইসরাঈলের ৮৫ নাম্বার আয়াতের অনুবাদে তারা কিভাবে 'বানানো' কথা সংযুক্ত করে মূল কথার অর্থ বাদ দিয়েছেন। (প্রথমে মূল মুত্ন):

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

তাদের অনুবাদ: And they ask you (O Muhammad SAW) concerning the Rûh (the Spirit); Say: "The Rûh (the Spirit): it is ***"one of the things, the knowledge of which is only with my Lord''.*** And of knowledge, you (mankind) have been given only a little."

তাদের অনুবাদের অর্থ: "এবং তারা তোমাকে (হে মুহাম্মদ সা.) রূহ (আত্মা) সম্পর্কে প্রশ্ন করে; বলুন, "রূহ (আত্মা): এটা ***এমন একটি জিনিস, যার সম্পর্কে জ্ঞান একমাত্র আমার প্রভুর আছে***। এবং এর জ্ঞান, তোমাদেরকে [মানবজাতিকে] অল্পই দান করা হয়েছে।" এটা হলো খান ও হিলালির অনুবাদ। অথচ সত্যিকার অনুবাদটি হবে:

"And they ask you about the soul. Say: ***The soul is something from the command of my Lord***, and you are not given from the knowledge but a little." [Translation: Mufti Taqi Usmani]

অর্থাৎ: "তারা আপনাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, বলে দিন: রূহ আমার **পালনকর্তার আদেশ ঘটিত**। এ বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে।"

দেখুন কিভাবে উক্ত অনুবাদে 'আম্‌রি রাব্বী' শব্দদ্বয়কে '***একটি জিনিস***' বলা হয়েছে। রূহ মূলত 'পালনকর্তার আদেশ ঘটিত' এ আক্বীদায় তারা বিশ্বাসী নয়।

ঘ. পবিত্র কুরআন শরীফে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

খান ও হিলালির অনুবাদ: He is the First (nothing is before Him) and the Last (nothing is after Him), ***the Most High*** (nothing is above

Him) and the ***Most Near*** (nothing is nearer than Him). And He is the All-Knower of every thing.

তাদের অনুবাদের অর্থ: "তিনি প্রথম (তাঁর পূর্বে কিছুই নেই) এবং শেষ (তাঁর পরে কিছুই নেই), ***সর্বাপেক্ষা ঊর্ধ্বে*** (তাঁর উপরে কিছু নেই) এবং ***সর্বাধিক নিকটে*** (তাঁর চেয়ে নিকটে কিছু নেই)। এবং তিনি সবকিছুর উপর সর্বজ্ঞাত।"

অথচ সত্যিকার অনুবাদটি হলো:

He is the First and the Last, and the ***Manifest and the Hidden***, and He is All-Knowing about every thing. [Translation: Mufti Taqi Usmani]

-"তিনিই প্রথম এবং তিনিই শেষ, ***প্রকাশ্য ও গুপ্ত*** এবং তিনি সবকিছু সম্পর্কে সর্বজ্ঞাত।"। [সূরা হাদীদ : ৩]

লক্ষ্য করুন, তারা 'জাহির' ও 'বাতিন' শব্দদ্বয়ের অনুবাদ কিভাবে 'জাল' করেছেন। প্রথম শব্দের অর্থ হলো প্রকাশ্য, বাইরে, ইত্যাদি [ইংরেজীতে, Evident, outward, outside ect.]। দ্বিতীয় শব্দের অর্থ হলো গুপ্ত, গোপনীয়, অভ্যন্তরে, অভ্যন্তরের দিকে ইত্যাদি [ইংরেজীতে, immanent, inside, inward etc]। তিনি যে প্রকাশ্য ও গুপ্ত এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে সন্দেহ আছে বলে প্রতীয়মান হয়। খান ও হিলালির অনুবাদে আরো অনেক 'জাল' কথা আছে। এখানে উপরোক্ত দু'টিই প্রমাণ হিসাবে যথেষ্ট মনে করছি।

৬. হাদিস শরীফের অনুবাদে পরিবর্তন: সালাফি খান ও হিলালি পবিত্র কুরআনের অনুবাদেই শুধু পবিবর্তন আনেন নি। হাদিস শরীফের ক্ষেত্রেও তারা অনুরূপ ক্ষমার অযোগ্য কাজ করেছেন। দেখুন মুহসিন খানের নিম্নোক্ত অনুবাদটি।

১. বুখারী শরীফের দ্বিতীয় খণ্ড, কিতাব ১৭, হাদিস নং ১২২ এর মূল মুত্ন:

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَتَمَثَّلُ بِشِعْرِ أَبِي طَالِبٍ وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ

وَقَالَ عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ رُبَّمَا ذَكَرْتُ قَوْلَ الشَّاعِرِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى وَجْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَسْقِي فَمَا يَنْزِلُ حَتَّى يَجِيشَ كُلُّ مِيزَابٍ وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي طَالِبٍ

মুহসিন খানের অনুবাদ: Narrated 'Abdullah bin Dinar: My father said, "I heard Ibn 'Umar reciting the poetic verses of Abu Talib: ***And a white (person) (i.e. the Prophet) who is requested to pray for rain*** and who takes care of the orphans and is the guardian of widows." Salim's father (Ibn 'Umar) said, "The following poetic verse occurred to my mind while I was looking at the face of the Prophet (p.b.u.h) while he was praying for rain. He did not get down till the rain water flowed profusely from every roof-gutter: ***And a white (person) who is requested to pray for rain*** and who takes care of the orphans and is the guardian of widows . . . And these were the words of Abu Talib."

খানের অনুবাদের অর্থ: আবদুল্লাহ বিন দীনার থেকে বর্ণিত: আমার পিতা বলেন, "আমি শুনলাম ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু আবু তালিবের কবিতার পংক্তি আবৃত্তি করছেন: ***এবং একজন সাদা (ব্যক্তি) (অর্থাৎ নবী সা.) যাকে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনার অনুরোধ করা হয়েছে*** এবং যিনি ইয়াতিমদের সেবা করেন ও বিধবাদের রক্ষক।" সালিমের পিতা (ইবনে উমর) বলেন, "এই কবিতার পংক্তিটি আমার মনে জাগ্রত হলো যখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক মুখপানে তাকাচ্ছিলাম, তখন তিনি বৃষ্টির জন্য দু'আ করছিলেন। তিনি বসেন নি যতক্ষণ না পর্যন্ত প্রত্যেক ছাদ থেকে বৃষ্টির পানি অঝোর দ্বারায় পড়ছিলো: ***এবং একজন সাদা (ব্যক্তি) যাকে বৃষ্টির জন্য দু'আর আবেদন করা হয়েছিল*** এবং যিনি ইয়াতিমদের সেবা করেন ও বিধবাদের রক্ষক ... এবং এগুলো ছিলো আবু তালিবের কথা।"

আরবী وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ বাক্যাংশের অনুবাদে মুহসিন খান উপরোক্ত (*ইটালিক*) অনুবাদ করেছেন। অথচ এই বাক্যাংশের সঠিক ইংরেজী অনুবাদ হলো: A fair-skinned one by whose face (''Bi Wajihi''), rain clouds are sought - যার অর্থ: "উজ্জ্বল গায়ের রংবিশিষ্ট ব্যক্তি যার মুখাবয়বের মাধ্যমে মেঘবৃষ্টির কামনা করা হয়।" অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াসিলা নিয়ে বৃষ্টির কমনা করা হয়। নিশ্চয় সালাফি ও তাদের স্কলাররা যে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের ওয়াসিলা নিয়ে আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়ার ঘোর বিরোধী তা এই 'জালকরণ' প্রবণতা থেকে স্পষ্ট হচ্ছে।

চ. ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কথার পরিবর্তন: গায়র মুক্বাল্লিদ সালাফি স্কলাররা কিভাবে আমাদের মহান পূর্বসুরী ইমামদের কথার পরিবর্তন করেছে তা এবার একটি উদাহরণ দ্বারা তুলে ধরছি। আমাদের মতে এরূপ 'জালকরণ' সর্বাধিক মারাত্মক। এর দ্বারা মূল লেখকের প্রতি ক্ষমার অযোগ্য বে-আদবী ও অসম্মান দেখানো হয়। এরূপ কাজ খুব পাপের বলেও আমরা মনে করি।

ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির 'আল-আজকারুন নববীয়া' কিতাবে বর্ণিত একটি অংশ:

فصل فى زيارة قبر رسول الله وأذكارها

اعلم أنّه ينبغى لكلّ من حجّ أن يتوجّه إلى زيارة رسول الله سواء أكان ذلك فى طريقه أم لم يكن فانّ زيارته من أهمّ القربات وأربح المساعى وأفضل الطلبات فإذا توجّه للزيارة أكثَرَ من الصلاة عليه فى طريقه فإذا وقع بصره على أشجار المدينة وقُراها وما يعرّف بها زاد من الصلاة والتسليم عليه وسأل الله تعالى أن ينفعه بزيارته وأن يسعده بها فى الدارين.

وليقل: اللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيَّ أَبْوابَ رَحْمَتِكَ وَارْزُقْنِى فى زيارة قَبْرِ نَبِيِّك ما رَزَقْتَهُ أولِياءَكَ وَأَهْلِ طاعَتِكَ وَاْغْفِر لى وَارْحَمْنِى يا خَيْرَ مَسْؤول.

(বঙ্গানুবাদ): "অনুচ্ছেদ: নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর এবং সেখানে আল্লাহর জিকির প্রসঙ্গ':

জেনে রাখুন, যারাই হজ্জ পালন করবেন, তাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিয়ারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা প্রয়োজন, এটা কারো যাত্রাপথে থাকুক বা না থাকুক, কারণ তাঁকে জিয়ারত করা ইবাদতের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ চেষ্টা দ্বারা সর্বাধিক নেকী লাভ হয়, এবং এটা লাভ করা সর্বোত্তম কাজ।

যখন কেউ জিয়ারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে, তাঁর (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) উপর বেশী বেশী দরূদ ও সালাত পাঠ করা উচিৎ। আর যখন কারো চোখ মদীনার গাছপালা, এর পবিত্র ভূমি ও এর দৃশ্যমান বস্তুর উপর পতিত হবে, তখন দরূদ ও সালাতের মাত্রা বাড়ানো উচিৎ। আল্লাহ তা'আলার নিকট আবদার করা যে, তাঁকে জিয়ারতের মাধ্যমে তিনি যেনো উত্তম প্রতিদান দেন। ... এভাবে আবেদন করা উচিৎ 'হে আল্লাহ! আমার জন্য আপনার রহমতের দরোজা খুলে দিন এবং আপনার রাসূলের কবর মুবারক জিয়ারতের ওয়াসিলায় আমাকে দান করুন যা কিছু আপনি দান করেছেন আপনার ওলিদেরকে, যারা আপনার বাধ্য। আমাকে মাফ করুন ও আমার প্রতি রহম করুন ...।"[৮৫]

সালাফিদের 'জালকরণ':

فصل فى زيارة مسجد رسول الله

اعلم انّه يُستحب لمن أراد زيارة مسجد رسول الله ..... أن يكثر من الصلاة عليه فى طريقه فإذا وقع بصره على أشجار المدينة وحرمها وما يعرّف

[৮৫]আল-আজকারুন নববীয়া, পৃ: ২৮৩-৮৪।

بها زاد من الصلاة والتسليم عليه وسأل الله تعالى أن ينفعه بزيارته لمسجده وأن يُسعده بها فى الدارين وليقل:

اللّٰهمّ افتَحْ عَلَيَّ أَبْواب رَحْمَتِكَ وَارزُقْني فِي زيارَةِ مَسْجِدِ نبيّك ما رَزَقْته أولياءك وَ أهل طاعَتِكَ واغفر لى وَارحَمْني يا خَيرَ مَسْؤول.

(বঙ্গানুবাদ): "অনুচ্ছেদ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের *মসজিদ জিয়ারত [বাকী অংশ তুলে নেওয়া হয়েছে]*"

জেনে রাখুন এটা ***বারণীয়***, যারা ***চায় যাওয়ার পথে মসজিদে নববী*** জিয়ারত করতে [***কর্তিতাংশ এখানে***] তাঁর উপর দরূদ ও সালাত বেশী পাঠের উদ্দেশ্যে। ... . আল্লাহ তা'আলার প্রতি আবদার করা যে, ***তাঁর মসজিদ*** জিয়ারতের ওয়াসিলায় ...। ... হে আল্লাহ! আমার জন্য আপনার রহমতের দরোজা খুলে দিন এবং ***আপনার রাসূলের মসজিদ জিয়ারতের*** ওয়াসিলায় আমাকে দান করুন যা কিছু আপনি দান করেছেন আপনার ওলিদেরকে, যারা আপনার বাধ্য। আমাকে মাফ করুন ও আমার প্রতি রহম করুন ...।"[৮৬]

এছাড়া রিয়াদ, সৌদি আরবের দারুল হুদা কর্তৃক প্রকাশিত এই গ্রন্থে একই অংশ 'জাল' করে লেখা হয়েছে, তাদের ইমাম ইবনে তাইমিয়ার মতামতের সমর্থনে, যিনি ফাতওয়া দিয়েছেন: 'নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজায়ে আতহার জিয়ারতের নিয়তে ভ্রমণ করা না জায়েয।'

সালাফিরা প্রতিনিয়ত কুরআন শরীফের প্রখ্যাত তাফসীরগ্রন্থসমূহ, হাদিস শরীফ, আমাদের পূর্বসুরী মহাত্মনদের কিতাবাদি, ফিকহের মূল কিতাব ইত্যাদির এক এ একাধিক অংশ 'জাল' করে বদলাচ্ছে। এর উপর আলাদা বিরাট গ্রন্থ রচনা করলেও সকল 'জালকরণ' এর প্রমাণ দেওয়া যাবে না। উপরে লিখিত তাদের এই ঘৃণ্য কর্মের ক'টি প্রমাণই যথেষ্ট বলে আমরা মনে করছি।

[৮৬]আজ-জিকির, পৃ: ২৯৫

৮. *সালাফিরা ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে অনুসরণকৃত 'তাযকিয়ায়ে নফস' তথা আত্মশুদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ পন্থা 'তাসাওউফ' মোটেই বিশ্বাস করেন না। তারা এর ঘোর বিরোধী।*[৮৭]

তাদের এই ভ্রান্তির খণ্ডন: সুফীতত্ত্ব বা পীর-মুরীদির উপর বিস্তারিত আলোচনা এখানে আদৌ সম্ভব নয়। তবে প্রথমেই সালাফিরা যাদেরকে 'ইমাম' বানিয়েছে তাঁরাও যে সুফিতত্ত্বের উপর বিশ্বাসী ছিলেন এবং স্বয়ং নিজেরাও সুফি ছিলেন তার প্রমাণ তুলে ধরছি।

সালাফিরা যাদেরকে ইমাম মনে করে তাদের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরা হলেন: ইবনে তাইমিয়া, ইবনে কাইয়্যিম ও ইবনে রাজব রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম। এরা সবাই সুফিতত্ত্বের উপর বিশ্বাসী ছিলেন। যদিও কোনো কোনো সুফির উপর তারা সমালোচনা করেছেন। তাঁরা যে সুফিতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন তার প্রমাণ নিম্নে তুলে ধরছি।

১. আহমদ ইবনে তাইমিয়া: তিনি 'মাসআলাত তাবরিযিয়া ইবনে তইমিয়া' গ্রন্থে ঘোষণা দিয়েছেন:

لبست الخرقة المباركة للشيخ عبد القادر وبيني وبينه إثنان

-অর্থাৎ "আমি শায়খ আবদুল কাদির জিলানী (রা.) এর খিরক্বা পরিধান করেছি। তিনি ও আমার মধ্যখানে দু'জন শায়খ আছেন।"[৮৮]

ইবনে তাইমিয়া ও আবদুল কাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মধ্যবর্তী দু'জন শায়খ কারা ছিলেন তা সনাক্ত করা হয়েছে। তাঁরা হলেন: হযরত ইবনে আবি উমর ইবনে কুদামা (মৃ. ৬৮২ হি.) এবং মুয়াফ্‌ফাক উদ্দীন ইবনে কুদামা (মৃ. ৬২০ হি.)।

২. ইবনুল কাইয়্যিম তাঁর একটি কবিতায় বলেন: (অনুবাদ) "আহলে হাদিসের সকল এবং ফাতওয়ার ইমামগণ সবাই সুফি।"[৮৯]

[৮৭] বিন বাযের ছাত্র আবদুর রহমান আবদুল খালিক্ব কুয়েতি প্রণীত 'ফাদা'ইহ আস-সুফিয়া' গ্রন্থ দ্রঃ।

[৮৮] এম. দামাস্কাস, জাহিরিয়া, ১১৮৬ হি.। এছাড়া জামালুদ্দীন তালিয়ানী তাঁর 'তারগিবুল মুতাহাব্বিন ফী লাবস খাইরাতিল মুতামাইয়্যিযীন' গ্রন্থে এ কথার উল্লেখ করেছেন- ডাবলিনের ফলিও ৬৭এ-তে পাণ্ডুলিপি চেস্টার বিটি ৩২৯৬ (বি) হিসাবে সংরক্ষিত আছে।

উপরে বর্ণিত কাদিরীয়া সিলসিলা অনুযায়ী ইবনে কাইয়্যিম (মৃ. ৭৫১ হি.) হলেন ইবনে তাইমিয়ার ছাত্র ও পরবর্তী শায়খ এবং ইবনে রাজব হাম্বলী [মৃ. ৭৯৫ হি.] এর পরবর্তী শায়খ। সুতরাং সালাফিরা সুফিতত্ত্ব ও সুফিদের উপর বিশ্বাস করুক বা না করুক, তাদের ইমামগণ সুফি ছিলেন তার সুস্পষ্ট প্রমাণ মিললো। এখন ইমামের অনুসরণও যদি তারা এক ক্ষেত্রে মানে আর অপরটিতে মানে না তাহলে তারা ইমামদের উপর কতটুকু আস্থাশীল তা ভাবার ব্যাপার।

পাঠকরা নিশ্চয় অনুধবান করতে পারছেন, কোন্ কারণে আজকের গায়র মুক্বাল্লিদদের মধ্যে চল্লিশেরও বেশী উপদলের জন্ম নিয়েছে? এরা তো তাক্বলিদ ছেড়ে সাধারণ থেকে আলিম পর্যায়ের সবাই মুজতাহিদ হয়ে বসে আছে! সুতরাং যে যেভাবে ইচ্ছে দ্বীন পালনে অভ্যস্ত হয়েছে। যারতার আমলের দলিল হিসাবে কুরআন-হাদিসের (তা অনূদিতই হোক) উদ্ধৃতি দিচ্ছে। তাক্বলিদ ও মাজহাব না মানার সর্বাধিক মারাত্মক কুফল এটাই। মানুষ দ্বীনকে নিজের নফসের চাহিদামাফিক পালন করে। শত শত এমনকি হাজার হাজার মুজতাহিদের আবির্ভাব ঘটিয়ে পুরো দ্বীনের মধ্যে অরাজকতার সৃষ্টি করে। নাউযুবিল্লাহ! গায়র মুকাল্লিদদের ফিতনা কতো মারাত্মক ও আত্মঘাতী তা একবার ভেবে দেখুন।

এবার সুফিতত্ত্বের প্রমাণের প্রসঙ্গে আসা যাক। বাস্তবে আমাদের নিকট প্রমাণ আছে প্রাথমিক চার যুগের আইম্মায়ে মুজতাহিদীনসহ 'সকল' বিখ্যাত উলামায়ে কিরাম সুফিতত্ত্বে শুধু বিশ্বাসী ছিলেন না, নিজেরা স্ব-স্ব শায়খ থেকে ইজাযতপ্রাপ্ত সুফি ছিলেন। অর্থাৎ সত্যিকার সালফে সালিহীনদের সকলেই তাসাওউফচর্চা করেছেন।[৯০] এরা সবাই কি পথভ্রষ্ট ছিলেন? [নাউযুবিল্লাহ] অথচ আজকের ফিতনার যুগের ফিতনাবাজরা 'ইসলামের ক্বলব' হিসাবে খ্যাত 'তাযকিয়ায়ে নফস' সাধনের রাস্তা সুফিতত্ত্ব ও তাসাওউফকে ভ্রান্ত বলছে! তাসাওউফ শুধু হাক্বিক্বাতের রাস্তা নয়, এটাই একমাত্র রাস্তা যার মাধ্যমে আল্লাহর প্রিয়জন তথা ওলি হওয়া যায়। আমরা এ ব্যাপারে প্রামাণ্য তথ্যাদি এক্ষুণি তুলে ধরছি।

---

[৮৯]ইবনে কাইউম, আন-নুনিয়্যা।
[৯০]বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, মাওলানা কবির আহমদ খান ও ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী প্রণীত বাংলা প্রামাণ্যগ্রন্থ 'সালফে সালিহীন ও ইলমে তাসাওউফ' গ্রন্থটি।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা দিয়েছেন:

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ‎ إِلَّا مَنْ أَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

-"যে দিবসে ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি কোন উপকারে আসবে না; কিন্তু যে ***সুস্থ অন্তর*** [ক্বালবিন সালিম] নিয়ে আল্লাহর কাছে আসবে।" [সূরা শু'আরা : ৮৮-৮৯]

হাদিস শরীফে আছে:

حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا

-"... সেই পর্যন্ত, যখন কোনো আলিম [অর্থাৎ দ্বীনের উপর জ্ঞানবান] থাকবেন না, মানুষ মূর্খদেরকে উস্তাদ হিসাবে গ্রহণ করবে। তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে এবং তারা উত্তর দেবে জ্ঞান ছাড়া। তারা নিজেরাই তো দিগভ্রান্ত সুতরাং অপরকেও পথভ্রষ্ট করবে।" [বুখারী]

ইসলামী শরীয়তের দু'টি দিক আছে: গুপ্ত ও প্রকাশ্য। দ্বিতীয়টির দৃষ্টান্ত হলো বাহ্যিক আমল যেমন, নামায, রোযা, জাকাত, হাজ্জ ইত্যাদি শরীয়ত মুতাবিক পালন। আর প্রথমটির উপমা হলো আন্তরিক আমল যেমন ঈমান, সত্যবাদিতা, ইখলাস, ইহসান, আল্লাহর মা'রিফাত (পরিচিতি) ইত্যাদি। প্রকাশ্য আমলের সঙ্গে সম্পৃক্ত আছে আমাদের দেহ ও এর শক্তি সামর্থ। অপরদিকে গোপন আমলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হলো আমাদের মন-মানসিকতা। সঠিক মন-মানসিকতা অর্জন ও সঠিক নীতি-নৈতিকতা লাভের উপায়ই হলো ইলমে তাসাওউফ। এর সঙ্গে জড়িত আছে জিকির-আজকার ও ধ্যান-মুরাক্বাবার মতো আমল। তবে এই আমল সঠিকভাবে করা ও সঠিক রাখার জন্য প্রয়োজন হয় কামিল শায়খের সুহবত। একা একা অজানা রাস্তায় পাড়ি জমানো খুব শঙ্কার বিষয়। কারণ শয়তান ও আমাদের নফ্স ভুল রাস্তায় নিয়ে জাহান্নামী করতে সদাসক্রিয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই তাই শায়খ-শাগরিদ প্রথার প্রচলন হয়ে আসছে 'তাযকিয়ায়ে নফ্স' লাভের উপায় হিসাবে। এই রাস্তার নামধারী ভণ্ডদের কারণে এটি ইসলামবিরোধী, এটি

শির্‌ক-বিদআত বলা সত্যিই দুঃখজনক। কারণ অল্প লোকের ভণ্ডামী সুফিতত্ত্বের মতো বিরাট একটি হক্ব বিষয়কে অবিশ্বাস করা কিংবা ভ্রান্ত বলে সাব্যস্ত করা যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না। আর এটা যে হক্ব তাতো কুরআন-হাদিসসহ ইসলামী ইতিহাস-ঐতিহ্য দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত।

কুরআন ও হাদিস শরীফ থেকে তাসাওউফের প্রমাণ: বাস্তবে তাসাওউফের প্রমাণাদি এতো বেশী ও শক্তিশালী যে এটা দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা দেওয়া যায়: "তাসাওউফ বা সুফিতত্ত্ব হলো ইসলাম ধর্মের হৃদয় (ক্বল্‌ব)।" এ কারণে তাযকিয়ায়ে নফ্‌স অর্জন শরীয়তে ফরয বলে গৃহিত হয়েছে।[৯১]

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

-"আপনি বলে দিন: আমার পালনকর্তা কেবলমাত্র অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ..."। [সূরা 'আরাফ : ৩৩]

এই আয়াত দ্বারা বুঝা গেল প্রকাশ্য ও গোপনীয় অশ্লীলতা থেকে মুক্ত থাকতে হবে। এ লক্ষ্যর্জনই হলো তাসাওউফ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। আমাদের হৃদয়ে লুকিয়ে আছে অনেক গোপন বদ-খাসলত। যেমন, অন্ধভাবে ঘৃণা, গর্ব, রাগ, দুশমনি, মুনাফিকী ইত্যাদি। তবে এগুলো থেকে মুক্ত হতে প্রয়োজন হয় বিশেষ পদ্ধতির। আরো প্রয়োজন হয় উপযুক্ত হৃদযন্ত্রের ডাক্তারের। ডাক্তার বা পীরের নির্দেশ মুতাবিক আমল হলো পদ্ধতি বা রাস্তা।

আল্লাহ তা'আলা তাযকিয়ায়ে নফ্‌স অর্জনের জন্য আমাদেরকে আদেশ প্রদান করেছেন। আর এই আদেশ প্রদান করতে যেয়ে তাঁরই সৃষ্ট ৮টি বস্তুর উপর কসম খেয়েছেন।

[৯১]কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রণীত 'তাফসীরে মাযহারী', সূরা তাওবাহর ১২২ নং আয়াতের তাফসীর দ্রঃ। আমরা পবর্তীতে তাঁর ও ইমাম গায্‌যালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উদ্ধৃতি তুলে ধরেছি।

وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

-"শপথ সূর্যের ও তার কিরণের! শপথ চন্দ্রের যখন তা সূর্যের পশ্চাতে আসে! শপথ দিবসের যখন সে সূর্যকে প্রখরভাবে প্রকাশ করে! শপথ রাত্রির যখন সে সূর্যকে আচ্ছাদিত করে! শপথ আকাশের এবং যিনি তা নির্মাণ করেছেন তাঁর! শপথ পৃথিবীর এবং যিনি তা বিস্তৃত করেছেন তাঁর! শপথ প্রাণের এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন তাঁর! অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন! যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয়।" [সূরা শাম্‌স : ১-৯]

শেষোক্ত আয়াতের (আয়াত নং ৯ এর) ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে: "تزكيـة [তাযকিয়াহ] শব্দের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে অভ্যন্তরীণ শুদ্ধতা।"[৯২]

সুতরাং কুরআনের এই নির্দেশ পুরোপুরি মানার নামই তাসাওউফ।

হাদিস শরীফেও তাযকিয়ায়ে নফ্‌স তথা আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব ব্যক্ত হয়েছে। প্রথমে আমরা হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর বর্ণিত হাদিসে জিব্রাঈল নামে খ্যাত সহীহ হাদিসটির একাংশের উদ্ধৃতি অনুবাদসহ তুলে ধরছি।

أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

-" ... আল্লহর ইবাদত এভাবে করা যেনো আপনি তাঁকে দেখছেন, এবং যদি দেখতে না পারেন, তাহলে নিশ্চিত হবেন তিনি আপনাকে দেখছেন।" [বুখারী]

অপর এক হাদিসে আছে:

[৯২] সংক্ষিপ্ত তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন, খ.২, পৃ: ১৪৫৯, অনুবাদ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, মদীনা পাবলিকেশান্স, ঢাকা।

إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ وَلَا إِلَى صُوَرِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ

-"অবশ্যই, আল্লাহ তোমাদের বাহ্যিক আকার ও ধন-সম্পদের দিকে তাকান না, বরং তোমাদের হৃদয়ের দিকে তাকান।" [মুসলিম]

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা আমাদের দুনিয়াবী বাহ্যিক অর্জনের দিকে তাকান না। ধন-সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য, বড়ো বড়ো দালান-অট্টালিকা ইত্যাদির পরওয়া তিনি করেন না, যদিও এ সবকিছুর হিসাব-নিকাশ হবে। কিন্তু তিনি অবশ্যই আমাদের অভ্যন্তরীণ দিকটি বিশেষভাবে দেখে থাকেন। উপরে উদ্ধৃত সূরা শুরার ৮৮-৮৯ আয়াত দু'টি এর প্রমাণ।

মানুষের ক্বলবের রোগ দু' ধরনের: ১. সন্দেহ ও সংশয়। ২. আকাঙ্ক্ষা ও লোভ।

অভ্যন্তরীণ রোগ বাহ্যিক অনেক ভালো আমলকেও ধ্বংস করে দেয়।[৯৩] এই মৌলিক রোগ দু'টোর ঔষধ কী?

হাদিস শরীফে আছে:

لكل شىء صقالة وصقالة القلوب ذكر الله وما من شىء أنجى من عذاب الله من ذكر الله

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "প্রত্যেক জিনিসের পলিশ (রেত) আছে এবং হৃদয়ের পলিশ হচ্ছে জিকরুল্লাহ। আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচার উপায় জিকরুল্লাহ থেকে উত্তম কিছু নেই"। তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, আল্লাহর পথে জিহাদের প্রতিদানও কি অনুরূপ নয়? তিনি জবাব দিলেন: "কেউ যদি (জিহাদ করতে করতে) তার তলোয়ার ভেঙ্গে ফেলে তবুও নয়"।[৯৪]

অপর এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাকিরীন ও গাফিলদের তুলনা করেছেন এভাবে:

---

[৯৩]শায়খ মসীহ উল্লাহ খান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, পরিশুদ্ধির রাস্তবতা, whitethreadpress.com।
[৯৪]কিতাব আদ-দাওয়াত আল-কবীর ও শুয়াব আল ঈমান, ইমাম বায়হাকী; মিশকাত আল-মাসাবিহ, তিরমিযী।

مثل الذى يذكر ربه والذى لا يذكر ربه مثل الحى والميت

অর্থাৎ "আল্লাহর জিকির করে এবং যে জিকির করে না তাদের তুলনা হচ্ছে জীবিত ও মৃত ব্যক্তিদের মতো"। [সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম]

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হলো, আল্লাহর জিকিরকে বুলন্দ করার জন্য কুরআন-হাদিসে বার বার তাগিদ দেওয়া হয়েছে। আর এর মূল কারণ হলো নফসের পরিশুদ্ধি অর্জন, তথা তাযকিয়ায়ে নফস। আর সঠিক যেসব পদ্ধতি অবলম্বনে এ লক্ষ্যার্জন সাধিত হয় ওগুলো হলো ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে প্রতিষ্ঠিত সুফী তরীকাসমূহ। এরূপ নিষ্কলুষ পদ্ধতিকে 'কুফরী', 'বিদআত', 'শেরেকী' ইত্যাদি মনে করা ও বলা সত্যিই নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞতার পরিচায়ক। অথচ আমাদের সম্মানিত আকাবিরে কিরামের সকলেই এই পথের অনুসারী ছিলেন ও আমল করেছেন।

তাযকিয়ায়ে নফ্স তথা তাসাওউফ শরীয়তে ফরয বলে সাব্যস্ত হয়েছে: ইতোমধ্যে আমরা বলেছি, তাসাওউফ শরীয়তে ফরয বলে সাব্যস্ত হয়েছে। এখন এর প্রমাণ তুলে ধরছি। হযরত আল্লাহ ইয়ার খান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 'দালায়িলুস সুলুক' গ্রন্থে তাসাওউফ ফরয হওয়ার দলিল পেশ করেছেন। তিনি হযরত সানাউল্লাহ পানিপথী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির 'তাফসীরে মাযহারী' এবং ইমাম গায্যালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির 'তালিমুল মু'আল্লিমীন' থেকে প্রমাণ হিসাবে উদ্ধৃতি তুলে ধরেছেন। আমাদের নিকট তাফসীরে মাযহারীর বঙ্গানুবাদ আছে বিধায় আমরা সেই উদ্ধৃতিটি সেখান থেকেই দিচ্ছি। পরে ইমাম গায্যালীর উদ্ধৃতি দালাইলুস সুলুক গ্রন্থের একখানা ইংরেজী অনুবাদ থেকে বঙ্গানুবাদ করে লিপিবদ্ধ করবো।

হযরত সানাউল্লাহ পানিপথী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাফসীরে মাযহারীতে কুরআন শরীফের যে আয়াতের ব্যাখ্যায় তাসাওউফ ফরয হওয়ার দলিল পেশ করেছেন তা হলো:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

-"বিশ্বাসিদিগের সকলের অভিযানে বাহির হওয়া সংগত নহে, উহাদিগের প্রত্যেক দলের এক অংশ বহির্গত হউক, অবশিষ্টরা দ্বীন সম্বন্ধে জ্ঞানানুশীলন করুক এবং উহাদিগের সম্প্রদায়ের যাহারা ফিরিয়া আসিবে তাহাদিগকে সতর্ক করুক যাহাতে উহারা সতর্ক হয়।" [সূরা তাওবাহ : ১২২]

আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি এক পর্যায়ে লিখেছেন: (বঙ্গানুবাদ) "সুফিয়ানে কেরামের মাধ্যমে প্রচারিত ইলমে লাদুন্নী বা বাতিনী ইলম অর্জন করাও ফরজে আইন। এই ইলমের মাধ্যমে দু'টি উদ্দেশ্য সাধিত হয়। যেমন ১. আল্লাহ ছাড়া অন্যের আকর্ষণ অন্তর থেকে অপসারিত হয়। মুহুর্মুহু আল্লাহর স্মরণ জাগ্রত থাকে সত্তায়। তাই হিংসা, লোভ, পরশ্রীকাতরতা, অহংকার, যশাকাঙ্ক্ষা, ধর্মীয় বিষয়ে আলস্য ইত্যাদি অসৎ স্বভাব দূর হয়ে যায়। প্রবৃত্তি হয়ে যায় পরিচ্ছন্ন। ২. পাপ থেকে প্রত্যাবর্তনের (তওবার বিষয়টি) হয়ে যায় চিরস্থায়ী। স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা ও অন্যান্য শুভবৃত্তি। নফস্ হয় পবিত্র। আরো লাভ হয় বিশুদ্ধচিত্ততা। এই বিশুদ্ধচিত্ততা (ইখলাস) অর্জিত না হলে নামাজ, রোজা ও অন্যান্য ইবাদতসমূহ হয়ে পড়ে গ্রহণের অযোগ্য। রাসূল স. বলেছেন, আল্লাহ কেবল ওই আমলগুলোকে গ্রহণ করেন, যেগুলো তাঁর সন্তোষ সাধনার্থে কেবল তাঁর উদ্দেশ্যেই সম্পাদিত হয়। হজরত আবু উমামা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন নাসাঈ।"[৯৫]

হযরত ইমাম গায্যালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃ. ৫০৫ হি. / ১১১১ ঈ.) তাঁর 'তা'লিমুল মু'আল্লিমীন' গ্রন্থে বলেন: "ইসলামে অন্যান্য ফরয জ্ঞানার্জনের মতো মা'রিফাতের জ্ঞান লাভও ফরয। এটা অন্তরের অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত। যেমন: আল্লাহর উপর ভরসা (তাওয়াক্কুল), তাঁর প্রতি ভয় (খওফ) এবং তাঁর ইচ্ছার উপর আত্মসমর্পণ (রেযা)।"[৯৬]

হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানবী রাহামতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন: "সুফিতত্ত্বের (অর্থাৎ তাসাওউফের) উপর জ্ঞানার্জন ফরয।"[৯৭]

সুতরাং এ পর্যন্ত আলোচনায় আমরা প্রমাণ করলাম:

[৯৫] তাফসীরে মাযহারী (বঙ্গানুবাদ), অনুবাদক, মাওলানা এ.বি.এম. মাঈনুল ইসলাম, খ.৫, পৃ: ৫৩০।
[৯৬] ইমাম গাযযালী, 'তা'লিমুল মু'আল্লিমীন', পৃ: ২।
[৯৭] 'আত্তাকাশ্শাফ আন-মুহিম্মাতাত্ তাসাওউফ', পৃ: ৭।

১. ইসলামী আধ্যাত্মিকতা অর্থাৎ আত্মশুদ্ধির চেষ্টা-সাধনা কুরআন-হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। এই বিজ্ঞানের নাম ইলমে তাসাওউফ।

২. মহাত্মন উলামা কর্তৃক সাব্যস্ত হয়েছে এই জ্ঞানার্জন সকল মুসলমানের জন্য ফরয।

এবার আমরা ইসলামী আদি যুগ থেকেই মহাত্মন ওলীআল্লাহদের কর্তৃক এই জ্ঞানার্জনের উপায় অবলম্বন ও পদ্ধতি যে সঠিক ও ইসলামী শরীয়তের অনুকূলে, তার প্রমাণ ইতিহাসের আলোকে উপস্থাপন করবো ইনশাআল্লাহ।

ইতিহাস থেকে তাসাওউফের প্রমাণ

আমরা ইতোমধ্যে 'হাদিসে জিব্রাঈল' এর কথা উল্লেখ করেছি। ইসলামী আধ্যাত্মিকতার উপর লিখিত প্রায় সকল গ্রন্থে এই হাদিসখানা উল্লেখিত হয়েছে। এই হাদিসখানার আলোকেই মূলত ঈমানের মূল ভিত্তি গড়ে ওঠেছে। এতে আছে 'ইসলাম', 'ঈমান' ও 'ইহসান' এর সংজ্ঞা। শেষোক্ত বিষয় তথা ইহসানকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিষ্কার ভাষায় সংজ্ঞায়িত করেছেন এই বলে: "আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করবেন যে, আপনি তাঁকে দেখছেন। আর যদি তাঁকে না দেখেন, তাহলে মনে রাখবেন তিনি আপনাকে দেখছেন।"

উক্ত হাদিসের আলোকেই ইসলামী আধ্যাত্মিকতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকেই গড়ে ওঠেছে। পরে বিখ্যাত তাবিঈ হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাসাওউফকে তার সুউচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত করে গিয়েছেন। গুরু-শাগরিদ সম্পর্ক ছাড়া যে, ইসলামী আধ্যাত্মিকতা সঠিক পথে এগুতে পারে না সেটা উপলব্ধি করেই তিনি এই শাস্ত্রকে নিয়মতান্ত্রিকতার আওতায় নিয়ে আসেন। আর এই নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি আজ পর্যন্ত বহাল আছে, বহাল থাকবে রোজ কিয়ামত পর্যন্ত।

উপরোক্ত হাদিসে জিব্রাঈলের উপর শেষের যুগের বিখ্যাত মুহাদ্দিস শাহ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (জন্ম: ৯৫৪ হি. / ১৫৫১ ঈ - মৃ. ১০৫২ হি. / ১৬৪২ ঈ) ইমাম মালিক রাহমাতুল্লহি আলাইহির (মৃ. ১৯৯ হি. / ৮১৪ ঈ) উদ্ধৃতি তুলে ধরেছেন:

“যে কেউ ফিকহের পর্যাপ্ত জ্ঞান [অর্থাৎ শরীয়তের মৌলিক জ্ঞান] ছাড়া তাসাওউফের রাস্তায় পাড়ি জমাবে, সে কুফরীর দিকে পা বাড়ালো। সে পাপী হবে। আর যে কেউ উভয় জ্ঞান অর্জন করলো সে একজন সঠিক ঈমানদার হলো।”

এরপর হযরত আবদুল হক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মন্তব্য করেন:

“শুনুন, ঈমানের ভিত্তি ও এর আমলী স্বাদ লাভ নির্ভর করে ফিক্‌হ, দর্শন ও তাসাওউফের উপর। হাদিসে জিব্রাঈল এই তিনটি বিষয়ের উপরই ইঙ্গিত দেয়: ইসলাম সরাসরি ফিকহের দিকে নির্দেশ করে, কারণ এতেই আছে শরীয়তের আইন-কানুন। শরীয়ত হলো মানবিক সঠিক আমলের নীতিমালা। ঈমান বিশ্বাসের প্রতীক, যা হলো ধর্ম-দর্শনের মূল ভিত্তি। আর ইহসান দ্বারা সত্যিকার তাসাওউফ বুঝাচ্ছে। এর দ্বারা আল্লাহর আনুগত্যের সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়। মহাত্মন সকল সুফি গুরুদের বাক্যাবলী উপদেশ মূলত ইহসানকে ঘিরেই। ... তাসাওউফ এবং ফিক্‌হ একে অন্যের সম্পূরক বিষয়। একটা ছাড়া আরেকটা অর্থহীন। ...”[৯৮]

ইতিহাসের আলোকে তাসাওউফ তথা ‘গুরু-শিষ্যের সম্পর্কের’ আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে ভূমিকার শেষে ভারতের আরেক মহাত্মন মুহাদ্দিস হযরত শাহ আবদুল আজিজ দেহলবী [১৭৪৫- ১৮২৩ ঈ.] রাহমাতুল্লাহি আলাইহির একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরছি। তিনি লিখেছেন:

“সুন্নীরা শরীয়ত ও তরীকাত (ইহসান অর্জনের রাস্তা, তাসাওউফচর্চার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিসমূহ) এর উপর নির্ভরশীল। তারা মনে করেন, এ দু’টি হলো সর্বোচ্চ গুণাবলী অর্জন ও উত্তম চরিত্রিক বৈশিষ্ট্য লাভের একমাত্র উপায়।”[৯৯]

আল্লাহর জমিনে সর্বদাই ওলি-আবদাল থাকবেন: ইতিহাসব্যাপী পৃথিবীর জমিনে ‘আবদাল’ থাকার নিশ্চয়তা কয়েকটি হাদিস শরীফ থেকে জানা যায়।

১. হাদিস শরীফে আছে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন: “প্রত্যেক যুগে আমার অনুসরীদের মধ্যে ৫০০ জন ‘আখইয়ার’ [উত্তম গুণাবলীসম্পন্ন ব্যক্তি) ও চল্লিশ জন ‘আবদাল’ থাকবেন।

[৯৮] ‘তাহফিমাত’, পৃ: ১৩।
[৯৯] দালাইলুস সুলুক, আল্লাহ ইয়ার খান, ইংরেজী পিডিএফ সংস্করণ, পৃ: ১৬।

এই সংখ্যা কখনো কমবে না। এদের মধে একজন মারা গেলে আরেকজন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন ঐশী ইশারায়।”[১০০]

২. হাদিস শরীফে আরো আছে:

الْأَبْدَالُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ ثَلَاثُونَ مِثْلُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّمَا مَاتَ رَجُلٌ أَبْدَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَكَانَهُ رَجُلًا

-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আমার উম্মতের মধ্যে ৩০ জন আবদাল থাকবেন। এদের হৃদয় নবী ইব্রাহীমের মতো। তাদের একজন মারা গেলে আল্লাহ তা’আলা আরেকজনকে তাঁর স্থলবর্তী করে দেন।”[১০১]

৩. আরো একটি হাদিস শরীফের বর্ণনা হলো এই:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا يَزَالُ أَرْبَعُونَ رَجُلا مِنْ أُمَّتِي قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ إِبْرَاهِيمَ يَدْفَعُ اللَّهُ بِهِمْ عَنْ أَهْلِ الأَرْضِ يُقَالُ لَهُمُ الأَبْدَالُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُمْ لَمْ يُدْرِكُوهَا بِصَلاةٍ وَلا بِصَوْمٍ وَلا صَدَقَةٍ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَبِمَ أَدْرَكُوهَا قَالَ:بِالسَّخَاءِ وَالنَّصِيحَةِ لِلْمُسْلِمِينَ

-হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মামউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “আমার উম্মতের মধ্যে চল্লিশ জন মানুষ সব সময় থাকবেন, তাদের অন্তর হবে ইব্রাহীম আলাইহিস্‌সালামের অন্তরের মতো। তাদের ওয়াসিলায় আল্লাহ তা’আলা পৃথিবীর অধিবাসীদেরকে রক্ষা করেন। তাদেরকে বলা হয় আবদাল।” তিনি আরো বলেন, “তারা সালাত, সওম এবং সাদাক্বার দ্বারা এই স্তরে উন্নীত হন নি।” সাবাহাগণ প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহলে তারা কিভাবে এ স্তরে

[১০০] আবু নাইম ইসফাহানী, হিলয়াতুল আউলিয়া গ্রন্থে হাদিসখানার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।
[১০১] মুসনাদে ইমাম আহমদ।

উন্নীত হলেন? তিনি জবাব দেন, “দানশীলতা এবং মুসলমানদের কল্যাণকামিতা দ্বারা।” [তাবারানী]

৪. ইমাম তাবারানী অন্য আরেক হদীসের রিওয়াত করেন:

لَمَّا فُتِحَتْ مِصْرُ سَبُّوا أَهْلَ الشَّامِ فَأَخْرَجَ عَوْفُ بن مَالِكٍ رَأْسَهُ مِنْ تُرْسٍ ثُمَّ قَالَ: يَا أَهْلَ مِصْرَ , أَنَا عَوْفُ بن مَالِكٍ لا تَسُبُّوا أَهْلَ الشَّامِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : "فِيهِمُ الأَبْدَالُ وَبِهِمْ تُنْصَرُونَ وَبِهِمْ تُرْزَقُونَ"

-“মিশর বিজয়ের পর লোকজন শামবাসীদেরকে গালিগালাজ করলো। এসময় হযরত আউফ ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ম থেকে মাথা বের করে বললেন: হে মিশরবাসী! আমি আউফ ইবনে মালিক বলছি। তোমারা শামবাসীদেরকে গালি দেবে না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, এদের মধ্যে ‘আবদাল’ হবেন। তাঁদের ওয়াসিলায় তোমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও রিজিক লাভ করবে।” [তাবারানী : ১৪৫৪৭]

৫. অপর এক হাদিস শরীফে আছে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

علامة أبدال أمتى أنهم لا يلعنون شيئا أبدا

“[আমার অনুসারীদের মধ্যে যারা আবদাল হবেন] তাদের পরিচয় হলো, তারা কখনো কোনকিছু বা কারোর উপর অভিশাপ দেবেন না।”[১০২]

৬. আরেকটি হাদিস শরীফে আছে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “আমার উম্মতদের মধ্যে ৩০ জন আবদাল থাকবেন। পৃথিবীর অস্তিত্ব এদের উপর নির্ভরশীল। তাদের কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে বৃষ্টিপাত ও বিপদ-আপদে সাহায্য আসবে।”[১০৩]

[১০২] ইবনে আবিদ দুনইয়া, আল-আউলিয়া, হা. নং. ৫৯।
[১০৩] তাবারানী।

সালফে সালিহীনের যুগে তাসাওউফচর্চা: নিম্নে আমরা প্রমাণ হিসাবে ইসলামের ইতিহাসে সর্বোত্তম প্রাথমিক তিন যুগে (খাইরুল কুরুনে) যে তাসাওউফচর্চা তথা গুরু-শিষ্য সম্পর্ক বিদ্যমান ছিলো তার কিছু প্রমাণ তুলে ধরছি।

১. আসহাবে কিরামের যুগ: তাসাওউফ চর্চা শুরু হয়েছে সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকেই। কারণ, তাসাওউফ তো ইসলামী আধ্যাত্মিকতার অপর নাম। তবে সে যুগে ‘তাসাওউফ’ নামটি অপরিচিত ছিলো। তাসাওউফ দ্বারা যাকিছু শিক্ষা দেওয়া হয়, একজন মা’রিফাত অন্বেষী সালিক যেসব অভ্যাস দ্বারা নিজের নফসের ইসলাহ সাধনে ব্রত হবেন তা সবগুলোই সেই প্রাথমিক যুগে ছিলো, কিন্তু ছিলো না শুধু ‘তাসাওউফ’ নামটি। অবশ্য শুধু তাসাওউফের বেলায় এ ব্যাপারটি মূখ্য নয়। ইসলামী অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষার জন্মও হয়েছে বেশ পরে। যেমন ‘ইলমে তাফসীর’, ‘ইলমে তাওহিদ’, ‘ইলমে নাহু’, ‘ইলমে কালাম’, ‘ইলমে ফিক্হ’, ‘ইলমে তাজবীদ’, ও ‘ইলমে হাদিস’ ইত্যাদি। তবে এসব বিষয়ের উপর অতীতে গবেষণা কিন্তু হয়েছে। যে তাফসীর সকল তাফসীরের উর্ধ্বে বলে বিবেচিত সেই তাফসীরের মুফাস্সীর ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা। কিন্তু তাঁর যুগে ‘তাফসীরে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস’ নামের কোন কিতাব ছিলো না। তবে তাঁর তাফসীর বা ব্যাখ্যা লিখিত কিতাবে অবশ্যই ছিলো।

তাসাওউফ সম্পর্কে ইতিহাসের জনক নামে খ্যাত ইবনে খালদুন তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ মুকাদ্দীমায় লিখেছেন: (মূল অনুলিপি)

هذا العلم من العلوم الشرعية الحادثة فى الملة. وأصله أن طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم طريقة الحق والهداية و أصلها العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه والانفراد عن الخلق فى الخلوة للعبادة وكان ذلك عاماً فى الصحابة

والسلف. فلما فشا الإقبال على الدنيا فى القرن الثانى وما بعده وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية والمتصوفة

-"এই জ্ঞানটি হচ্ছে পবিত্র আইনের (অর্থাৎ শরীয়তের) একটি শাখা যা উম্মাহ্‌র মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রাথমিকভাবে এটা সাহাবায়ে কেরাম থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তাঁদের অনুসরণকারীদের [তাবিঈদের] মাধ্যমে অন্যরা তা শিক্ষা করেন। এর মূলে আছে ইবাদতের প্রতি আত্মনিয়োগ, মহান আল্লাহর দরবারে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করা, দুনিয়ার চাকচিক্য ও মনভুলানো বিষয়ের প্রতি অনীহা, জাগতিক অনন্দ-ফূর্তি, ধন-সম্পদের লালসা ও যশ-খ্যাতি অর্জন থেকে দূরে থাকা- যা অধিকাংশ মানুষের অভীষ্ট লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে এবং নির্জনতা অবলম্বন- যাতেকরে একাগ্রচিত্তে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকা যায়। এসব বিষয় ছিলো সকল সাহাবায়ে কেরাম ও আগেকার যুগের মুসলমানদের নিত্যদিনের অভ্যাস। কিন্তু ইসলামের দ্বিতীয় শতাব্দির পর থেকে যখন মানুষ বেশী বেশী করে দুনিয়াবী কর্মকাণ্ডে নিজেদেরকে আত্মনিয়োগ করতে শুরু করলো, তখন যারা সাহাবায়ে কেরাম ও আগের যুগের মহাত্মনদের অনুসারী ছিলেন তাঁদেরকে মানুষ 'সূফী' বা তাসাওউফপন্থী বলে সম্বোধন করতে লাগলো।[১০৪]

তাসাওউফচর্চার এই প্রথম যুগে সকল সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুম ছিলেন শিষ্য এবং স্বয়ং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন তাঁদের গুরু।

বাইআত: বাইআত বা অঙ্গীকার গ্রহণ সুফি রাস্তায় পাড়ি জমানোর প্রথম পদক্ষেপ। একজন কামিল ওলির হাতে বাইআত গ্রহণের মাধ্যমে মুরীদ হয়ে নিজের আমল-আখলাক পরিশুদ্ধ ও ইহসান অর্জনের সাধনায় লেগে যেতে হবে। বাইআত গ্রহণ শুধু বৈধ নয়- একটি উত্তম আমল। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের পবিত্র হাতে ধরে সাহাবায়ে কিরাম একাধিকবার বাইআত গ্রহণ করেছেন। কুরআন ও হাদিস শরীফে এর প্রমাণ বিদ্যমান।

[১০৪]ইবনে খালদুন, মুকাদ্দীমা, মক্কা: দারাল বায, ১৩৯৭ হিজরী / ১৯৭৮, ৪৬৭।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সকল মুর্শিদের মুর্শিদ, ইনসানে কামিল বা পূর্ণাঙ্গ আদর্শ পুরুষ। তাঁর উপস্থিতি ও দর্শন ছিলো ঈমানদার সকলের জন্য মহা সৌভাগ্যের কারণ। সুতরাং সাহাবায়ে কিরামের যুগে পরবর্তীতে যেভাবে নিয়মতান্ত্রিকভাবে তাসাওউফ চর্চার শুরু হয়েছিল তার প্রয়োজন ছিলো না। সাহাবায়ে কিরামের প্রত্যেকেই কামালিয়াতের উচ্চতর দরজায় উপনীত হয়েছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সুহবত লাভ করে। এজন্যই স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি রাজী-খুশী হওয়ার ঘোষণা দিয়েয়েছন তাঁর কালামে পাকে। ইরশাদ হয়েছে:

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

-"আর যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনসারদের মাঝে পুরাতন, এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ সে সমস্ত লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কাননকুঞ্জ যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত প্রস্রবণসমূহ। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল, এটাই হল মহান কৃতকার্যতা"। [সূরা তাওবাহ : ১০০]

তাফসীরে ইবনে কাসিরে আছে, এই আয়াত নাজিল হয়েছে হুদাইবিয়ার সন্ধির পূর্বে সাহাবায়ে কিরাম কর্তৃক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বাইআত গ্রহণের পর। এই বাইআত ইতিহাসে 'বাইআতে রিদ্বওয়ান' নামে খ্যাত।

তাসাওউফপন্থী সুফিয়ায়ে কিরাম ও তাঁদের তরীকা বা পথের সর্বোৎকৃষ্ট সংজ্ঞাও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়ে গেছেন। হাফিজ ইবনে হাজর আসক্বালানী [৭৭৩-৮৫২ হি.] রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর বুখারী শরীফের বিখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'ফাতহুল বারী'-তে একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন। হাদিসটি এই:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ

-হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত: নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন: "আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার ওলির বিরুদ্ধাচরণ করে আমি তার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমার বান্দা আমার কাছে আসে যেসব ব্যাপার আমি তার জন্য অবশ্যকরণীয় করে দিয়েছি ও যা আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় তা নিয়ে। সে আমার কাছে আসতে থাকে নফল-ইবদাতসহ যতক্ষণ না আমি তাকে ভালোবাসি। আর আমি যখন ভালোবাসি তখন আমিই হয়ে যাই তার কান যার দ্বারা সে শুনে, তার চোখের জ্যোতি যার দ্বারা সে দেখে, তার হাত যার দ্বারা সে [বস্তুসমূহ] ধরে এবং তার পা যার দ্বারা সে চলে। সে আমার নিকট যা চায় আমি অবশ্যই তা তাকে দান করি। সে যখন আমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে আমি অবশ্যই তাকে আশ্রয় দান করি"।[১০৫]

উক্ত হাদিসটি বুখারী শরীফ ছাড়াও, ইমাম আহমদ, ইমাম বাইহাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমাসহ অন্যান্য মুহাদ্দিসীনে কিরাম তাঁদের স্ব-স্ব সংকলনে লিপিবদ্ধ করেছেন।

তাবিঈ ও তাবে-তাবিঈর যুগে তাসাওউফচর্চা: এ যুগে আল্লাহর ফজলে আইম্মায়ে মুজতাহিদীনসহ ইসলামের অনেক মহাত্মন ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে। এদের সকলেই তাসাওউফের উপর বিশ্বাসী ও আমলদার ছিলেন। নিম্নে

[১০৫] ফাতহুল বারী, খ.১১, পৃ: ৩৪০-৪১, হাদিস ৬৫০২।

চার মাজহাবের আলো

আমরা প্রসিদ্ধ কয়েকজনের উক্তি ও আমল প্রমাণ হিসাবে সূত্রসহ বর্ণনা তুলে ধরছি।

ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [৮৫ - ১৫০ হিজরী]

দুররুল মুখতার গ্রন্থে ইবনে আবিদীন [১১৯৮-১২৫২ হি.] লিখেন: ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, "যদি সেই দু'বছর না হতো, তাহলে আমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতাম।" ইবনে আবিদীন মন্তব্য করেন: দু'বছরের জন্য তিনি (ইমাম আবু হানীফা) সাইয়্যিদুনা ইমাম জাফর সাদিক্ব [৮৩-১৪৮ হি.] রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গলাভ করে আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জন করেন। আর তিনি এ কারণেই তরীকতের শায়খ (বা মুর্শিদ) হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন।

আবু আলী দাক্কাক [মৃ. ৪০৫ হি.] রাহামাতুল্লাহি আলাইহি যিনি ছিলেন ইমাম আবুল কাসিম কুশায়িরী [মৃ. ৪৬৫ হি.] রাহমাতুল্লাহি আলাইহির তরীকতের শায়খ খিলাফত লাভ করেন আবুল কাসিম নাসিরাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছ থেকে, তিনি হযরত সিররে সাক্বতি [১৫৫-২৫৩ হি.] রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে, তিনি হযরত মারুফ খারকী [মৃ. ২০০/২০১ হি.] রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে, তিনি হযরত দাউদ তায়ী [মৃ. ১৬০/১৬৫ হি.] রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে এবং তিনি ইমামে আযম হযরত আবু হানীফা রাহামতুল্লাহি আলাইহির কাছ থেকে তরীকতের খিলাফত লাভ করেন।[১০৬]

ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [৯৫ - ১৭৯ হি.]

মদীনা মুনুওয়ারার প্রসিদ্ধ ইমাম হযরত মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নবীপ্রেমের এক অনন্য ব্যক্তিত্ব হিসেবে সুপরিচিত। তিনি পবিত্র মদীনা শরীফ থেকে বের হতেন না এই ভয়ে যে, হয়তো তাঁর মৃত্যু অন্যত্র হয়ে যাবে এবং মদীনা নগরীতে তাঁকে দাফন করা হবে না। আল্লাহ পাক তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ

[১০৬] ইবনে আবিদীন, হাশিয়াত রাদ্দুল মুহতার আলাল দুররুল মুখতার, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৩।

করেছেন। রওজা মুবারকের নিকটে জান্নাতুল বাক্বী কবরস্থানে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এতোই পরহেজগার ছিলেন যে, অযু ছাড়া কোনো হাদিস বর্ণনা করতেন না। ইবনে যাওজী [৫০৮-৫৯৭ হি.] রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'সিফাতু সাফওয়া' গ্রন্থে ষষ্ঠ স্তরের মদীনাবাসী শিরোনামে একটি লেখায় বলেন: আবু মুসআব বলেন, আমি মালিক ইবনে আনাসকে দেখতে যাই। তিনি আমাকে বললেন: আমার জায়নামাযের নীচে দেখো তো কি আছে? আমি জায়নামাযের নীচে কিছু লেখা দেখতে পেলাম। তিনি বললেন: এটা পড়ো। [আমি দেখলাম] এতে একটি স্বপ্নের কথা লিপিবদ্ধ আছে। স্বপ্নটি তাঁর এক ভাই দেখেছেন এবং এতে তিনি নিজে জড়িত। এরপর তিনি নিজেই তা পাঠ করতে লাগলেন: "আমি ঘুমের মধ্যে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি। তিনি তখন তাঁর মসজিদে ছিলেন এবং তাঁর চতুর্দিকে অনেক লোক বসে আছেন। তিনি তাঁদেরকে বললেন: আমি আমার মিম্বরের নীচে তোমাদের জন্য উত্তম জিনিস বা জ্ঞান লুকিয়ে রেখেছি এবং আমি মালিককে নির্দেশ দিয়েছি তা মানুষের প্রতি বিলিয়ে দেওয়ার জন্য।" এরপর মালিক (রাহঃ) কাঁদতে লাগলেন, সুতরাং আমি সেখান থেকে বিদায় হলাম।[১০৭]

ইমামে আযম হযরত আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও হযরত সুফিয়ান সাওরী [৯৭-১৬১ হি.] রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যেভাবে উচ্চতর সোপানে আরোহণের জন্য সুফিদের রাস্তায় চলার কথা বলেছিলেন, ঠিক সেভাবে ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিও নিম্নোক্ত বক্তব্যে একই কথা বলেছেন:

"যে কেউ শরীয়তের জ্ঞান ও অনুসরণ ছাড়া তাসাওউফের সাধনা করে, সে তার ঈমানকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, অপরদিকে যে কেউ শরীয়তের জ্ঞানকে আয়ত্ত করেছে কিন্তু তাসাওউফের সাধনা করেনি সে নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। যে কেউ দুটিকে একত্রিত করেছে সেই হক্বপন্থী।"

---

[১০৭] ইবনে যাওজী, সিফাতু সাফওয়া, ১(২), পৃঃ ১২০।

এই মন্তব্যটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন মুহাদ্দিস আহমদ জাররুক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ৮৯৯ হি.], হাফিজ আলী ক্বারী হারাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১০১৪ হি.], মুহাদ্দিস আলী ইবনে আহমদ আদাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১১৯০ হি.] এবং ইবনে আযিবা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১২২৪ হি.] এবং অন্যান্যরা।[১০৮]

ইবনে আযিবা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "শায়খ আহমদ জাররুক বলেন: তাসাওউফের দুই হাজারেরও বেশী সংজ্ঞা আছে। সবগুলোর মূলে কিন্তু একই জিনিষ- আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের ব্যাপারে সত্যবাদিতা। প্রত্যেকটি সংজ্ঞা ব্যক্তির জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও স্তরের উপর নির্ভরশীল। ব্যক্তি তার নিজের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের আলোকে বলবে: তাসাওউফ এই, তাসাওউফ সেই।"

সুতরাং এ থেকে বুঝা যায় যে, যেসব সুফির কথা [আবু নুয়াঈমের হিলইয়াতুল আওলিয়া গ্রন্থে] বলা হয়েছে, যারা সিদ্‌ক্বে তাওয়াজ্জুহর [বিশ্বস্ত - আবেদনকারী] অধিকারী ছিলেন, তারা সকলেই তাসাওউফের কোনো কোনো অংশের অধিকারী ছিলেন এবং তা তারা নিজেদের আমলে পরিণত করে গিয়েছেন। এটা নিয়ম যে, সিদ্‌ক্বে তাওয়াজ্জুহ দ্বীনের একটি অবশ্যকরণীয় বস্তু। কারণ এটার মধ্যে জড়িত ব্যক্তির বিশ্বস্ততা ও কর্ম (আমল) যা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য। মানুষের কর্মপন্থা [আমলী জীবন] এবং এর মধ্যকার আমল কখনও হক্ব হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত তার সিদ্‌ক্বে তাওয়াজ্জুহ হক্ব হবে না। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰى ثُمَّ إِلٰى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

---

[১০৮] মুল্লা আলী ক্বারী, শারহ আইনুল ইলম ওয়া জাইনুল হিলম (কায়রো: মাক্বতাবাতুল তাক্বাফাত দ্বীনিয়্যা, ১৯৮৯) ১, পৃ. ৩৩; আহমদ জাররুক, ক্বাওয়াইদুত তাসাওউফ (কায়রো: ১৩১০); আলী আদাওয়ী, হিশায়াতাল আদাওয়ী আলা শারহ আবি আল-হাসান লি রিসালাত ইবনে আবি জায়িদ আল-মুসাম্মাত কিফায়াতুল তালিবুর রাব্বানি লি রিসালাত ইবনে আবি জায়িদ আল-কাইরাওয়ানি ফি মাযহাব মালিক, ২, পৃঃ ১৫; ইবনে আযিবা, ইক্বাজুল হিমাম ফি শারহ আল হিকাম (কায়রো: হালাবি, ১৩৯২/১৯৭২) পৃঃ ৬৫।

-"যদি তোমরা অস্বীকার কর, তবে আল্লাহ তোমাদের থেকে বেপরওয়া, তিনি তাঁর বান্দাদের কাফির হয়ে পড়া পছন্দ করেন না, পক্ষান্তরে যদি তোমরা কৃতজ্ঞ (শুকুরগুজার) হও, তবে তিনি তোমাদের জন্যে তা পছন্দ করেন। একের পাপ ভার অন্যে বহন করবে না, অতঃপর তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে ফিরে যাবে। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কর্ম সম্বন্ধে অবহিত করবেন, নিশ্চয় তিনি অন্তরের বিষয় সম্পর্কেও অবগত।" [সূরা যুমার : ৭]।

সুতরাং ইসলামের গুরুত্ব আমলের মধ্যে। আত্মশুদ্ধি (তাসাওউফ) ফিকহের জ্ঞান ছাড়া হয় না, কারণ আল্লাহর নির্দেশিত বাহ্যিক আইন-কানুন শরীয়তের জ্ঞান ছাড়া জানা যায় না; এবং আত্মশুদ্ধি ছাড়া ঐ জ্ঞানকে (শরীয়তকে) আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ শরীয়তের জন্য আত্মশুদ্ধি আর আত্মশুদ্ধির জন্য শরীয়ত উভয়ই জরুরী। যেমন, দেহ ও আত্মা একে অন্যের স্থিতির জন্য জরুরী- একটা থাকলে আর অপরটি না থাকলে অপূর্ণ থেকে যাবে। ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বক্তব্য, 'শরীয়তের জ্ঞান ছাড়া তাসাওউফের সাধনা করে' কথাটির অর্থ এটাই।[১০৯]

ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [১৫০ - ২০৫ হি.]

হাফিজ জালালুদ্দিন সুয়ুতী [৮৪৯-৯১১ হি.] রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর তাঈদুল হাক্বিক্বাল আউলিয়া গ্রন্থে বলেন: "ইমাম শাফিঈ বলেছেন, আমি সুফিদের সুহবতে থেকে তাঁদের নিকট ৩টি বাক্য শিখেছি: সময় একটি অসি, তুমি যদি তাকে কাটতে না পারো তবে তা তোমাকে কেটে দেবে; তুমি যদি তোমার নফসকে সত্যের মধ্যে নিমগ্ন না রাখো তবে তা তোমাকে বাতিলের মধ্যে ব্যস্ত রাখবে; বঞ্চনা হচ্ছে নিরাপত্তা"।[১১০]

মুহাদ্দিস আযলুনী তাঁর 'কাশফাল খাফা ওয়া মুজিলাল আলবাস' গ্রন্থে বলেন, "ইমাম শাফিঈ বলেছেন, এই পৃথিবীতে তিনটি সুন্দর জিনিস আমাকে

[১০৯] ইবনে আযিবা, ইক্বাজুল হিমাম, পৃ. ৫-৬।
[১১০] সুয়ুতী, তাঈদুল হাক্বিক্বাল আউলিয়া, পৃ. ১৫।

দান করা হয়েছে: কৃত্রিমতা থেকে দূরে থাকা, মানুষের সঙ্গে দয়ালু ব্যবহার ও তাসাওউফের রাস্তা অনুসরণ"।[১১১]

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [১৬৪ - ২৪১ হি.]

হাম্বলী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা এই মহান সাধক সুফিদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। তিনি উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, "হে আমার পুত্র! সুফিদের সঙ্গে তুমি অবশ্যই উঠাবসা করবে, কারণ তাঁরা হচ্ছেন জ্ঞানের ফোয়ারা এবং আল্লাহর স্মরণ তাঁদের হৃদয়ে স্থায়ী আছে। এরাই হচ্ছেন মহান তাপস এবং তাঁদের আয়ত্তে আছে সর্বাপেক্ষা অধিক আধ্যাত্মিক ক্ষমতা।"[১১২]

তাঁকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, দীদারে ইলাহী কিভাবে সম্ভব? তিনি জবাব দিলেন, "পাক কুরআন শরীফ [তিলাওয়াত] এর মাধ্যমে।" [তাযকিরাতুল আওলিয়া, মাওলানা নূরুর রহমান]

ইখলাস কি? এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "কাজ-কর্মের আপদ-বিপদ, তর্ক-বিতর্ক প্রভৃতি থেকে মুক্ত হয়ে শুধু আল্লাহর উদ্দেশ্যে কাজ করাই হলো ইখলাস।" [প্রাগুক্ত]

তিনি বলেছেন, "প্রয়োজনের মাত্রা অনুপাতে দুনিয়ার সম্পদ সন্ধান করা দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হওয়ার সামিল নয়।" [সুফিয়ায়ে কেরামের বাণী]।

হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [২১-১১০ হি.]

তিনি ছিলেন প্রাথমিক যুগের একজন প্রসিদ্ধ তাবিঈ ও সুফি। হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সারা জীবন সুফিদের পরিধান- মোটা সূতার খিরকা পরেছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুণ্যবতী স্ত্রী উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা [৫৯৬ ঈ - ৬৪ হি.] রাদ্বিআল্লাহু আনহা কর্তৃক মুক্তপ্রাপ্তা এক মহিলার সন্তান ছিলেন হযরত বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পালকপুত্র হযরত জায়িদ

[১১১] আল-আযলুনী, কাশফাল খাফা ওয়া মুজিলাল আলবাস, ১, পৃ. ৩৪১।
[১১২] তানবীরুল কুলুব, পৃ. ৪০৫।

ইবনে তাবিত [৬১০-৬৬০ ঈ] রাদ্বিআল্লাহু আনহু কর্তৃক মুক্তিপ্রাপ্ত এক ব্যক্তি ছিলেন তাঁর বাবা। তখনকার যুগে হযরত বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মতো সুন্নাতের এতো কঠোর পাবন্দ অপর কেউ ছিলেন কি না সন্দেহ আছে। মদীনা শরীফে জন্ম নেওয়া ও পরে বসরা শহরের বাসিন্দা এই অলিআল্লাহ অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তখনকার দিনে তাঁর সুনাম ছিলো বিরাট।

ইবনে যাওজী হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জীবনী লিপিবদ্ধ করেন। এই গ্রন্থটির নাম হচ্ছে, 'আদাবুল শাইখুল হাসান ইবনে আবুল হাসান বসরী'। ১০০ পৃষ্ঠার এই পুস্তকের 'সিফাতু সাফওয়ায় হাসান' নামক পরিচ্ছেদে তিনি বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জুব্বা সম্পর্কে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, মৃত্যুর পূর্বে হযরত বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর সাদা জুব্বাটি রেখে যান। এটা তিনি দীর্ঘ ২০ বছর যাবৎ পরিধান করেছিলেন। শীত এবং গ্রীষ্মকাল- কোনো সময়ই এটা গা থেকে খুলতেন না। কিন্তু মৃত্যুর পরে দেখা গেলো এই জুব্বাটি অত্যন্ত সুন্দর, স্বচ্ছল ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অবস্থায় আছে।[১১৩]

ইবনে ক্বাইয়্যিম [৬৯১-৭৫১ হি.] রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'রাওদ্বাতুল মুহিব্বীন ওয়া নুযহাতুল মুস্তাক্বীন' গ্রন্থে বলেন: "একদা একদল মহিলা ঈদের দিন বাইরে যেয়ে মানুষের দিকে তাকাচ্ছিলো। তারা একে অন্যকে জিজ্ঞেস করলো, আজ তোমরা যাকে সর্বাপেক্ষা সুন্দর ব্যক্তি হিসেবে দেখলে তিনি কে? তারা [অনেকে] জবাব দিলো, তিনি একজন শায়খ যার মাথায় ছিলো কালো পাগড়ী। তারা হযরত হাসান বসরীর কথা বলছিলো"।[১১৪]

শায়খুল হাদিস আবু নুয়াঈম ইসফাহানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ৪৩০ হিজরী] তাঁর প্রণীত সুফিদের জীবনীগ্রন্থ হিলইয়াতুল আউলিয়া-তে বলেন, "হাসান বসরীর একজন শিষ্য আব্দুল ওয়াহিদ ইবনে জায়িদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃঃ ১৭৭ হিজরী] সর্বপ্রথম সুফি খানকাহ্ তৈরী করেন। এছাড়া তিনি একটি মাদ্রাসাও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এগুলো আবাদান নামক স্থানে ছিলো [বর্তমান যুগের ইরান-ইরাক সীমান্তবর্তী এলাকায়]"।[১১৫]

[১১৩] ইবনে যাওজী, সিফাতু সাফওয়া, ২(৪), পৃ. ১০।
[১১৪] ইবনে ক্বাইয়্যিম, রাওদ্বাতুল মুহিব্বীন ওয়া নুযহাতুল মুস্তাক্বীন, পৃ. ২২৫।
[১১৫] আবু নুয়াঈম ইসফাহানী, হিলায়াতুল আউলিয়া, (খঃ ৬), পৃঃ ১৫৫।

হযরত সুফিয়ান সাওরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [৯৭-১৬১ হি.]

ইবনে কাইয়্যিম যাওজিয়্যা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'মাদারিযুস সালিকীন' এবং ইবনে যাওজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'সিফাতু সাফওয়া' গ্রন্থের '**আবু হাসিম আল-জাহিদ শিরোনাম**' পরিচ্ছেদে আবু নুয়াঈম ইসফাহানী [৩৩৬-৪৩০ হি.] রাহমাতুল্লাহি আলাইহির 'হিলায়াতুল আউলিয়া' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, "হযরত সুফিয়ান সাওরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: আবু হাসিম আস-সুফী [মৃ. ১১৫ হি.] না হলে আমি নিজের মধ্যে মুনাফিকীর স্বরূপ একটুও বুঝতে পারতাম না। তিনি ছিলেন সুফি শাস্ত্রের উপর জ্ঞানবানদের মধ্যে এক অনন্য ব্যক্তি।"[১১৬]

ইবনে যাওজী আরও বলেছেন: আবু হামিদ জাহিদ বলেছেন: আল্লাহ তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের [সালিকদের] কাছ থেকে দুনিয়াকে দূরে সরে দিয়েছেন, যাতেকরে তাঁরা শুধুমাত্র তাঁর সঙ্গে থাকেন এবং পৃথিবীর সঙ্গে না থাকেন। তিনি এটাও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, যারা তাঁকে মান্য করে তাঁর নৈকট্য চায় তারা যেনো জগতকে ভুলে যায়। আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞানবানরা [আহলুল মা'আরিফ বিল্লাহ] এ জগতে অপরিচিতজন এবং আখিরাতের জন্য বিরহে বিভোর।[১১৭]

হারিস আল-মুহাসিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [১৬৫-২৪৩ হি.]

সুফিতত্ত্বের উপর হারিস ইবনে আসাদ আল-মুহাসিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন প্রাথমিক যুগের একজন লেখক। প্রখ্যাত অলিআল্লাহ হযরত জুনায়িদ বাগদাদী [২১৮-২৯৭ হি.] ও হযরত সিররে সাক্বতি [১৫৫-২৫৩ হি.] রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা তাঁর শিষ্য ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে হযরত আব্দুল ক্বাহির বাগদাদী [মৃ. ৪২৯ হি.] রাহমাতুল্লাহি আলাইহি,

[১১৬]ইবনে কাইয়্যিম যাওজিয়্যা, মাদারিযুস সালিকীন; ইবনে যাওজী, সিফাতু সাফওয়া (বৈরুত: দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যা, ১৪০৩/১৯৮৯), ১,২, পৃঃ ২০৩; আবু নুয়াঈম, হিলায়াতুল আউলিয়া, এসভি আবু হাসিম আস-সুফী।
[১১৭]ইবেন যাওজী, পূর্বোক্ত।

হযরত তাজউদ্দীন সুবকী [৭২৭-৭৭১ হি.] রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং জামালুদ্দিন ইসনাভী [মৃ. ৭৭২ হি.] রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমাদের মধ্যে যারা মুতাকাল্লিম [ধর্মজ্ঞানী], ফকীহ [আইনজ্ঞ] এবং সুফি হযরত হারিস ইবনে আসাদ আল-মুহাসিবীর কালাম, ফিকহ ও হাদিস গ্রন্থগুলোর উপর ঋণী।[১১৮]

তাঁর লেখা ক'টি গ্রন্থ হচ্ছে:

১. কিতাবুর রিআয়া লি হুক্কুকাল্লাহ [আল্লাহর হক্ব পালনের বই]; শায়খুল ইসলাম ঈয্জ ইবনে আব্দুস সালাম বইটির উপর ব্যাখ্যা লিখেন [সুবকী এ সম্পর্কে তাঁর তাবাক্বাতাশ শাফিয়্যা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন]।

২. কিতাবুত তাওয়াহহুম [কল্পনার বই- এতে কিয়ামতের বর্ণনা এসেছে]।

৩. কিতাবুল খাওলা [নির্জনবাসের বই]।

৪. রিসালাতাল মুছতারশিদীন [উপদেশ আগ্রহীদের জন্য আলোচনা]।

৫. কিতাব ফাহমাল কুরআন [কুরআন বুঝার পুস্তক]।

৬. আল-মাসাইল ফি আমাল আল-ক্বালব ওয়াল জওয়ারিহ ওয়াল আক্বল [হৃদয়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও মানসিক কার্যাবলীর মাসাইল]।

৭. কিতাবুল আযামা [চমৎকারিত্বের পুস্তক]।[১১৯]

ক্বাসিম ইবনে উসমান জুঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ২৪৮ হি.]

তিনি ছিলেন দামেস্কের একজন সুখ্যাত অলিআল্লাহ। তিনি সূফিয়ান ইবনে উমাইয়্যা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট থেকে হাদিস শিক্ষা করেন। ইবনে যাওজি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সিফাতু সাফওয়া গ্রন্থে লিখেন, হযরত জুঈ বলেছেন, তিনি জুঈ নামটি নিয়েছেন এজন্য যে, আল্লাহ তাঁকে ক্ষুধার্ত

[১১৮] আব্দুল ক্বাহির বাগদাদী, কিতাবুল উসূল দ্বীন, পৃঃ ৩০৮-৩০৯; তাজউদ্দীন সুবকি, তাবাক্বাতাশ শাফিয়্যা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭৫; জামালুদ্দিন ইসনাভী, তাবাক্বাতাশ শাফিয়্যা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৬-২৭।

[১১৯] হিশাম কাব্বানি রচিত সালাফীদের বিদআতসমূহের অস্বীকৃতি গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত (কাজী, ১৯৯৬), পৃঃ ৩০৬।

থাকার ক্ষমতা দান করেছিলেন আধ্যাত্মিকভাবে ক্ষুধার্ত থাকার মাধ্যমে, আর জুঈ অর্থ ক্ষুধার্তের। তিনি আরও বলেছেন, আমি যদি দীর্ঘ একমাস যাবৎই খাবার ছাড়া থেকে যাই তবে এতে কিছু যায় আসে না। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে এ অবস্থায় রেখেছ, সুতরাং আমার জন্য তা পূর্ণ করে দাও![১২০]

তাঁর সম্পর্কে ইমাম জাহাবী [৬৭৩-৭৪৮ হি.] রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তার প্রণীত 'সিয়ারুল আমল আন-নুবুলা' গ্রন্থে লিখেছেন: আল-আব্দী যিনি ক্বাসিম আল-জুঈ নামে প্রসিদ্ধ, তিনি ছিলেন ইমাম, সুফি, মুহাদ্দিস, সুফিদের শায়খ এবং আহমদ ইবনে হাওয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বন্ধু।

ইবনে যাওজী আরো লিখেছেন, ইবনে হাতিম আর-রাজী বলেছেন, হাদিস অনুলেখকদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আমি দামেস্ক গিয়েছিলাম। আমি ক্বাসিম জুঈর একটি মাহফিলের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখতে পেলাম বিপুল-সংখ্যক মানুষ তাঁর চতুর্দিকে বসে আছেন। তিনি তখন বক্তৃতা করছিলেন। আমি সামনে অগ্রসর হয়ে মাহফিলের নিকট দাঁড়িয়ে শুনতে পেলাম তিনি বলছেন: তোমাদের জীবনে পাঁচটি কাজ করো: ১. যদি তুমি মানুষের সঙ্গে থাকো তবে কেউ যেনো তোমার উপস্থিতির কথা জানে না। ২. যদি তুমি মানুষের সঙ্গে না থাকো তবে মানুষ যেনো তোমাকে না খুঁজে। ৩. যদি তুমি কিছু জেনে থাকো তা যেনো অন্যরা শোনার জন্য আগ্রহী না হয়। ৪. যদি তুমি কিছু বলো, তাহলে তা যেনো মানুষ গ্রহণ না করে। ৫. যদি তুমি কোন কাজ করো তাহলে তার জন্য কোন প্রতিদান গ্রহণ করো না।

তিনি আরও বললেন: আমি তোমাদেরকে আরও পাঁচটি উপদেশ দিচ্ছি: ১. তুমি যদি ভুল করো, তাহলে তুমি তা অন্যের নিকট বিনিময় করো না। ২. তোমার প্রশংসা করা হলে, খুশী হবে না। ৩. তোমাকে দোষী সাব্যস্ত করা হলে, মনোক্ষুণ্ণ হবে না। ৪. তোমাকে মিথ্যাবাদী বললে, রাগান্বিত হবে না। ৫. তোমার প্রতি প্রতারণা করলে, তুমি পাল্টা প্রতারণা করো না।

ইবনে আবু হাতিম বলেন, দামেস্ক ভ্রমণের মাধ্যমে যতোসব সুফল আমি অর্জন করেছি তার মধ্যে এই বাক্যগুলো ছিলো সর্বাপেক্ষা উপকারী।[১২১]

[১২০] ইবনে যাওজী, সিফাতু সাফওয়া, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২০০।

[১২১] উপরোদ্ধৃত।

ইমাম জুনায়িদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [২১৮-২৯৭ হি.]

তাঁর যুগের ইমাম হযরত জুনায়িদ বাগদাদী (রাহঃ) সুফিতত্ত্বের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন:

الصوفي من لبس الصوف على الصفا

-সুফি তিনি যিনি পবিত্রতার উপর পশম পরেন।

وسلك طريق المصطفى

-মুস্তফার (সাঃ) রাস্তা অনুসরণ করেন।

وأذاق النفس طعم الجفا

-দৈহিক যন্ত্রণা সয়ে, উপাসনায় থাকেন রত বিলাসিতা ভুলে।

وكانت الدنيا منه على القفا

-জাগতিক পাওয়ার সবকিছু দূরে দেন ঠেলে।[১২২]

হযরত জুনায়িদ বাগদাদীর প্রখ্যাত গ্রন্থ 'কিতাবুদ্ দাওয়াল আরওয়াহ' [আত্মার উপশমের কিতাব] এ. জে. আরবেরী ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন। [আল-জুনায়িদ বাগদাদী, কিতাব দাওয়াল আরওয়াহ, ইডি, এন্ড ট্রা, এ জে আরবেরী ইন জার্নাল অফ দ্যা রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি (১৯৩৭)।]

হযরত আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির শিষ্য ও প্রধান খলীফা হযরত আবুল ক্বাসিম কুশাইরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক হাজার বৎসর পূর্বে রচিত তাসাওউফ শাস্ত্রের বিখ্যাত কিতাব, 'রিসালাতুল কুশাইরী' খানক্বায়ে আমীনিয়া-আগসরিয়া গবেষা বিভাগ থেকে মাওলানা সৈয়দ মাহমুদুল হাসান কর্তৃক অনুবাদের কাজ চলছে। ইনশাআল্লাহ অচিরেই গ্রন্থটি পাঠকের হাতে পৌঁছে যাবে।

[১২২] আলিফুদ্দীন আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবনে আছাদ ইয়াফিঈ [মৃঃ ৭৬৮ হিঃ], নাসরুল মাহাসিনুল গ্বালিয়া ফি ফজল মাশায়িখুস সুফিয়্যা (বৈরুতঃ দার সাদর, ১৯৭৫)।

হযরত কুশাইরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত জুনায়িদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জীবন ও কর্ম সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরেছেন। আমরা এখানে এর বঙ্গানুবাদ তুলে ধরছি।

"আবুল ক্বাসিম জুনায়িদ ইবনে মুহাম্মাদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

তিনি ছিলেন আওলিয়াদের সর্দার। তাঁর জন্মস্থান নাহাওন্দে, ইরাকে প্রতিপালিত হন। তাঁর বাবা কাচ বিক্রি করতেন। এজন্য তাঁকে কাওয়ারিরী বলা হতো। জুনায়িদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আবু সওরের মাজহাবের ফকীহ ছিলেন। ২০ বৎসর বয়সে মজলিসে বসে ফাতওয়া প্রদান করতেন। তিনি তাঁর মামা সারী সাকাতী, হারিস মুহাসিবী এবং মুহাম্মাদ ইবনে আলী কাসসাব রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমের সন্নিধ্য লাভে ধন্য হন। ২৯৭ হিজরিতে তিনি ইন্তিকাল করেন।

হযরত ফারাগানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, জুনায়িদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে প্রশ্ন করা হলো, আরিফ কে? আমি তাকে উত্তর দিতে শুনেছি, "যে নাকি তোমার গোপনীয়তা সম্পর্কে কথা বলে আর তুমি তাতে নীরব থাকো- সে-ই আরিফ।" তিনি বলতেন, "আমরা অধিক কথাবার্তা ও প্রশ্ন দ্বারা তাসাওউফ লাভ করি নি। বরং ক্ষুদা, দুনিয়া বর্জন এবং আরাম-বিলাসিতা থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে তাসাওউফ অর্জন করেছি।"

হযরত জুনায়িদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, "ঐসব লোকই হলেন আল্লাহর মা'রিফাতের অধিকারী যারা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করার পর চাঞ্চল্যতা বর্জন করেছেন।" তিনি আরো বলেন, "একদল লোক আমল বর্জনের কথা বলে। এটা আমার নিকট বিরাট একটি ব্যাপার। যে ব্যক্তি চুরি-ব্যভিচার করে, সে-ও এরূপ বক্তব্যধারীদের থেকে উত্তম! আল্লাহর মা'রিফাত লাভকারী লোকজন আল্লাহর পক্ষ থেকেই আমল করেন। যদি হাজার বছর বেঁচে থাকি তবুও এক কণা পরিমাণ নেক আমল আমি বর্জন করবো না।"

তিনি বলেন, "যদি সম্ভব হয় নিজেকে একটি মৃত কায়া মনে করো।" হযরত আরো বলতেন, "সমস্ত রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে, কেবলমাত্র তার জন্য বন্ধ হয় নি, যে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদাঙ্ক অনুসরণ করে।"

জুনায়িদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আরো বলেন, "কোন সত্যবাদী মানুষ যদি হাজার হাজার বছর আল্লাহভিমুখী থাকে এরপর একটি মুহূর্তের জন্য আল্লাহ থেকে মুখ ফিরায়, তাহলে তার প্রাপ্তি থেকে হারানোর মাত্রাই হবে বেশী।" তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি কুরআন মুখস্ত করে নি। হাদিস লিপিবদ্ধ করে নি। তাসাওউফ অধ্যায়ে তাকে অনুপ্রবেশ করা যাবে না। কারণ, আমাদের ইলম কুরআন ও সুন্নার সাথে সম্পৃক্ত।"

হযরত আবুল হুসাইন হাদ্দাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি কাজী আবুল আব্বাস ইবনে শুরাইহের মজলিসে উপস্থিত হতাম। তিনি মূলনীতি ও প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে সুগভীর আলোচনা করতেন। আমার মাঝে আশ্চর্যবোধের চিহ্ন লক্ষ্য করে তিনি বললেন, "তুমি কি জানো আমি এ জ্ঞান কোথায় পেয়েছি?" বললাম, আপনিই উত্তর দিন। তিনি বললেন, "এটা হলো আবুল ক্বাসিম জুনায়িদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সুহবত লাভের বরকত।"

হযরত জুনায়িদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে প্রশ্ন করা হলো, আপনি এই জ্ঞান কোত্থেকে অর্জন করলেন? তিনি জবাব দিলেন, "আমি ঐ সিঁড়িতে ত্রিশ বছর যাবৎ আল্লাহ তা'আলার সামনে বসা ছিলাম।" কথাটি বলার সময় তিনি নিজের কক্ষের একটি সিঁড়ির দিকে ইশারা করলেন।

একদা তার হাতে তাসবিহের ছড়া দেখা গেল। প্রশ্ন করা হলো, এতো সম্মানিত হওয়া সত্ত্বেও আপনি কেন এটা হাতে ধারণ করছেন? তিনি জবাব দিলেন, "আমি আমার প্রভুর সান্নিধ্য লাভ করেছি এ রাস্তায়ই। সুতরাং আমি তা কখনো বর্জন করবো না।"

জুনায়িদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রত্যহ নিজের দোকানে যেয়ে পর্দা ফেলে দিতেন। চারশ' রাকাআত নামায আদায় করতেন। এরপর বাড়িতে চলে যেতেন। আবু বকর আতাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, মৃত্যুকালীন সময় আমি জুনায়িদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির পাশে বসা ছিলাম। তিনি তখন কুরআন পাঠরত ছিলেন। তিনি যখন সূরাতুল বাক্বারার সত্তুর আয়াত পড়ে

শেষ করেন তখনই তাঁর মৃত্যু ঘটে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি করুণা বর্ষণ করুন।"[১২৩]

হাকীম আত-তিরমিযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [১৩৩-২৫৫ হিজরী]

আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আলী হাকীম আত-তিরমিযী আল-হানাফী [তিনি প্রখ্যাত হাদিস সংকলক আবু ঈসা তিরমিযী নন] ছিলেন খুরাশানের একজন প্রখ্যাত ফকীহ ও মুহাদ্দিস। তিনি তাসাওউফের উপর অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর লেখালেখির উপর প্রখ্যাত গবেষক শায়খুল আকবর ইবনে আরাবী [১১৬৫-১২৪০ ঈ.] রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মন্তব্য করেছেন। হাকীম আত-তিরমিযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যেসব বই-পুস্তক লিখেছিলেন তার মধ্যে নিম্নে তালিকাভুক্ত ক'টির সন্ধান পাওয়া যায়:

১. মাসাইলুল মাকনুনা [সুপ্ত ব্যাপার]

২. আদাব আন-নাফস [নফসের আদাব]

৩. আদাব আল-মুরিদীন [মুরিদদের আদাব]

৪. আমসাল মিনাল কিতাবুস-সুন্নাহ [কুরআন-সুন্নাহর উপমাসমূহ]

৫. আসরার মুজাহাদাতান নাফস [নফসের সঙ্গে সংগ্রামের রহস্য]

৬. ইলমুল আউলিয়া [আউলিয়াদের জ্ঞান]

৭. খাতমুল বিলায়াত [বিলায়েতের নিদর্শন]

৮. শিফাউল ঈলাল [ভ্রান্তির উপশম]

৯. কিতাবুল মা'আরিফাতুল আসরার [ইলমে মা'আরিফাতের রহস্যের বই]

১০. কিতাবুল আদা ওয়ান নাফস ওয়াল আক্বল ওয়াল হাওয়া [দুশমনদের পুস্তক, নফস, মন ও খাহিশাত]

[১২৩] রিসালাতুল কুশাইরী, বঙ্গানুবাদ পাণ্ডুলিপি, মাওলানা সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া গবেষণা বিভাগ, সিলেট, বাংলাদেশ।

১১. আল-মানিয়্যাত [নিষেধাজ্ঞা]

১২. নাওয়াদিরুল উসূল ফী মা'আরিফাত আহাদিছুর রাসূল [রাসূল [সাঃ]-এর বিরল হাদিসের জ্ঞান]

১৩. আল-কালাম আলা মাআনা, লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ [লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ'র অর্থ]।[১২৪]

হযরত আবু আবদুল্লাহ রুজবারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ৩৬৯ হি.]

তিনি ছিলেন হযরত আবু আলী রুজবারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির আপন ভাগিনা। দমেস্ক তথা সিরিয়া অঞ্চলের সুফি শায়খ হিসাবে তিনি সুপরিচিত ছিলেন।

হযরত আবু বকর কালাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [৩২০-৩৮০ হি.]

এই মহাত্মন সুফী বুখারায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর সম্পর্কে খুব বেশী জানা যায় নি। তবে তিনিই হচ্ছেন তাসাওউফ শাস্ত্রের প্রখ্যাত গ্রন্থ 'কিতাবু তা'আররুফ লিমাজহাব আহলুত তাসাওউফ' এর রচয়িতা। গ্রন্থটি ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন এ. জে. আরবারি। পাঁচটি অধ্যায়ে লেখক সুফিতত্ত্বের উপর মৌলিক আলোচনা করেছেন। এছাড়া তাঁর রচিত 'বাহরুল ফাওয়ায়িদ ফী মা'আনীল আকবার' নামক আরেকটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে ২২০টি হাসীদের উপর ব্যাখ্যা করেছেন হযরত কালাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।[১২৫]

হযরত আবু তালিব মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ৩৮৬ হি.]

তিনি সুফি শাস্ত্রের উপর একটি উন্নতমানের কিতাব রচনা করেন। কিতাবটির নাম 'কুতুবুল কুলুব'। তাসাওউফের উপর এটি আরবী ভাষায় রচিত প্রাথমিক যুগের বই। বইটির উর্দু অনুবাদ হয়েছে।

---

[১২৪] হিশাম কাব্বানি রচিত সালাফীদের বিদআতসমূহের অস্বীকৃতি গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত (কাজী, ১৯৯৬), পৃঃ ৩০৬।

[১২৫] এনসাইক্লোপিডিয়া ইরানিকা।

হিজরী চতুর্থ শতকের শুরু থেকে দশম শতকের শেষ পর্যন্ত তাসাওউফচর্চা

তৃতীয় হিজরী শতকের পর থেকে দশম হিজরী শতক পর্যন্ত বিভিন্ন তরীকার অসংখ্য তাসাওউফের ইমামের আবির্ভাব ঘটে। এ প্রসঙ্গে সকলের জীবন ও কর্মের উপর আলোচনা আদৌ সম্ভব নয়। তাবে তখনকার যুগের বিখ্যাত কয়েকজনের নাম উল্লেখ করছি। এদের প্রায় সকলেই তাসাওউফ শাস্ত্রের উপর গুরুত্বপূর্ণ কিতাবের রচয়িতা। অধিকাংশ এসব শাইখুল মাশাইখের কিতাবাদি আজো পঠিত হচ্ছে দুনিয়ার বিভিন্ন ভাষায়। প্রত্যেকের নামের সাথে তাঁদের মৃত্যুর [হিজরী বা ঈসায়ী) সনও সংযুক্ত করেছি যাতে পাঠকরা তাঁদের স্ব-স্ব যুগ সম্পর্কে অবগত হতে পারেন।

হযরত আবু সাঈদ ইবনে আবুল খায়র [মৃ. ৪৪০ হি.]; হযরত শায়খ আবুল হাসান খিরক্বানী [মৃ. ৪২৫ হি.]; হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত ইমাম গাযযালী [৪৫০ - ৫০৫ হিজরী]; আবুল হাসান আলী ইবনে উসমান জুল্লাবী হুজভেরী [মৃ. ৪৬৪/৪৭০ হিজরী]; হযরত আবু আলী দাক্কাক নিশাপুরী [মৃ. ৪১২]; ইমাম আবুল ক্বাসিম কুশায়িরী [মৃ. ৪৬৫ হি.]; আবু ইসমাঈল আব্দুল্লাহ হাওয়ারী আল-আনসারী [মৃঃ ৪৮১ হিজরী]; আবুল ওয়াফা ইবনে আক্বিল হাম্বলী [মৃঃ ৫১৩ হিজরী]; হযরত শাহ খাজা কুতুবুদ্দীন মাওদুদ চিশতী [মৃ. ৫২৭/৫৭৭]; ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী [৫৪৪ - ৬০৬ হি.]; হযরত আব্দুল কাদির জিলানী [মৃ. ৫৬১ হি]; হযরত শাহ হাজী শরীফ জিন্দানী [মৃ. ৫৮৪]; ইমাম নববী [৬২০ - ৬৭৬ হি]; হযরত শাহজালাল মুজাররদে ইয়ামনী [মৃ. ৬২৩/৭৬৭ হি.]; হযরত শায়খ নাজমুদ্দীন কুবরা [মৃ. ৬২৪]; হযরত আবুল হাসান শাদিলী [মৃ. ৬৫৬ হি.]; সুলতানুল উলামা ঈযজ ইবনে আব্দুস সালাম সুলামী [মৃ. ৬৬০ হি.]; হযরত ফখরুদ্দীন ইরাকী হামাদানী [মৃ. ৬৮৮]; হযরত শাহ খাজা আবু মনসুর উসমান হারুনী [মৃ. ৬৯৭/৬৩৩]; হযরত খাজা শাহ মুঈনুদ্দীন চিশতী আজমিরী সানজারী [মৃ. ৬৩২ হি.]; হযরত শায়খ খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী [মৃ. ৬৩৩ হি.]; হযরত শায়খুল আকবর মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী [মৃ. ৬৩৮ হি.]; হযরত আবু হামিদ বিন আবু বকর ইব্রাহীম ফরিদুদ্দীন আত্তার [মৃ. ৬২৭ হি.]; হযরত ইবনুল ফারিদ মিসরী [মৃ. ৬৩২];

হযরত শিহাবুদ্দীন উমর সুহরাওয়ার্দি [মৃ. ৬৩২]; হযরত শায়খ ফরিদুদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর উজুদাহনী [মৃ. ৬৫৪ হি.]; হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী [মৃ. ৬৭২ হি.]; হযরত সদরউদ্দীন কুনাওয়ী [মৃ. ৬৭৩]; হযরত শাহ আলাউদ্দীন আলী আহমদ কালিয়ারী সাবিরী [মৃ. ৬৯০ হি.]; হযরত ইবনে তাইমিয়্যা [৬৬১ -৭২৮ হি.]; হযরত ইবনে আতাউল্লাহ ইস্কান্দারী [মৃত. ৭০৯ হি.]; হযরত মাহমুদ শাবিস্তারী [মৃ. ৭২০]; শায়খ মুসলেহ উদ্দীন সাদী সিরাজী [১২৯২ ঈ.]; হযরত আবদুর রাজ্জাক কাশানী [মৃ. ৭৩৫ হি.]; হযরত 'আলা উদদৌলা সিমনানী [মৃ. ৭৩৬]; হযরত তাজউদ্দীন সুবকী [৭২৭ - ৭৭১ হি.]; খাজা হাফিজ শিরাজী [মৃ. ৭৯১]; হযরত ইবনে খালদুন [৭৩৩ - ৮০৮ হি.]; ইমাম আবু ইসহাক শাতিবী আল-মালিকী [মৃত. ৭৯০ হি.]; হযরত শাহ নিয়ামতুল্লাহ [মৃ. ৮২০ হি.]; হযরত আবু বকর মুহাম্মদ হাসী হালাবী শাফিঈ [মৃ. ৮৪৮ হি.]; হযরত আবুল ফাত্‌হ মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর আল-মাদানী আল-মারাগী [মৃ. ৮৫৯ হি.]; হযরত আবু খালিদ মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর আল-জিব্রিনী [মৃ. ৮৬০ হি.]; হযরত তক্বীউদ্দীন আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল-উক্ববী [মৃ. ৮৬১ হি.]; হযরত কামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহিদ আস-সিকান্দারী আস-সিওয়াসী [মৃ. ৮৬১ হি.]; হযরত তিক্বাতুদ্দীন আবু আলী মাহমুদ ইবনে আলী আস-সুফী আল-খানিকী [মৃ. ৮৬৫ হি.]; হযরত তক্বী উদ্দীন আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ আল-ক্বালক্বাশান্দী [মৃ. ৮৬৭ হিঃ]; হযরত আবুল ফারায আব্দুর রাহমান ইবনে খালিল আদ-দামেস্কী আস-সুফি [মৃ. ৮৬৯ হি.]; হযরত জাকি উদ্দিন আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল-আনসারী আল-খাযরাযী আস-সাদী আল-মুক্বরী আস-সুফী [মৃ. ৮৭৫ হি.]; হযরত আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আলী আল-হুসাইনী আল-ক্বাহিরী আশ-শাফিঈ আস-সুফী [মৃ. ৮৭৬ হি.]; হযরত নূরুদ্দীন আবদুর রহমান জামী [মৃ. ৮৯৮ হি.]; হযরত ইমাম শাকাওয়ী [মৃ. ৯০২ হি.]; হযরত বদরুউদ্দীন হোসাইন ইবনে সিদ্দীক আল-ইয়েমনী আল-আজাল [মৃ. ৯০৩ হি.]; হযরত জালালুদ্দিন সুয়ুতী [৮৪৯ - ৯১১ হি.]; হযরত শাহ আবদুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী [মৃ. ৯২৪ হি.]; হযরত জাকারিয়্যা ইবনে মুহাম্মদ আনসারী [মৃ. ৯২৬ হি.]; হযরত আব্দুল ওয়াহহাব শারানী [মৃ. ৯৭৩ হি.]; হযরত ইবনে হাজর আল-হাইতামী [মৃ. ৯৭৪ হি.]; হযরত শাহ জালালুদ্দীন জলিল তানেশ্বরী [মৃ. ৯৮৯ হি.] প্রমুখ রাহামতুল্লাহি আলাইহিম।

হিজরী দশম শতকের শুরু থেকে চতুর্দশ শতক পর্যন্ত শরীয়ত ও তরীকতের মাশাইখে কিরাম

শেষের এই যুগেও অসংখ্য উলামা, মাশাইখ ও তরীকতের শায়খের জন্ম হয়েছে। দ্বীনকে পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে তারাই পৌঁছে দেন। এরা সকলে ছিলেন, মুকাল্লিদ ও তরীকতপন্থী। অনেকে ছিলেন উচ্চ পর্যায়ের ওলী। এ যুগের নক্ষত্রসদৃশ আমাদের পূর্বসুরী মহাত্মনদের মুবারক কয়েকটি মাত্র নাম তাঁদের মৃত্যু তারিখসহ তুলে ধরছি।

হযরত মুল্লা আলী ক্বারী [মৃ. ১০১৪ হি.]; হযরত ইবনে আবিদীন [১১৯৮ - ১২৫২ হি.]; ইমামে রব্বানী হযরত আহমদ সিরহিন্দি মুজাদ্দিদে আলফে সানী [৯৭১ - ১০৩৪ হি.]; হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী [১৭০২ - ১৭৬২ ঈ.]; হযরত শাহ আব্দুল আজিজ দেহলভী [১১৫৭ - ১২৩৯ হি,]; হযরত সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ [১৭৮৬ - ১৮৩১ ঈ.]; হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী [১২৩১ - ১৩১৫ হি,]; হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী [১৮২৯-১৯০৮ ঈ.]; হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী [১৮৫১-১৯২০ ঈ.]; হযরত মাওলানা কাসিম নানুতুরী [১৮৩২/৩৩ - ১৮৮০ ঈ.]; হাকিমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী [১২৮০ - ১৩৬২ হিজরী]; হযরত আন্‌ওয়ার শাহ কাশ্মীরী [১২৯৮ হি. - ১৩৫২ হি.]; শাইখুল ইসলাম সাইয়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী [১২৯৬ - ১৩৭৭ হিজরী]; হযরত মাওলানা আবদুল মতিন চৌধুরী শায়খে ফুলবাড়ী [১৯১৫-১৯৯০ ঈ], হযরত মাওলানা বদরুল আলম শায়খে রেঙ্গা [১৩১৯ - ১৩৯১ বাংলা]; কুতবে যামান হযরত মাওলানা আমীনুদ্দীন শায়খে কাতিয়া [১৯১৪ - ২০১০ ঈ,]; হযরত মাওলানা আবদুল হক শায়খে গাজিনগরী [১৯২৮ - ২০০৮ ঈ.]; হযরত মাওলানা নূরুদ্দীন গহরপুরী [মৃ. ২০০৫ ঈ.] রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমুখ।

৯. তারা খুব সহজে অন্য মুসলমানদেরকে 'কাফির' এবং 'মুশরিক' হিসাবে ঘোষণা দেয়। একে আরবীতে 'তাকফির' বলে, যা ইসলামে নিষিদ্ধ।[১২৬]

তাদের এই ভ্রান্তির খণ্ডন: কাফির ঐ ব্যক্তিকেই বলা যায় বা কাফির বলে ফাতওয়া দেওয়া যায়, যে সত্যিকার অর্থে মুসলমান নয়। এছাড়া যারা প্রকৃতই কাফির হয়ে গেছে বলে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি পাওয়া যায়, তাকে অবশ্যই ফুকাহায়ে কিরাম কাফির বলে ফাতওয়া দেবেন। এ ব্যাপারে কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত হলো:

أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللّٰهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا

-"তোমরা কি তাদেরকে পথ-প্রদর্শন করতে চাও, যাদেরকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেছেন? আল্লাহ যাকে পথভ্রান্ত করেন, তুমি তার জন্য কোন পথ পাবে না।" [সূরা নিসা : ৮৮]

কিন্তু যদি কেউ প্রকৃতই কাফির না হয়ে থাকে তাহলে তাকে 'কাফির', 'মুশরিক' বলে আখ্যায়িত করা কবিরা গুনাহ। এরূপ ফাতওয়া প্রদানকারী নিজেই কাফির বলে সাব্যস্ত হবে। এর কারণ হলো, যেটা কুফরী নয় বরং সঠিক ইসলামী ঈমান-আমল, সেটাকে সে কুফরী বলেছে। আর সঠিক ইসলাম-ঈমানকে 'কুফর' আখ্যায়িত করা কুফরীই বটে। কাজেই কাউকে কাফির বলে ফাতওয়া প্রদানে সংযত থাকা উচিৎ, এ ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করা সঠিক নয়।[১২৭]

যে কাফির নয়, তাকে কাফির বলে আখ্যায়িত করার ক্ষেত্রে কুরআনে পাকে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে:

إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا

[১২৬] তারা অসংখ্য লেখা, ইন্টারনেট সাইট ও বক্তৃতায় মুকাল্লিদদের 'কাফির', 'মুশরিক' ও 'বিদআতী' বলে গালি দেয়।
[১২৭] ইসলামী আক্বীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ, পৃ: ২১১।

-"যে তোমাদেরকে সালাম করে তাকে বলো না যে, তুমি মুসলমান নও"। [সূরা নিসা : ৯৪]

পবিত্র হাদিসেও অনুরূপ নিষেধাজ্ঞা এসেছে। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُا قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ

অর্থাৎ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে দীনার রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, আমি ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "যে তার কোন মুসলমান ভাইকে বলবে, হে কাফির! তাহলে এ ক্ষেত্রে তাদের দু'জনের একজন এ কথার পাত্র হবে- যাকে বলা হয়েছে যদি সে সত্যিকার কাফির হয়, তাহলে তো সেটাই সঠিক। অন্যথায় কথাটি অভিযোগকারীর দিকে ফিরে আসবে"। [মুসলিম]

মাওলানা মুহাম্মদ হেমায়েত উদ্দীন তাঁর 'ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ' গ্রন্থে বলেছেন: কোন মুসলমানের কোন কথা বা কাজ কুফ্‌র কি-না এ ব্যাপারে উভয় দিকের সম্ভাবনা থাকলে তাকে সেই কথা বা কাজের ভিত্তিতে কাফির বলে ফাতওয়া দেওয়া যাবে না, এমনকি কুফরের দিকটার সম্ভাবনা বেশী থাকলেও। এমনকি সেটা কুফর হওয়ার সম্ভাবনা ৯৯ ভাগ আর কুফর না হওয়ার সম্ভাবনা ১ ভাগ হলেও।[১২৮]

মুসলমান কাউকে 'কাফির' বলা যে মারাত্মক পাপের কাজ এবং এর দ্বারা অভিযোগকারী নিজেই কুফরের দিকে চলে যেতে পারে তার দলিল-প্রমাণ আমরা উপরোক্ত আলোচনায়া তুলে ধরলাম। আমরা আশা করি, আমাদের গায়র মুকাল্লিদ 'সালাফি' নামধারী ভাইগণ তাকফিরের আমল বর্জন করবেন এবং নিজেদের ঈমান সংরক্ষণের ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন।

[১২৮] ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ, পৃ: ২১১

১০. *তারা কুরআন-হাদিসের ব্যাখ্যা কিংবা গবেষণায় বিশ্বাসী নয়। যে কোন মানুষ মূল 'মুত্ন' অনূদিত ভাষায় পাঠ করেও দ্বীনি সিদ্ধান্ত নিতে পারে- এরূপ ধারণার প্রতি তারা বিশ্বাসী।*[১২৯]

তাদের এই অযৌক্তিক ধারণার খণ্ডন: পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফ গবেষণা ও সঠিকভাবে বুঝার চেষ্টা ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই হয়ে আসছে। গায়র মুকাল্লিদ আমাদের সমসাময়িক 'সালাফি' ভাইগণই এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম এ যুগে এসে বলছেন, কুরআনের তাফসীর ও হাদিসের শরাহ ইত্যাদি দ্বারা দ্বীন বুঝা যায় না! আমরা তাদের এই ধারণা কুরআন-হাদিস ও যুক্তির নিরিখে খণ্ডন করবো ইনশাল্লাহ।

কুরআন গবেষণার নির্দেশ কুরআনেই বিদ্যমান: পবিত্র কুরআন আল্লাহর বাণী। অসীম জ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা মহাসত্যের এই জ্ঞানভাণ্ডার থেকে কিয়ামত পর্যন্ত মানুষ উপকৃত হবেন। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু অল্প কথায় গভীর প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় কুরআনে উপস্থাপন করেছেন রাব্বুল আলামীন। সুতরাং সুচিন্তিত প্রণালীবদ্ধ উপায়ে কুরআনের আয়াতমালা গভীরভাবে অধ্যয়ন করে উপলব্ধির চেষ্টা শুধু বৈধ নয়- কুরআনের অন্তর্নিহিত অর্থ উদঘাটনের একমাত্র পথ। এ কারণেই স্বয়ং রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকেই কুরআন গবেষণার কাজ শুরু হয়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই কুরআন শরীফের বিভিন্ন আয়াতের ব্যাখ্য করেছেন। সিহা সিত্তার হাদিস সংকলকরা নিজেদের গ্রন্থে 'তাফসীর' অধ্যায় সংযুক্ত করেছেন। আর সাহাবাদের মধ্যে রাইসুল মুফাস্‌সিরীন নামে খ্যাত প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা যখন কুরআনের ব্যাখ্যা করা শুরু করেন, তখন কেউ তাকে এটা করতে নিষেধও করেন নি।

হযরত সাহল বিন আবদুল্লাহ তুশতারী [মৃ. ২৮৩ হি.] রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রাথমিক যুগের তাফসীরবিদ ছিলেন। তাঁর

[১২৯]বিন বায, আলবানী, উসাইমিন প্রমুখ সালাফি আলিমদের ফাতওয়ার কিতাবে এসব কথা আছে।

চার মাজহাবের আলো

প্রণীত 'তাফসীরুল কুরআনুল আজীম', পরবর্তীতে 'তাফসীরুল তুশতারী' নামে খ্যাত কিতাবের ভূমিকায় বলেন: "কুরআনে প্রত্যেক আয়াতের অর্থ চারটি স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত: এগুলো হলো জাহির (বাইরের), বাতিন (অভ্যন্তরীণ), হাদ্দ (সীমা) এবং মাতলা' (স্বচ্ছতা)। বাইরের স্তর হলো কুরআন তিলাওয়াত ও অভ্যন্তরীণ স্তর হলো এর অর্থ অনুধাবন (ফাহম)। হাদ্দ দ্বারা হালাল ও হারামের সংজ্ঞা এসেছে। আর স্বচ্ছতা হলো হৃদয়ে বুঝার উচ্চতার মাত্রা (ইশরাফ) যার মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে যা বলার ইচ্ছা তা অনুধাবন সম্ভব হয়। কুরআনের প্রকাশ্য জ্ঞান সবার জন্য অনুধাবনযোগ্য। অপরদিকে এর অভ্যন্তরীণ অর্থ বুঝা এবং যা বুঝানোর ইচ্ছা তা বুঝার ক্ষমতা নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তির জন্য খাস। তাই আল্লাহ আয্‌জা ওয়াজাল্লাহ ইরশাদ করেন:

لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا

-"এ লোকদের কী হলো যে, তারা কোনো শব্দ বুঝতে পরলো না?" [৪:৭৮]

অর্থাৎ, "যা তাদেরকে বলা হচ্ছে তা তারা বুঝে না।"[১৩০]

সুতরাং বুঝাই যাচ্ছে কুরআন শরীফের ব্যাখ্যা ছাড়া এর সঠিক অর্থ বুঝা আদৌ সম্ভব নয়। যারা এর ব্যাখ্যা দেবেন তারাই হলেন নির্বাচিত 'খাস' ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত। এসব খাস ব্যক্তি ছাড়া অপর কারো পক্ষে কুরআন শরীফের ব্যাখ্যা বা তাফসীর করা বৈধ নয়।

তাফসীর [تفسير] শব্দটি আরবী ক্রিয়াপদ ফাস্‌সারা [فسّر] মূল থেকে উদ্বুদ্ধ। এর অর্থ বুঝানো, সুচিন্তিত উপায়ে পরিষ্কার করা, উন্মুক্ত করা। ফিকহী ক্ষেত্রে তাফসীর শব্দের অর্থ হলো কুরআনে যা বলা হয়েছে তা বুঝা ও আল্লাহর ইচ্ছাকে উন্মোচন করা। এজন্য প্রয়োজন আরবী ভাষা ও তাফসীরবিদের জ্ঞান-প্রজ্ঞা। উলামায়ে কিরাম তাফসীরবিদের যোগ্যতার কয়েকটি শর্ত দিয়েছেন। এগুলো হলো:

[১৩০] তাফসীরে তুশতারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইংরেজী অনুবাদ, ২০১১, রয়েল আলাল বাইআত ইন্সটিটিউট ফর ইসলামিক থট, আম্মান, জর্দান।

১. তাঁর আক্বীদা পূর্ণাঙ্গ শরীয়তসম্মত হতে হবে।

২. তাঁকে আরবী ভাষার উপর পূর্ণাঙ্গ দক্ষতা অর্জন করতে হবে। যেমন: সরফ, নাহু, বালাগাত ইত্যাদির উপর পূর্ণ জ্ঞান থাকতে হবে।

৩. কুরআনের সঙ্গে সম্পৃক্ত অন্যান্য জ্ঞানের উপর দক্ষতা থাকতে হবে। যেমন 'ইলমে রিওয়াইয়া'।

৪. সঠিক বুঝ থাকতে হবে।

৫. নিজের মনগড়া মতামত থেকে বিরত থাকা।

৬. কুরআনের তাফসীর কুরআন দ্বারা শুরু করা।

৭. হাদিস শরীফের ব্যাখ্যার প্রতি আস্থাশীল থাকা।

৮. সাহাবাদের অভিমতের উপর অগ্রাধিকার প্রদান।

৯. তাবি'ঈদের অভিমতকে গুরুত্বসহ বিবেচনা করা।

১০. অপর তাফসীরবিদ ও ফকীহদের মতামত বিবেচনা করা।

১১. তাঁর ইল্‌ম ও জ্ঞানার্জনের সনদ হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত থাকতে হবে। অর্থাৎ, উস্তাদের উস্তাদ হয়ে সিলসিলা মুতাবিক নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছতে হবে। কেউ সনদহীন আলিম হয়ে 'নিজে নিজে কিতাব অধ্যয়ন করে' তাফসীর করতে পারবেন না।

সুতরাং তাফসীর একটি উচ্চ পর্যায়ের গবেষণা। এজন্য সঠিক জ্ঞান-প্রজ্ঞার প্রয়োজন। তা-ই যে কোনো ব্যক্তি তাফসীরের যোগ্য নন। তিনি নিজেকে যতো বড়ো জ্ঞানী বা সাহিত্যিক ভাবুন না কেনো। যেমন, মওদুদী সাহেব উপরোক্ত ১০টির মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত জ্ঞান না রেখে এবং খাস করে আরবী ভাষার উপর খুব অল্প জ্ঞান থাকাসত্ত্বেও তাফসীর করে গেছেন। ফলে তার পুরো তাফসীর উলামায়ে কিরামের নিকট গ্রহণযোগ্য হয় নি।

হাদিস শরীফেও তাফসীরের গুরুত্ব বিরাট। স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পবিত্র বাণী, আমল, নির্দেশ

ইত্যাদির মাধ্যমে কুরআন শরীফেরই ব্যাখ্যা করেছেন। হাদিস শরীফের গ্রন্থে তাই 'তাফসীরুল কুরআন' অধ্যায় সংযুক্ত করেছেন ইমাম বুখারীসহ বিভিন্ন হাদিস সংকলক মহাত্মন মুহাদ্দিসীনে কিরাম। 'উলূমুল কুরআন' গ্রন্থের লেখক মাওলানা আহমদ ভনডেন্‌ফর বলেন:

কুরআনের সর্বোত্তম তাফসীর হলো কুরআন দ্বারা কুরআনের ব্যাখ্যা। পরবর্তী স্তরের উত্তম তাফসীর হলো হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক ব্যাখ্যা। ইমাম শাফিঈ বলেছেন, তিনি [নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কুরআন থেকে যা বুঝেছেন তার উপরই আমল করেছেন। যদি কুরআনের কোনো বিষয়ের ব্যাখ্যা কুরআন ও হাদিসে না পাওয়া যায় তাহলে সাহাবায়ে কিরামের ব্যাখ্যা ও আমলের দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। আর এখানেও যদি কোন দিকনির্দেশনা না মিলে তাহলে তাবিঈনদের ব্যাখ্যা ও আমলের প্রতি নজর দেওয়া চাই।[১৩১]

সুতরাং বুঝাই যাচ্ছে সত্যিকার তাফসীর দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের মৌলিক উপায়-অবলম্বন। কিন্তু যেমনে-তেমনে মনগড়া তাফসীর করলে চলবে না।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তাফসীর: ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রত্যেক সূরার বিভিন্ন আয়াতের তাফসীর কিভাবে রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন তার দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাস জিব্রাঈল আলাহিস্‌সালামকেও অস্পষ্ট কোনো আয়াতের ব্যাখ্যা বলে দিতে অনুরোধ করেছেন। কোনো কোনো সাহাবায়ে কিরাম আয়াতের ব্যাখ্যার জন্য নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আবদারও করেছেন। যেমন নিম্নের আয়াতাংশটি:

---

[১৩১] আহমদ ভনডেন্‌ফর প্রণীত 'উলূমুল কুরআন' দ্রঃ।

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

-"আর পানাহার কর যতক্ষণ না কালো রেখা থেকে ভোরের শুভ্র রেখা পরিষ্কার দেখা যায়"। [বাক্বারাহ : ১৮৭]

সাহাবায়ে কিরাম এর ব্যাখ্যার জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করেছেন:

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا { الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ } أَهُمَا الْخَيْطَانِ قَالَ إِنَّكَ لَعَرِيضُ الْقَفَا إِنْ أَبْصَرْتَ الْخَيْطَيْنِ ثُمَّ قَالَ لَا بَلْ هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ

-'আদি বিন হাতিম রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সাদা রেখা কালোটি থেকে স্পষ্ট কথাটির অর্থ কি? এগুলো কি দু'টি রেখা? তিনি জবাব দিলেন: "তুমি বুদ্ধিমান নও, যদি তুমি উভয় রেখা পর্যবেক্ষণ করে থাকো।" এরপর আরো বললেন: "না, এটার অর্থ হলো রাতের অন্ধকার এবং দিনের স্বচ্ছতা"। [বুখারী]

সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যারা তাফসীর করেছেন: নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে তাফসীর করেছেন তার প্রমাণ উপরে সুস্পষ্ট হয়েছে। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে অনেকে ছিলেন যাঁরা মুফাস্‌সীর হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এদের মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দীক [৫৭৩ - ৬৩৪ ঈ.], হযরত উমর ইবনে খাত্তাব [৪৫ হি.পূ. - ২৩ হি. / ৫৭৯-৬৪৪ ঈ.)], হযরত উসমান ইবনে আফ্‌ফান [৪৭ হি.পূ - ৩৫ হি. / ৫৭৭-৬৫৬ ঈ.] এবং হযরত আলী ইবনে আবুতালিব [২২/১৬ হি.পূ. - ৪০ হি. / (৬০০/৬০১/৬০৭-৬৬১ ঈ.)] রাদ্বিআল্লাহু আনহুম (এরা অবশ্য কম তাফসীর করেছেন); হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ [মৃ. ৩২ হিজরী], হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস [৩ হি.পূ-৬৮ হি. / ৬১৮/৬১৯-৬৮৭ ঈ.], হযরত উবাই বিন কা'ব [মৃ. ২২ হি. / ৬৪২/৪৩ ঈ.], হযরত জায়িদ বিন তাবিত [৬১০-৬৬০ ঈ.], হযরত

আবু মূসা আশ'আরী [মৃ. ৬৬২/৬৭২] এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবায়ির [৬২৪-৬৯২ ঈ.] রাদ্বিআল্লাহু আনহুমের নাম এখানে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা: তাফসীরের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। তাঁকে 'তরজমানুল কুরআন' হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এছাড়া তিনি 'রাইসুল মুফাস্‌সিরীন' নামেও খ্যাত। তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একান্ত আপনজন ছিলেন। তাঁর পিতা হযরত আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আপন চাচা। এছাড়া উম্মুল মু'মিনীন হযরত মাইমুনা রাদ্বিআল্লাহু আনহা ছিলেন তাঁর খালা [মায়ের বোন]। সুতরাং নবী-পরিবারের একজন একান্ত ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি হিসাবে হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু খুব কাছে থেকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। কথিত আছে তিনি হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস্‌সালামকে দু'বার স্বচক্ষে দেখেছেন। তাফসীর সম্পর্কে তিনি পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। এছাড়া 'ইলমুত তাফসীর' এর মৌলিক নিয়ম-কানুনও তাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই নিয়ম-পদ্ধতি আজ পর্যন্ত মুফাস্‌সিরীনে কিরাম অনুসরণ করে আসছেন। এর একটি দৃষ্টান্ত হলো: কুরআনের কোনো অস্পষ্ট শব্দের অর্থ ইসলামপূর্ব যুগের সাহিত্য-কবিতা থেকে খোঁজ করে বের করতে হবে। ইমাম সুয়ূতী এরূপ শব্দের একটি দীর্ঘ তালিকা তাঁর 'ইতক্বান' কিতাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু কর্তৃক সত্যায়িত ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা কর্তৃক ব্যাখ্যায়িত একটি দৃষ্টান্ত হলো নীচের আয়াতটি:

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

-"তখন আপনি আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন, নিশ্চয় তিনি ক্ষমাকারী।" [১১০: ৩]

ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, “উমর [রাদ্বিআল্লাহু আনহু] আমাকে কয়েকজন বৃদ্ধের সাথে বসতে বলতেন, যারা ছিলেন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী। তাদের কেউ কেউ এটা পছন্দ না করে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে বললেন, উমর! আপনি কেনো এই ছেলেটিকে আমাদের সাথে বসার জন্য নিয়ে এসেছেন, আমাদেরও তো তার মতো পুত্রাদি আছে?

হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন, এর কারণ আপনারা [ধর্মীয় ক্ষেত্রে] তার মর্যাদা সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন।

একদিন উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু আমাকে ডেকে পাঠালেন ও উক্ত লোকদের মজলিসে বসালেন। আর আমি মনে করলাম, তিনি আমাকে ডেকেছেন [আমার ধর্মজ্ঞান] তাদেরকে দেখানোর জন্য। উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু তখন আমার উপস্থিতিতে তাঁদেরকে প্রশ্ন করলেন, আপনারা নিম্নের আয়াতের ব্যাখ্যায় কি বলেন?

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ

-“যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়।” [১১০:১]।

কেউ কেউ জবাব দিলেন: ‘যখন আল্লাহর সাহায্য এবং (মক্কা) বিজয় আসে তখন আমাদেরকে আল্লাহর প্রশংসা করা ও তাঁর ক্ষমা প্রার্থনার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।’ অন্যরা নীরব থাকলেন, কিছুই বললেন না। এরপর উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু আমাকে জিজ্ঞেস করলেন: ‘হে ইবনে আব্বাস! তুমিও কি একই কথা বলছো?’। আমি জবাব দিলাম, না! তিনি জিজ্ঞেস করলেন: ‘তাহলে তুমি কি বলছো?’ বললাম: ‘এটা ছিলো আল্লাহর রাসূলের মৃত্যু আসন্ন হওয়ার ইশারা, যা আল্লাহ তা’আলা তাঁকে জানিয়েছিলেন। তিনি ইরশাদ করেন:

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

-“যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়। এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, তখন আপনি আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন, নিশ্চয় তিনি ক্ষমাকারী।”। [১১০:১-৩]

একথা শ্রবণ করে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন: ‘যাকিছু তুমি বলেছো আমিও এ ব্যাপারে এছাড়া আর কিছু জানি না’।”[১৩২]

তাবিঈন কর্তৃক তাফসীর: সাহাবায়ে কিরামের পর তাবিঈদের কর্তৃক তাফসীর শুরু হয়। এসময় তিনটি স্থানে তাফসীর হয়েছিল:

১. মক্কা মুকারমা। ২. মদীনা মুনওয়ারা। ৩. ইরাক্ব অঞ্চল।

মক্কা শরীফে যাঁরা তাফসীর করেন তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ দু’জন হলেন মুজাহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১০৪ হি.] এবং ইকরিমা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১০৭ হি.]। এরা উভয়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে তাফসীর শাস্ত্রের উপর জ্ঞানার্জন করেন।

মদীনা শরীফে যাঁরা তাফসীর শাস্ত্রের উপর গবেষণা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ছিলেন হযরত মুহাম্মদ বিন কা’ব ক্বারজি [মৃ. ১১৭ হি.], হযরত আবুল ’আলিয়া রিয়াহী [মৃ. ৯০ হি.] এবং হযরত জায়িদ বিন আসলাম [মৃ. ১৩০ হি.] রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম। মদীনার তাবিঈ মুফাস্‌সিরীনে কিরাম সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুমের নিকট থেকে তাফসীর শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করেছিলেন। বিশেষ করে হযরত উবাই বিন কা’ব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নিকট থেকে তাঁরা উপকৃত হন।

ইরাকী তাবিঈ মুফাস্‌সিরীনে কিরামদের প্রধান শিক্ষক ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু। ইরাকের বসরা ও কুফা শহরে এসব মুফাস্‌সিরীনে কিরাম গবেষণা করেন। এদের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ক’জন হলেন হযরত হাসান বসরী [মৃ. ১২১ হি.],

---

[১৩২] তাফসীরে ইবনে আব্বাস।

হযরত মাসরুক বিন 'আজদা [মৃ. ৬৩ হি.] এবং হযরত ইব্রাহীম নাখাওয়ী [মৃ. ৯৫ হি.] রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম।

আমরা প্রমাণ করলাম, তাফসীরুল কুরআন দ্বীনকে সঠিকভাবে বুঝার জন্য জরুরী। আর যেহেতু কুরআন শরীফের ব্যাখ্যা হলো হাদিস শরীফ। কাজেই হাদিস শরীফের ব্যাখ্যাও জরুরী। মূল মুত্ন থেকে যে কোনো ব্যক্তি দ্বীনকে বুঝতে সক্ষম হবে এবং পূর্ণাঙ্গ আমলী জিন্দেগী গড়ে তুলবে আল্লাহর ইচ্ছা ও সন্তুষ্টি মুতাবিক, তার কোনো গ্যারান্টি নেই। এর কারণ হলো হাদিস শরীফের ক্ষেত্রে অনেক আপাতদৃষ্টিতে স্ববিরোধিতা পরিলক্ষিত হয়। একই আমলের উপর বিপরীতধর্মী হাদিস পাওয়া যায়। কোনো কোনো হাদিস অপরটি দ্বারা রহিত হয়েছে। হাদিস সহীহ হওয়ার স্তর আছে। হাদিসের মান, শক্তি, দুর্বলতা ইত্যাদিও আছে। এসব ব্যাপার সঠিকভাবে না জেনে যে কোনো হাদিসের উপর আমল করা মারাত্মক ভ্রম। একমাত্র উচ্চ পর্যায়ের ফকীহ, মুহাদ্দিস ও মুফতি সাহেবান নির্ধারণ করতে পারেন কোন্ হাদিসের উপর আমল করা নিরাপদ ও আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুকূলে। সুতরাং, হাদিস শরীফের ব্যাখ্যা ঠিক নয়- এরূপ মন্তব্য মূলত বুঝের অভাবে মানুষ করে থাকে। ওহীর জ্ঞানের মূল মুতনের ব্যাখ্যা ছাড়া দ্বীনকে সঠিকভাবে বুঝা এবং আল্লাহর ইচ্ছা ও সন্তুষ্টি মুতাবিক সঠিক আমলী জিন্দেগী অতিবাহিত করা আদৌ সম্ভব নয়। আর ওহীর জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত শুধু কুরআন শরীফ নয়- হাদিস শরীফও। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাঁর পছন্দসই দ্বীন, ইসলামকে বুঝার ও সঠিকভাবে আমলের তাওফিক দিন।

১১. *আলবানি স্বরচিত ৫টি কিতাবে মন্তব্য পেশ করেছেন, মসজিদে নববীর সবুজ গম্বুজ ভেঙ্গে ফেলতে হবে। তিনি আরো পরামর্শ দিয়েছেন, মসজিদের ভেতর থেকে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর দু'জন বিখ্যাত সাহাবীদ্বয়ের কবরগুলো তুলে বাইরে নিয়ে যাওয়া উচিত। অনুরূপ মতামত পেশ করেছেন সালাফিদের আরেক কথিত ইমাম উসাইমিন।*[১৩৩]

তার এ বিভ্রান্তিমূলক মন্তব্যের জবাব: আমরা আলবানির এরূপ বিভ্রান্তিমূলক মন্তব্যে শঙ্কিত! রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও শাইখাইন রাদ্বিআল্লাহু আনহুমার মুবারক কবরগুলো যেখানে আছে সেখানে থাকতে আলবানি ও উসাইমিনের এতো মাথাব্যথা কেন? এরূপ মন্তব্য তো ১৪০০ বৎসরের মধ্যেও কোন আহলে সুন্নাত ওয়ালা জামাআতের অন্তর্ভুক্ত মুসলমান করেছেন বলে প্রমাণ নেই। তাহলে ব্যাপারটি কি?

ব্যাপার হলো, তারা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর শরীফ জিয়ারত ও তাঁর নিকটস্থ বিখ্যাত সাহাবাদ্বয়, অর্থাৎ আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু ও উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর কবর মানুষ জিয়ারত করুক, তা পছন্দ করেন না। অবশ্য রাফেজীরাও [শিয়ারা] তা-ই বলে। কিন্তু আলবানি কি রাফেজীদের কেউ ছিলেন? একমাত্র আল্লাহই সর্বজ্ঞাত।

আলবানি এরূপ উদ্ভট ও 'অমুসলিমের' মতো মন্তব্য দ্বারা প্রিয় নবীজী ও তাঁর সর্বাপেক্ষা কাছের দু'জন বড়ো সাহাবার মান-মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছেন- নাউযুবিল্লাহ! এ কারণেই তার এই মন্তব্য আমাদেরকে সর্বাধিক পীড়া দিয়েছে। এ ধরনের মন্তব্য যে করে সে কখনো মুসলমানের শুভাকাঙ্ক্ষী হতে পারে না। এটুকু বলার পর তার এ মন্তব্য যে ভ্রান্ত তা এখন প্রমাণ করার প্রয়াস পাচ্ছি।

---

[১৩৩] তার প্রণীত 'আহকামুল জানাইয ওয়া বিদা'উহা' [أحكام الجنائز وبدعها], 'তালখিস আহকামাল জানাইয' [تلخيص أحكام الجنائز], 'তাহজিরাস সাজিদ' [تحذير الساجد], 'হিজ্জাতুন নাবী' এবং 'মানাসিকাল হাজ্জ ওয়াল উমরা'।

হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই তাঁর কবর কোথায় হবে ইঙ্গিতে বলে দিয়েছিলেন: প্রথমেই আমরা সিরাতগ্রন্থ থেকে তাঁকে দাফনের ইতিহাস তুলে ধরছি।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রণীত সীরাত বিশ্বকোষে আছে: "রাসূলে কারীম (স)-এর গোসল ও কাফন শেষ হওয়ার পর প্রশ্ন উঠিল, দাফন কোথায় করিতে হইবে? মুহাজিরদের একদল বলিলেন, রাসূলে কারীম (স)-কে মক্কা শরীফে দাফন করা হউক। কারণ পবিত্র মক্কা নগরী তাঁহার জন্মভূমি। সেখানে তাঁহার অনেক আত্মীয়-স্বজনকে দাফন করা হইয়াছে। কেহ কেহ বলিলেন, রাসূলে করীম (স)-কে বাইতুল মুকাদ্দাসে দাফন করা হউক। কারণ সেখানে তাঁহার পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের অনেককেই দাফন করা হইয়াছে। সাহাবায়ে কিরামের অধিকাংশই এই প্রস্তাব দু'টি প্রত্যাখ্যান করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, না, বরং তাঁহাকে মদীনাতেই দাফন করা উচিত। কেননা মক্কার কাফিরদের অত্যাচার-নির্যাতনে অতিষ্ঠ হইয়া তিনি মদীনায় হিজরত করিয়াছেন, মদীনাবাসী তাঁহাকে সর্বাত্মক সাহায্য-সহযোগিতা করিয়াছে। তিনি তাঁহার জীবদ্দশায় মদীনাবাসীকে অত্যন্ত আপনজন হিসাবে দেখিয়াছেন, কজেই মদীনাতেই তাঁহাকে দাফন করা উচিত। খলীফাতুল মুসলিমীন [তখন তিনি খলীফা নির্বাচিত হয়েছিলেন] হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) পরামর্শ সভার নিময়-শৃংখলা অনুসারে নীরবে সকলের প্রস্তাব শুনিলেন। তিনি বলিলেন, হে লোকসকল! আমি রাসূলে কারীম (স)-কে বলিতে শুনিয়াছি, "নবী-রাসূলগণ যেই স্থানে ইন্তিকাল করেন, সেই স্থানেই তাঁহাদেরকে দাফন করা হয় (সুনানে তিরমিযী, ১খ., পৃ. ১৯৮)। রাসূলুল্লাহ (স)-এর কবর মুসলিম জাহানে 'রওযা মুবারক' নামে প্রসিদ্ধ।

সিদ্দীকে আকবার (রা)-এর হাদীছ শুনিবার পর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হইল যে, রাসূলে কারীম (স)-কে তাঁহার হুজরাতেই দাফন করা হইবে (আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, আবুল হাসান আলী নদবী, পৃ. ৩৫৬)।"[১৩৪]

[১৩৪] ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, 'সীরাত বিশ্বকোষ', ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃ: ৬২।

এছাড়া সহীহ হাদীস শরীফে আছে:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ

-"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আমার ঘর ও মিম্বরের মাঝখানে বেহেশতের বাগান অবস্থিত।" [বুখারী]

উক্ত বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হলো, রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং নিজেই তাঁর কবরের স্থান নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদিস শরীফ ও রিয়াজুল জান্নাত সম্পর্কিত হাদিস এর সুস্পষ্ট প্রমাণ। এছাড়া কবর মুবারক কোথায় হবে তা নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে পরামর্শ সভাও হয়েছিল। সকলে যার তার মতামত পেশ করার পর আবু বকর রাদ্বিল্লাহু আনহুর হাদিস শ্রবণ করে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্তে পৌঁছেন। অর্থাৎ তাঁদের মধ্যে এ ব্যাপারে ইজমা হয়েছিল। আর সাহাবায়ে কিরামের ইজমার বিরোধিতা ও ফাতওয়াবাজি একমাত্র আল্লাহর দুশমন ছাড়া কেউ করতে পরে না। আমরা আশা করবো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর শরীফ কেন যেখানে আছে, সেখানে স্থাপিত হয়েছিল, এ ব্যাপারে কারো মনে আর কোন প্রশ্ন থাকবে না।

অনুরূপ শাইখাইন [হযরত আবু বকর ও হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে শাইখাইন বলা হয়] রাদ্বিআল্লাহু আনহুমার কবরগুলোও কোথায় হবে, তা সাহাবায়ে কিরামের সর্বসম্মতিক্রমে নির্ধারণ করা হয়েছিল। এবার আমরা এর প্রমাণও তুলে ধরছি।

হযরত ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন:

أما أبو بكر رضى الله عنه فمن كراماته أنه لما حملت جنازته إلى باب قبر النبى صلى الله عليه وسلم ونودى السلام عليك يا رسول الله هذا أبو بكر بالباب فإذا الباب قد انفتح وإذا بهاتف يهتف من القبر ادخلوا الحبيب إلى الحبيب

"সাইয়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু তাঁর শেষ আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করতে যেয়ে বলেন, 'আমার জানাযা [লাশ] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক কবরের কাছে নিয়ে যাবে। এরপর তোমরা বলবে, আস্‌সালামু আলাইকুম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবু বকর আপনার দরবারে উপস্থিত।' সাহাবায়ে কিরাম তাঁর ইচ্ছা মুতাবিক লাশ নিয়ে হুজরা শরীফের দরজায় পৌঁছলেন ও সালাম জানালেন। দরজা এমনিতেই খুলে গেল। এরপর একটি গায়েবী আওয়াজ কবর শরীফ থেকে শুনা গেল, "উদখুলুল হাবীব ইলা হাবীব!" [অর্থাৎ, বন্ধুকে তাঁর বন্ধুর নিকট নিয়ে আসো।][১৩৫]

উক্ত ঘটনা থেকে প্রমাণিত হলো, সিদ্দীকে আকবর রাদ্বিআল্লাহু আনহু নিজেই হুজরা শরীফে তাঁকে দাফন করার জন্য ওসিয়ত করেছিলেন। এছাড়া সিদ্ধান্ত হওয়ার পর কেউ এর বিরোধিতা করেন নি। সকল সাহাবাদের মধ্যে এ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেও ইজমা হয়েছিল। সুতরাং এখন এই ইজমার বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া সাহাবায়ে কিরামের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনেরই শামিল। আল্লাহ তা'আলার দরবারে আমরা আশ্রয়প্রার্থী।

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু কিভাবে কেনো হুজরা শরীফে সমাধিস্থ হয়েছিলেন তার উপর একটি দীর্ঘ হাদিস ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন। নিম্নে আমরা হাদিসখানার কিছু অংশ বঙ্গানুবাদ করে তুলে ধরলাম।

"হযরত 'আমর বিন মাইমুন রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: ... যেদিন তিনি ছুরিকাঘাতের শিকার হন আমি তাঁর নিকটে দাঁড়ানো ছিলাম। তিনি ও আমার মধ্যখানে ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। উভয় সারির মধ্যখান দিয়ে উমর যেতে থাকেন ও বলছিলেন, "লাইন সোজা করে দাঁড়াও।"

যখন তিনি দেখতেন লাইনে কোন বেশকম অবশিষ্ট থাকে নি তখনই তিনি সামনে যেয়ে তাবকীর দিয়ে নামাযের ইমামতি শুরু করতেন। তিনি সূরা ইউসুফ কিংবা সূরা নাহল তিলাওয়াত করতেন। তাকবীর উচ্চারণের পরই শুনলাম তিনি বলছেন, "কুকুর আমাকে হত্যা বা খেয়ে ফেলেছে!"। এর একটু আগেই ঘাতক তাঁকে ছুরিকাঘাত করে। অনারব এই ঘাতক উভয়দিকে ধারালো একটি ছুরি হাতে ছুটে যাচ্ছিলো ও যাকে সামনে পাচ্ছিলো (নামাযরত অবস্থায়) তাকেই সে ছুরিকাঘাত করছিলো। এভাবে ডানে ও বামে মোট ১৩

[১৩৫] ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী, তাফসীরে কবীর, খ.৫, পৃ: ৪৭৫।

জনকে সে ছুরি দ্বারা আঘাত করে। এর মধ্যে সাত জনই মৃত্যুবরণ করেন। একজন মুসলমান এ দৃশ্য দেখে তার উপর কাপড় ছুড়ে মারলেন। তাকে ধরা হয়েছে বুঝতে পেরে সে আত্মহত্যা করে। এদিকে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু আবদুর রহমান বিন আউফ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাতে ধরলেন এবং তাঁকে নামাযে ইমামতি করতে বললেন। যারা উমরের পাশে দাঁড়ানো ছিলেন তারাও দেখেছেন যা আমি দেখেছি। কিন্তু মসজিদের অপর পাশের কেউ কিছু দেখেন নি। তবে তারা উমরের কণ্ঠধ্বনি না শুনে 'সুবহানাল্লাহ! সুবহানাল্লাহ!' বলে লুকমা দিতে লাগলেন। আবদুর রহমান বিন আউফ সংক্ষিপ্তভাবে নামাযে ইমামতি করলেন। নামায শেষ হওয়ার পর উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন, "হে ইবনে আব্বাস! বের করো কে আমাকে আক্রমণ করেছে?" ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু এখানে সেখানে খোঁজ করতে লাগলেন। এরপর ফিরে এসে বললেন, "মুগিরার ক্রীতদাস"। একথা শুনে উমর বললেন, "ঐ কারিগর?"। ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু জবাব দিলেন, "হ্যাঁ"।

... এরপর উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। আমরাও তাঁর সাথে গেলাম। মানুষ যেনো এরূপ বিপর্যয়ের সম্মুখীন আগে কোনদিন হয় নি। কেউ বললো, "চিন্তার কারণ নেই (তিনি শীঘ্রই সুস্থ হয়ে ওঠবেন)।" অন্যরা বললো, "আমরা চিন্তিত (হয়ত তিনি মারা যাবেন)।" এরপর তাঁকে খেজুরের রস পান করতে দেওয়া হলো। তিনি পান করলেন কিন্তু তা তাঁর পেটের জখম দিয়ে বের হয়ে আসলো। এরপর আনা হলো দুগ্ধ। তিনি পান করলেন। কিন্তু এটাও তাঁর পেট থেকে বের হয়ে আসলো। মানুষ বুঝতে পারলো তিনি মারা যাবেন। আমরা তাঁর কাছে গেলাম। অন্যরাও আসলো। তাঁর প্রশংসা করতে লাগলো সকলে। একজন যুবক এসে বললেন, "হে আমীরুল মু'মিনীন! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য ও ইসলামে আপনার নেতৃস্থানীয় অবস্থান যা আপনি জানেন, তার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আপনি শাসক নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং আপনি শাসন করেছেন সুবিচারের মাধ্যমে। অবশেষে আপনি শাহাদাতবরণ করলেন।" উমর জবাবে বললেন, "আমার আশা, এসব ব্যাপার আমার দুর্বলতাগুলোর কাফ্‌ফারা হবে। আর এর ফলে আমি কিছুই লাভ কিংবা ক্ষয় করবো না।"

যখন যুবক বের হবার জন্য ঘুরে দাঁড়ালেন, তাঁর পরনের কাপড় মাটি স্পর্শ করছিলো বলে মনে হলো। উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন, "এই যুবককে আবার আসতে বলো!" (যখন তিনি ফিরে আসলেন) উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন, "হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! তোমার পরনের কাপড় উপরে তুলো, এতে তোমার কাপড় পরিষ্কার থাকবে এবং তোমার প্রভুর শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে।"

... হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু এরপর (আবদুল্লাহ বিন উমর এর প্রতি ইঙ্গিত করে) বললেন, "যাও, আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহার নিকট যেয়ে বলবে: উমর আপনার প্রতি সালাম জানিয়েছে। কিন্তু, একথা বলো না: 'আমীরুল মু'মিনীন', কারণ আজ আর আমি আমীরুল মু'মিনীন নয়। এরপর বলো: উমর বিন খাত্তাব তাঁর অনুমতি কামনা করছে যে, সে যেনো তাঁর দু'জন সাথীর (অর্থাৎ রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর) নিকট সমাধিস্থ হয়।"

আবদুল্লাহ বিন উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু উম্মুল মু'মিনীন হযরত আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহার নিকট যেয়ে সালাম জানালেন। তাঁর কক্ষে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। ভেতরে প্রবেশ করে দেখলেন তিনি বসে বসে ক্রন্দন করছেন। ইবনে উমর তাঁকে বললেন: "উমর বিন খাত্তাব আপনার নিকট সালাম প্রেরণ করেছেন। তাঁর দু'জন সাথীর কাছে সমাধিস্থ হতে তিনি আপনার অনুমতি চেয়েছেন।" জবাবে উম্মুল মু'মিনীন আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা বললেন: "আমি আশা করেছিলাম, এই জায়গাটি আমার জন্য রেখে দেবো। কিন্তু আজ আমি এটা নিজের থেকে উমরের জন্য রাখাটা অধিক পছন্দ করছি।" যখন [ইবনে উমর] ফিরে আসলেন, উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে জানানো হলো, 'ইবনে উমর ফিরে এসেছেন।' উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন, "আমাকে বসাও।" কেউ তাঁকে ধরে নিজের দেহের উপর হেলান দিয়ে বসালেন। উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু [আবদুল্লাহকে] জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কাছে কী খবর আছে?" তিনি জবাব দিলেন, "হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি যা ইচ্ছা করেছিলেন তা-ই হয়েছে। তিনি অনুমতি দিয়েছেন।" একথা শুনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন, "আলহামদুলিল্লাহ! এর থেকে আরো গুরুত্বপূর্ণ কিছু আমার নিকট ছিলো না। সুতরাং আমার মৃত্যুর পর আমাকে নিয়ে যাবে এবং আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহাকে বলবে: 'উমর বিন খাত্তাব আপনার অনুমতি কামনা করছে (সে যেনো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর পাশে)

সমাধিস্থ হতে। তিনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আমাকে সেখানে (হুজরা শরীফে) কবরস্থ করো, আর যদি তিনি অনুমতি না দেন তাহলে মুসলমানদের কবরস্থানে [জান্নাতুল বাকীতে] আমাকে কবর দেবে।"

... এরপর উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু যখন ইন্তিকাল করলেন, আমরা তাঁকে বহন করে হযরত আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহার নিকট নিয়ে গেলাম। আবদুল্লাহ বিন উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু হযরত আইশা সিদ্দীকা রাদ্বিআল্লাহু আনহাকে সালাম জানালেন। এরপর বললেন, "উমর বিন খাত্তাব আপনার অনুমতি কামনা করেছেন।" তিনি বললেন, "তাঁকে ভেতরে নিয়ে আসো।" এরপর তাঁকে তাঁর দু'জন সাথীর পাশে সমাধিস্থ করা হলো।"[১৩৬]

উপরের সহীহ বর্ণনা থেকে জানা গেলো, আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সমাধিস্থল যেভাবে সকল সাহাবায়ে কিরামের ইজমার মাধ্যমে নির্ধারিত হয়েছিল, অনুরূপ হযরত উমর বিন খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সমাধিস্থলও সাহাবায়ে কিরামের ইজমা ও হুজরা শরীফের তখনকার জিম্মাদার হযরত আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহার অনুমতিক্রমে নির্ধারিত হয়েছিল। সুতরাং চৌদ্দশত বৎসর যাবৎ শাইখানের কবর দু'টি কেন হুজরা শরীফে স্থাপিত হয়েছিল সে প্রশ্ন কেউ করেন নি। আমরা আশা করবো, রাফিজীদের মতো কেউ আর এরূপ বিভ্রান্তিকর মতামত ও ফাতওয়া প্রদান করে মুসলিম উম্মাহ্‌র মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টা করবেন না।

আলবানি সাহেবের এরূপ বিভ্রান্তিমূলক ফাতওয়া ও মতামত তখনকার (অনেকটা সালাফি প্রভাবমুক্ত) সাউদী হুকুমতও বরদাশত করেন নি। প্রথমে তিনি সিরিয়া থেকে ও পরে সাউদী আরব থেকে বহিস্কৃত হন। তিনি জর্দানে আশ্রয় নেন ও সেখানেই গৃহবন্দী অবস্থায় (১৯৯৯ ঈসায়ী) মৃত্যুবরণ করেন।[১৩৭]

[১৩৬] সহীহ বুখারী, খ.৫, কি.৫৭, হাদিস নং. ৫০।
[১৩৭] ড. জি. এফ. হাদ্দাদ, AL-ALBANI, A Concise Guide to the Chief Innovator of Our Time.

১২. ***আলবানি বলেন, যারা আল্লাহর গুণাবলীকে (যেমন তাঁর হাত, পা, চোখ, কান, শ্রবণশক্তি ইত্যাদি) রূপকার্থে ব্যাখ্যা দেন তারা 'জিন্দিক' না হলেও জিন্দিকদের মতোই কথা বলেন।***[১৩৮]

তার এই ভ্রান্ত নেতিবাচক উক্তির খণ্ডন: নিজের ব্যক্তিত্বকে বড় করার অভিপ্রায়ে তনি এরূপ কথা বলে থাকবেন। তিনি মনে করেন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীনসহ লক্ষ লক্ষ উলায়ামে কিরামের আক্বীদা ভ্রান্ত! আর তারটা সঠিক (?)। আল্লাহর জাত সম্পর্কে অধিক আলোচনা উলামায়ে কিরাম নিষিদ্ধ করেছেন। এ কারণে এ প্রসঙ্গে আর অতিরিক্তি বলছি না। তিনি যদি মনে করেন, আমাদের মতো বা অন্য কোন আকৃতিতেই আল্লাহ তা'আলার দেহাংশ আছে তাহলে তিনি মারাত্মক ভ্রমের মধ্যে আছেন। আল্লাহ তা'আলা আকৃতিহীন। তিনি নিরাকার। তিনি সৃষ্ট কোন বস্তর সঙ্গে তুল্য নন। ঈমানের এসব মৌলিক বিষয়ের উপর সকল মুসলমান বিশ্বাস করেন। এ ব্যাপারে তাদের উপরোক্ত ২ ও ৩ নং আক্বীদা খণ্ডনের সময় বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সুতরাং এখানে এর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। আমরা শুধু পবিত্র কুরআনের সূরা ইখলাস ও এর বঙ্গানুবাদ তুলে ধরছি। চিন্তাশীল মানুষ তা পাঠ করে এর মর্ম অনুধাবন করবেন এবং আলবানি তথা সালাফিদের ভ্রান্তি যে কী মারাত্মক, তা বুঝতে সক্ষম হবেন, এটাই আশা করছি।

قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ * اللّٰهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

-"বলুন, তিনি আল্লাহ, এক, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয় নি। এবং তার সমতুল্য কেউ নেই।"

[১৩৮] তার 'ফাতওয়ায়ে আলবানি' কিতাব, পৃ: ৫২২-৫২৩।

১৩. ***সালাফি আলবানি বলেন, ঈদের দিন আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা বিদআত এবং তা পরিত্যাজ্য।***[১৩৯]

তার এই ফাতওয়ার খণ্ডন: ঈদের দিন কিংবা যে কোন দিনই হোক, নিজের আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করা হলো একটি উত্তম আমল। এ ব্যাপারে কুরআন-হাদিসে সুস্পষ্ট তাগিদ দেওয়া হয়েছে। আমরা কোথাও দেখি নি ঈদের দিন নিজের আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সাক্ষাৎ গ্রহণ করতে কেউ অবৈধ বলেছেন। হ্যাঁ, এই আমলটি এদিনের জন্য খাস্ হিসাবে মনে করা সঠিক নয়। বরং যে কোন দিনই দেখা-সাক্ষাৎ করলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তষ্টির কারণ হবে। কারণ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা আত্মীয়দের হক্ব আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

-"সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিমদিকে মুখ করবে, বরং বড় সৎকাজ হল এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহর উপর, কিয়ামত দিবসের উপর, ফেরেশতাদের উপর এবং সমস্ত নবী- রাসূলগণের উপর। আর সম্পদ ব্যয় করবে তাঁরই মুহাব্বাতে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম -মিসকীন, মুসাফির- ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্যে। আর যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দান করে এবং যারা কৃত প্রতিজ্ঞা সম্পাদনকারী এবং অভাবে, রোগে- শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণকারী তারাই হল সত্যাশ্রয়ী, আর তারাই পরহেযগার।" [সূরা বাক্বারাহ : ১৭৭]

আত্মীয়-স্বজনের হক্ব সম্পর্কে তিনি আরো ইরশাদ করেন:

[১৩৯] তার প্রণীত, ফাতওয়া, পৃ: ৬১-৬৩।

وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

-"আত্মীয়-স্বজনকে তার হক দান কর এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও, এবং কিছুতেই অপব্যয় করো না।" [বনী ইসরাঈল : ২৬]

হাদিস শরীফে আছে:

أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

-"হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে কেউ অধিক রিজিকের আশা ও তার জীবন দীর্ঘায়িত করতে ইচ্ছুক, সে যেনো তার রক্তসম্পর্কিত আত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখে"। [মুত্তাফাকুন আলাইহি]

শুধু ভালো সম্পর্ক নয়, আত্মীয়-স্বজন এবং মুসলমানদের মধ্যে উপহার আদান-প্রদানও উত্তম কাজ। একটি হাদিসে আছে:

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : تهادوا تحابوا

-হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেল, "একে অন্যের মধ্যে উপহার আদান প্রদান করো। এতে তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও সুসম্পর্ক গড়ে ওঠবে"। [আদাবুল মুফরাদ, ইমাম বুখারী] হযরত ইবনে হাজর আসক্বালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এই হাদিসের ইসনাদ হাসান। আরো একটি হাদিসে আছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

-"হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "যে কেউ আল্লাহ ও শেষ বিচারদিবসের

উপর বিশ্বাস রাখে, সে যেনো তার মেহমানদেরকে সম্মানিত করে; যে কেউ আল্লাহ ও শেষ বিচারদিবসের উপর বিশ্বাস রাখে, সে যেনো তার পারিবারিক সম্পর্ক বজায় রাখে; যে কেউ আল্লাহ ও শেষ বিচারদিবসের উপর বিশ্বাস রাখে, সে যেনো ভালো কথা বলে, না হয় নীরব থাকে।" [বুখারী]

আমরা এখন প্রমাণ তুলে ধরবো যে, উক্ত ফাতওয়াহ সালাফিদের কথিত 'ইমাম' আলবানি সাহেব দিয়েছেন ঠিকই। কিন্তু তার অন্ধ অনুসারীদের সবাই এই ফাতওয়াহ গ্রহণ করেন নি! নীচের ইংরেজী প্রশ্নত্তোর সালাফিদের একটি ইন্টারনেট সাইট থেকে হুবহু কপি করে বসানো হয়েছে।

"Question:

This [questioner] from Algeria asks: What is the ruling on specifying the day of Eid for visiting relatives and friends?

Shaykh Muhammad bin Hādī al-Madkhalī:

That is a good action and the relatives are most deserving of maintaining ties, because they are kinsfolk, they are more entitled than others [to this].[১৪০]

ভাবার্থ: প্রশ্ন: এই প্রশ্নকারী [আলজেরিয়া থেকে] জানতে চেয়েছেন: আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের সাথে দেখা-সাক্ষাতের জন্য ঈদের দিনকে নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে সঠিক ফাতওয়াহ কি?

[সালাফি] শায়খ মুহাম্মদ বিন হাদি মাদখালি: এটা একটি ভালো কাজ এবং আত্মীয়-স্বজনের হক্ব হলো তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা। এর কারণ হলো তারা পরিবারভূক্ত মানুষ। অপর থেকে তাদের হক্ব বেশী।"

সুতরাং ঈদের দিন দেখা-সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ হওয়ার কোন দলিল নেই। বরং এদিন বা যে কোন দিনই দেখা-সাক্ষাৎ করা জায়িয ও মুসলিম সমাজের জন্য উত্তম আমল।

---

১৪০ www.salaficentre.net (Salafi Centre of Manchester, England)

১৪. ***আলাবানী সাহেব ফাতওয়া দিয়েছেন, জু'মুআর ফরযের পূর্বে চার রাকাআত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ও পরের চার রাকাআত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা পড়া বিদআত। তার এ ফাতওয়ার কারণে সালাফিরা এই নামাযগুলো আদায় করেন না***। **(তার ফাতওয়া গ্রন্থ দ্রঃ)**

তাদের এই ফাতওয়ার খণ্ডন: স্ব-ঘোষিত 'শায়খ' নাসিরুদ্দীন আলবানির এই ফাতওয়ার ফলে মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় সকল মসজিদে দেখা যায় নতুন প্রজন্মের মুসল্লি যুবকরা জুমু'আর দিন শুধুমাত্র ফরয দু' রাকাআত আদায় করে দ্রুত মসজিদ ত্যাগ করছেন। অনুরূপ আজকাল বাংলাদেশেও যুবকদের অনেকেই এভাবে দ্রুত মসজিদ থেকে বের হয়ে যেতে দেখা যায়। ভুল ফাতওয়া প্রদানের কুফল এটি।

আমরা যেহেতু মাজহাবের অনুসারী তাই প্রথমে এ ব্যাপারে [হানাফী] মাজহাবের সিদ্ধান্ত তুলে ধরছি।

(وَسُنَّ) مُؤَكَّدًا (أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ وَ) أَرْبَعٌ قَبْلَ (الْجُمُعَةِ وَ) أَرْبَعٌ (بَعْدَهَا بِتَسْلِيمَةٍ) فَلَوْ بِتَسْلِيمَتَيْنِ لَمْ تَنُبْ عَنْ السُّنَّةِ

"যুহরের নামাযের পূর্বে চার রাকাআত নামায সুন্নাতে মুয়াক্কাদা এবং জুম'আর ফরযের পূর্বে চার রাকাআত নামায সুন্নাতে মু'আক্কাদা। জুম'আর ফরয শেষে আরো চার রাকাআত নামায এক সালামে আদায় করা সুন্নাতে মুআক্কাদা। অন্যথায় সুন্নাতে মুয়াক্কাদা আদায় হবে না।"[১৪১]

উক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থনে হাদিস শরীফ: আমরা যথাক্রমে আগের চার রাকাআত ও পরের চার রাকাআতের উপর দু'টি হাদিস তুলে ধরছি।

হাদিস -১:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا

[১৪১] রাদ্দুল মুহতার, ফাতওয়ায়ে আলমগীরী।

-"হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জুমু'আর পরে কেউ নামায পড়লে, চার রাক'আত যেনো আদায় করে"। [মুসলিম, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ]

হাদিস - ২:

رُوِى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا

-"আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর ব্যাপারে বর্ণিত আছে, তিনি জুমু'আর আগে চার রাকাআত আদায় করতেন এবং জুমু'আর পরেও চার রাকাআত আদায় করতেন"। [তিরমিযী, হা. নং. ৪৮১)

সুতরাং উক্ত হাদিসদ্বয় দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, জুম'আ নামাযে ফরযের পূর্বে ও পরে চার রাকাআত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা নামায আদায় করতে হবে। আর সুন্নাতে মুআক্কাদা যেহেতু কোনো শরয়ী ওজর না থাকলে ছাড়া যায় না, তাই [হানাফীদের] সকলের উচিৎ এই নামায উপেক্ষা না করা।

আর আলবানির উক্তি সম্পর্কে কি আর বলবো? তিনি তো নিজের ব্যক্তিত্ব ও প্রজ্ঞা জাহির করতে যেয়ে বলেছেন, 'এই নামাযগুলো বিদআত?'। কী মারাত্মক ভ্রম! কী মারাত্মক বে-আদবী আমাদের মহান আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের প্রতি! আলবানি ও তার অনুসারীদেরকে অনুরোধ জানাবো, কোন মাজহাবের সিদ্ধান্তকৃত আ'মলকে কখনো 'বিদআত', 'শেরেকী' ও 'কুফরী' বলবেন না। আপনাদের জ্ঞান ও তাঁদের জ্ঞানের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান। আপনারা যেসব হাদিস দ্বারা দলিল উপস্থাপন করেন এসব হাদিসের 'রাবী', 'সংকলক', 'ব্যাখ্যাতা' ছিলেন তাঁরাই। সুতরাং আপনারা হাদিস তাঁদের চেয়ে বেশী বুঝে ফেলেছেন, এরূপ উদ্ভট, অবাস্তব, অবান্তর কথা বলে সাধারণ মানুষকে আর বোকা বানানোর চেষ্টা করবেন না। আপানারা আমাদের মুসলিম ভাই-বোন। আপনাদের প্রতি আমাদের দরদ সর্বদাই আছে। দয়া করে ভ্রান্ত পথ থেকে ফিরে আসুন। যে কোন মাজহাবের অন্তর্ভুক্ত হয়ে দ্বীনকে সঠিকভাবে পালন করুন আল্লাহর ওয়াস্তে, তাঁর সন্তুষ্টি কল্পে ও কাল কিয়ামতের কঠিন শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়ার আশায়। আল্লাহ তা'আলা সবাইকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন।

১৫. *নাসিরুদ্দীন আলবানি সাহেব তার ফাতওয়া গ্রন্থে ঘোষণা দিয়েছেন, একমুষ্ঠির অধিক লম্বা দাড়ি রাখা 'হারাম' ও 'চরম বিদআত'।*[১৪২]

তাদের এই ফাতওয়ার খণ্ডন: দাড়ি ন্যূনত এক মুষ্টি পরিমাণ লম্বা করে রাখা মুসলমান পুরুষের জন্য ওয়াজিব বলে সাব্যস্ত হয়েছে। কিন্তু এক মুষ্টির বেশী রাখা 'হারাম' কিংবা 'বিদআত' হিসাবে ফাতওয়া প্রদান সত্যিই হাদিসের উপর অল্প জ্ঞানের পরিচায়ক বলে প্রমাণিত হয়। কারণ স্বয়ং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাড়ি মুবারক তাঁর বুক মুবারক পর্যন্ত আবৃত ছিলো।

হাদিস শরীফে আছে:

ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه قد ملأت نحره (الصدر وأسفل العنق)

-"নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাড়ি মুবারক ডান থেকে বাম পর্যন্ত তাঁর বুক মুবারক আবৃত করে রেখেছিল।" [শামায়েলে তিরমিযি (হা. নং ৪০৩; বাইহাকী, দালাইলুন নুবুওয়াহ]

এই সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হলো: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাড়ি মুবারক একমুষ্টি থেকে অবশ্যই অধিক ছিলো।

হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা শুধুমাত্র হজ্জ ও উমরায় যাত্রার পূর্বে তাঁর দাড়ি একমুষ্টি পরিমাণ রেখে বাকীটুকু কেটে ফেলতেন। ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু এক বছর উমরা ও পরের বছর হজ্জ পালন করতেন। (বুখারী) এই বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হলো যে, একমুষ্টি থেকে লম্বা হওয়ায় কোন দোষ নেই। কারণ এক বৎসর পর্যন্ত সময়ে অবশ্যই হযরত ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর দাড়ি এক মুষ্টি থেকে লম্বা হতো। মোটকথা, দাড়ি এক মুষ্টির নীচে রাখা হারাম এবং একমুষ্টি থেকে বেশী রাখা দোষের নয়। সালাফিদের ফাতওয়া মুতাবিক আমল করাও অসম্ভব। কারণ একমুষ্টি সর্বদা রাখতে গেলে অন্তত প্রত্যহ দাড়ি ছাটতে হবে! দাড়ি একদিনেও তো কিছুটা বাড়বে। ইমাম শাফিঈ ও ইমাম নববীর মতে, দাড়ি স্বাভাবিক অবস্থায় রেখে দেওয়াই উচিৎ। অর্থাৎ কাট-ছাট কিছুই করা ঠিক নয়। তবে ইমাম

[১৪২] ফাতওয়ায়ে আলাবানী, পৃ: ৫৩।

শাফিঈ হজ্জ ও উমরা পালনে যাত্রার পূর্বে কিছুটা ছেটে ফেলতে নিষেধ করেন নি।[১৪৩]

দাড়ির ব্যাপারে হানাফী মতামত হলো, একমুষ্টি পরিমাণ রাখা ওয়াজিব। এর অধিক হলে কোন দোষ নেই। তবে খুব অধিক হওয়াও উচিৎ নয় যে, কারো মুখাবয়বের সৌন্দর্য নষ্ট হয়। যারা একমুষ্টির অধিক অংশ কেটে ফেলা 'ওয়াজিব' বলেছেন তারা সঠিক বলেন নি। কারণ একমুষ্টি থেকে বেশী হলে তা কেটে ফেলা 'সুন্নাত' প্রমাণিত হয় নি।[১৪৪]

[১৪৩] ফাতহুল বারী, খ.১০, পৃ: ৩৫০।
[১৪৪] দুররে মুখতার ও শামী, খ.২, পৃ: ১২৩।

১৬. সালাফিদের কর্তৃক প্রচারিত লিফলেটের মাধ্যমে একটি প্রশ্ন-উত্তরে বলা হয়েছে, তারাবীর নামায ২০ রাকাআত পড়া অগ্রহণযোগ্য এবং চরম বিদআত। তাদের মতে ৮ রাকাআত পড়তে হবে। ('কিছু সাধারণ প্রশ্নের উত্তর' (অক্টোবর ১৯৯০) উত্তর নং ২২)

প্রশ্নোত্তরটি ছিলো: "ক. আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনোদিন ৮ রাকাআতের বেশী তারাবীহ নামায পড়েন নি। সুতরাং কেনো কেউই ২০ রাকাআত পড়তে নিষেধ করছেন না?

খ. এটা কি সত্যি যে, উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু এটি শুরু করেন?

[তাদের] উত্তর ২২: ক. তারাবীহ নামাযের ক্ষেত্রে মানুষ এ ব্যাপারে একমত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত এবং সর্বোত্তম তরীকা হলো ১১ রাকাআত। তবে এর অতিরিক্ত হওয়ার ব্যাপার কি? এটা অগ্রহণযোগ্য ও বিদআত হিসাবে ঘোষণা করেছেন শায়খ আলবানি এবং আরো কয়েকজন আগের যুগের স্কলার- যেমন, ইমাম মালিক, ইবনুল আরাবী এবং সানায়ী (দেখুন শায়খ আলবানি প্রণীত সালাতুত্ তারাবী)।

খ. উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু ২০ রাকাআত পড়েছেন কিংবা পড়তে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা সঠিক নয়। তিনি উবাই ইবনে কা'ব রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে নির্দেশ দিয়েছিলেন ১১ রাকাআতের ইমামতি করতে। (মুয়াত্তা ১/১৩৭)"।

এটাই ছিলো সালাফিদের প্রশ্নোত্তর। এটি ইংল্যান্ডে একটি লিফলেটের মাধ্যমে তারা উক্ত তারিখে প্রচার করেছেন।

তাদের এই ভ্রান্তির খণ্ডন: প্রথমত এটা বলে রাখা দরকার যে, হারামাইন শরীফাইনসহ বিশ্বের প্রায় সকল মসজিদে পবিত্র রমজানে তারাবীহর নামায আদি কাল থেকে জামাআতের সাথে আদায় হয়ে আসছে। আমরা মনে করি আইয়াম্মায়ে মুজতাহিদীন কর্তৃক স্বীকৃত ও নির্ধারিত ২০ রাকাআত তারাবীহ ও তা ১৪০০ বৎসরের অধিক কাল পর্যন্ত গণনাতীত মুসলমানের আমলই দলিল হিসাবে যথেষ্ট। তবে আলবানি ও তার অনুসারীদের ভ্রান্তি হাদিস ও ইতিহাস দ্বারাও প্রমাণ করা যায়।

প্রথমত, উম্মুল মু'মিনীন হযরত আইশা সিদ্দীকা রাদ্বিআল্লাহু আনহা বর্ণিত উদ্ধৃত হাদিসখানা আসলে তারাবীহ নামাযের ব্যাপারে বলা হয় নি। অধিকাংশ ফকীহ আলিম মনে করেন, হাদিসখানা আসলে তাহাজ্জুদের নামাযের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য! আমরা হাদিসটির মুত্ন ও অনুবাদ নিম্নে তুলে ধরছি।

হাদিসের মূল মুত্ন: হযরত আবু সালমান বিন আবদুর রাহমান রাদ্বিআল্লাহু আনহু উম্মুল মু'মিনীন হযরত আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করলেন-

كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلٰى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي

-"রামাদ্বানে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায কিরূপ ছিলো? তিনি জবাব দিলেন, তিনি রামাদ্বানে কিংবা অন্য কোন মাসে ১১ রাকাআতের বেশী পড়েন নি। তিনি চার রাকাআত পড়তেন, যেটুকু দীর্ঘ সময় যাক ও সৌন্দর্য হোক না কেন- এরপর তিনি আরো চার রাকাআত পড়তেন- যেটুকু দীর্ঘ সময় যাক ও সৌন্দর্য হোক না কেন-। এরপর তিনি তিন রাকাআত (বিত্র) পড়তেন। আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা আরো বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি বিত্র পড়ার পূর্বে ঘুমান না? তিনি জবাব দিলেন, হে আইশা! আমার চোখ নিদ্রিত হয় কিন্তু আমার হৃদয় নিদ্রা যায় না।" [বুখারী, হা.না. ১০৭৯]

মুফতি আবদুর রহীম লাজপুরী তাঁর ফাতওয়ায়ে রাহিমীয়ায় বলেন: "সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যাতা এবং প্রসিদ্ধ আলিম শায়খ শামসুদ্দীন কিরমানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃ. ৭৮৬ হি.) বলেছেন: 'এই হাদিসে তাহাজ্জুদ নামায উদ্দেশ্য। আবু সালমান রাদ্বিআল্লাহু আনহুর প্রশ্ন ও মা আইশার জবাব

তাহাজ্জুদ নিয়ে।'" লাজপুরী আরো বলেন, "এখানে যদি তাহাজ্জুদ নামাযের কথা উদ্দেশ্য না হতো তাহলে এটি অপর একটি হাদিসের সঙ্গে সংঘাতে পতিত হতো, যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ২ রাতে ২০ রাকাআত করে নামাজে ইমামতি করেছেন বলে বর্ণিত হয়েছে। এরপরও এরূপ সংঘাতে ২০ রাকাআতের হ্যাঁসূচক (মুতবিত) হাদিস অপর নাসূচক (নাফী) হাদিসের উপর অগ্রাধিকার পাবে। [সূত্র: আল-খতীবুদ দুরারী, শরহে সহীহ বুখারী, খ.৯, পৃ. ১৫৫-১৫৬]"।

আরেক হাদিস শরীফে আছে:

عن ابن عباس قال كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى فى شـهر رمضـان فى غير جماعة بعشرين ركعة والوتر

-"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজান মাসে ২০ রাকাআত নামাজ ও (পরে) বিত্‌র আদায় করতেন জামাত ছাড়া।"[১৪৫]

বাইহাকী শরীফের উক্ত হাদিসখানা কেউ কেউ 'জঈফ' (দুর্বল) সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সকল মুহাদ্দিসীনে কিরামের মতামতকে উপেক্ষা করে আলবানি সাহেব, এটি 'জাল' সাব্যস্ত করেছেন![১৪৬] অথচ হাদিসখানা ইমাম বাইহাকী ছাড়াও ইবনে আবি শাইবা তাঁর মুসান্নাফে, ইবনে আদী তাঁর কামিলে, তাবারানী তাঁর কাবীরে, ইবনে মাজাহ তাঁর মুখতাব মিনাল ফাওয়ায়িদ, ইমাম বগভী তাঁর মাজমুয়াস্ সাহাবায়, আবু ইবনে হুমায়িদ তাঁর মুসনাদে এবং অন্যান্য হাদিস সংকলক বর্ণনা করেছেন।

[১৪৫] ইমাম বাইহাকী, সুনানে কুবরা, খ.২, পৃ: ২৪৯।

[১৪৬] আলবানী প্রণীত 'আজ-জাঈফাহ', খ.২, পৃ. ৩৫, নাম্বার, ৫৬০, মাকতাবাল ইসলামিয়া, আম্মান, ১৪০৬ হি.। তাঁর এই 'জাল' বলা ও তারাবীহ ৮ রাকআত ফাতওয়া দেওয়া দ্বারা এটাই বুঝাচ্ছে যে, সাহাবায়ে কিরাম, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন, প্রখ্যাত তাবিঈন, ফুকাহায়ে কিরামসহ যুগ যুগ ধরে অসংখ্য উচ্চ পর্যায়ের দ্বীনের ইমাম ও আলিমরা এবং সাধারণ মুকাল্লিদগণ 'বিদআতের' মধ্যে লিপ্ত ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তার মতো সনদহীন এক আলীমকে ঈসায়ী বিংশ শতকে জন্ম দিয়ে এই ভ্রান্তি উদঘটান করেছেন! কী চরম গোমরাহী!

আসলে উক্ত হাদিস সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তাহলো, এটি সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করা যাবে না। এটি দুর্বল হলেও 'মাওজু' [জাল] অবশ্যই নয়। এর প্রমাণ হলো, ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণিত এই হাদিসখানা অন্যান্য বড় বড় সাহাবা ও তাবিঈদের কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। যেমন, উসমান ইবনে আফ্‌ফান, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা)। এছাড়া কোনো কোনো মুহাদ্দিস কিছু দূর্বল হাদিসকেও 'সহীহ' হওয়ার স্তরে উন্নীত করেছেন যদি এর ভিত্ শক্ত থাকে। এমনকি নেতৃস্থানীয় 'সালাফি' শায়খ শুয়াইব হাসান [যিনি ইংল্যান্ডে বসবাস করেন] এরূপ হাদিস সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন: "ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিও দুর্বল হাদিসকে 'সহীহ' হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন যদি এটি পুরো উম্মাহ্ গ্রহণ করে নেয়। [দেখুন শাকাওয়ী, ফাতহুল মুহিত]। কিন্তু ইমাম মালিকের মতামত- 'মদীনার মানুষের আমলকে প্রধান্য দিতে হবে', এটা তিনি (ইমাম শাফিঈ) গ্রহণ করেন নি। পরবর্তী হানাফী আলিম যেমন ইবনে হুমাম ঘোষণা দিয়েছেন, যে হাদিস উম্মাহ্‌র আমল দ্বারা সমর্থিত তা সহীহ হিসাবে মেনে নিতে হবে (দেখুন, আবদুর রশীদ নু'মানী: মা তামাসু ইলাহিল হাজ্জ, পৃ. ১৮)। হাদিস বিশারদদের মধ্যে তিরমিযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রায়ই বলতেন: 'এটা বিজ্ঞ উলামার (আহলে ইলমের) আ'মল।' ইমাম সুয়ূতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মন্তব্য করেছেন: এটা ইশারা করে যে, হাদিসখানা আহলে ইল্‌ম কর্তৃক সমর্থিত। যদিও এতে সঠিক ইসনাদ নেই (দেখুন সুয়ূতী: তা'আকুবাত, পৃ. ২০)।"[১৪৭]

উপরোক্ত হাদিস ও এটি 'সহীহ' হওয়ার আলোচনা দ্বারা আমরা তারাবীহ নামাজ ২০ রাকাআত প্রমাণ করা উদ্দেশ্য নয়। বরং জনাব আলবানির সিদ্ধান্ত যে ভুল ও এটি মোটেই জাল হাদিস নয় তা-ই প্রমাণ করা। বাস্তবে এই হাদিস না থাকলেও কিছুই যায় আসে না। তারাবীহ নামাজ ২০ রাকাআত হওয়ার ক্ষেত্রে অসংখ্য মুহাক্কিক উলামা মাশাইখের উক্তি থেকে প্রমাণিত করা যায়। নীচে এর কয়েকটি একটু পরই তুলে ধরছি। পাঠকরা এ থেকে স্পষ্ট অনুধাবন করবেন, আধুনিক এই তথাকথিত 'সালাফি' মতবাদের নেতারা আসলে ধোঁকাবাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা বলেন, আগের যুগের সালফে সালিহীনের অনুসরণ করেন, অথচ সাহাবায়ে কিরামসহ প্রাথমিক যুগের সকল

[১৪৭] 'Criticism of Hadith among Muslims with reference to Sunan Ibn Maja', by Suhaib Hasan, pg. 131.

‘সালাফ’ তারাবীহ নামায ২০ রাকাআত পড়েছেন- কিন্তু তারা ঢালাওভাবে তাদের এই আমলকে ‘বিদআত’ বলার মতো ধৃষ্টতা দেখিয়েছেন! তাহলে তারা আসল সালাফিদের অনুসরণ করলেন, না নিজেদের নফসের অনুসরণ করলেন এবং একইসাথে সালাফদের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করলেন? পাঠকরাই বিচার করুন।

১. ইমামে আজম হযরত আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [৮০-১৫০ হি.]

হানাফী মাজহাবের ইমাম, আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের প্রধান ইমামে আজম এ ব্যাপারে কি বলেছেন তা ভারতের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর বুখারী শরীফের শরাহ্ ‘ফায়জুল বারী’ গ্রন্থে বলেন:

وفى التاتارخانية: سأل أبو يُوْسُف أبا حنيفةَ رحمهما الله تعالى: هل كان لعمرَ رضى اللهُ عنه عَهْدٌ من النبيِّ صلى الله عليه وسلّم فى عشرينَ ركعةً فقال له أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لم يكن عمرُ رضى الله عنه مُبْتَدِعًا

“তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে, ইমাম আবু ইউসূফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে প্রশ্ন করলেন, ‘হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু ২০ রাকাআত তারাবীহ পড়ার জন্য হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোনো ইশারা লাভ করেছিলেন কি?’ ইমাম সাহেব জবাব দিলেন, ‘হযরত উমর নিজে নিজেই কিছু আবিষ্কার করার মতো ব্যক্তি ছিলেন না।’”[১৪৮]

২. ইমাম মালিক ইবনে আনাস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [৯৫-১৭৯ হি.]

মালিকী ফিক্হের সর্বাপেক্ষা সহীহ কিতাব হলো কাজী সাহনূন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রণীত, আল-মুদাওয়ানাহ। এতে উল্লেখিত আছে:

[১৪৮] অন্যান্য কিতাবেও ইমামে আজমের এ উক্তিটি বর্ণিত হয়েছে, যেমন: ইমাম শুরুন্দাবুলালী প্রণীত মারাক্বিউল ফালাহ, পৃ. ৮১ এবং ইমাম নুজাইম আল-মিসরী প্রণীত বাহরুর রা’ইক, খ.২, পৃ.৬৬।

“ইবনুল ক্বাসিম বলেন, ‘বিত্রসহ [তারাবীহর] রাকাআত সংখ্যা হলো ৩৯।’ ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ বলেন: ‘এটাই মানুষ সালাফদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন এবং মানুষ এই আমলকে বন্ধ করেন নি।’” [আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ৩৯ রাকাআতের ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন। নীচে তা উদ্ধৃত হয়েছে।][১৪৯]

৩. ইমাম তিরমিযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [২০৯-২৭৯ হি]

ইমাম তিরমিযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “উমর, আলীসহ অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুম এবং সুফিয়ান সওরী, ইবনে মুবারক ও ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম সকলেই তারাবীহ নামায ২০ রাকাআত হিসাবে মেনে নিয়েছিলেন। ইমাম শাফিঈ বলেছেন, তিনি দেখেছেন মক্কা শরীফের অধিবাসীরা ২০ রাকাআত তারাবীহ নামায আদায় করেছেন।”[১৫০]

৪. হাফিজ ইবনে হুমাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ৮৬১ হি. / ১৪৫৭ ঈ.]

আল্লামা ইবনে হুমাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিশ্চিতভাবে উল্লেখ করেছেন যে, সহীহশুদ্ধ বর্ণনা ও দায়িত্বশীলদের দ্বারা এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আসহাবে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুম ও তাবিঈরা হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর যামানায় ২০ রাকাআত তারাবীহ নামায পড়ার আমল করেছেন। হযরত ইয়াযিদ ইবনে রুমানের এই দৃঢ় বর্ণনা এসেছে হযরত সাই’ব ইবনে ইয়াযিদ থেকে। তিনি বলেন, “উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর উত্তম যুগে আমরা বিশ রাকাআত করে দৈনিক তারাবীহ নামায আদায় করেছি।” এই বর্ণনার সত্যতা ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক খুব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষিত হয়েছে।[১৫১] হাফিজ ইবনে হুমাম ফাতহুল কাদীরে আরো বলেন: ‘অবশেষে ২০ রাকাআত নামাযের উপর সকলের মতৈক্য হয়েছে। এবং এটাই

[১৪৯] আল-মুদাওয়ানাহ, খ.১, পৃ. ১৯৩-১৯৪)।
[১৫০] সুনানে তিরমিযী, খ. ১, পৃ. ৯৯।
[১৫১] ফাতহুল কাদির, খ.১, পৃ. ৪০৭ এবং হাফিজ জাইলানী প্রণীত নাসবুর রাইয়া, খ.১, পৃ. ২৯৪।

যুগে যুগে পালিত হচ্ছে।'[১৫২] শেষোক্ত উক্তিটি ইবনে তাইমিয়ার মিনহাজুস সুন্নাহ কিতাবেও আছে।[১৫৩]

৫. শাইখুল ইসলাম হযরত আহমদ ইবনে হাজর আসক্বালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ৮৫২ হি. / ১৪৪৯ ঈ.)

হাদিস শরীফের এই হাফিজ ইমাম রাফি'ই রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণনা করেন: "হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ২০ রাকাআত করে ২ রাত নামাযে ইমামতি করেছেন; তৃতীয় রাতে মানুষ পুনরায় জমায়েত হলেন। কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুজরা শরীফ থেকে বেরিয়ে আসলেন না। পরদিন ভোরে তিনি সবাইকে বললেন, 'আমি ভাবছিলাম এটা তোমাদের জন্য ফরয হয়ে যায় কি না, এবং এটা আদায় করতে তোমরা অপারগ হবে।'" এই হাদিসখানা বর্ণনা শেষে হাফিজ ইবনে হাজর মন্তব্য করেন: "সকল মুহাদ্দিসীনে কিরাম এব্যাপারে মতৈক্যে পৌঁছেছেন যে, এই হাদিসটি সহীহ।"[১৫৪]

৬. ইমাম আতা ইবনে আবি রাবাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [৩৩ - ১১৪/১১৫ হি]

তিনি ছিলেন বিখ্যাত মুফাস্সির তাবিঈ। হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফত শেষ হওয়ার ২ বৎসর পূর্বে তিনি ইয়ামনে জন্মগ্রহণ করেন। মক্কা মুকাররমার ফকীহ ও মুফতি হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর উস্তাদদের মধ্যে বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমার নাম এখানে উল্লেখযোগ্য।

[১৫২] ফাতহুল কাদির, খ.১, পৃ. ৪৭০।
[১৫৩] তাঁর প্রণীত মিনহাজুস সুন্নাহ, খ.২, পৃ. ২২৪।
[১৫৪] হাফিজ ইবনে হাজর, তালখিসুল হাবির ফী তাখরিজ আহাদিসুল রাফি'ইল কাবীর, খ.১, পৃ. ১১৯।

হযরত আতা রাহিমাহুল্লাহ বলেন: "মক্কা শরীফে আমি আসহাবে কিরাম ও অন্যান্য মানুষকে বিত্রসহ ২৩ রাকাআত নামায রমজান শরীফে পড়তে দেখেছি।" এই বর্ণনাটি হাসান।[১৫৫]

৭. ইমাম মুয়াফ্ফাক উদ্দীন ইবনে কুদামা মাক্বদিসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ৬২০ হি]

তাঁর যুগের হাম্বলী মাজহাবের ইমাম ছিলেন হযরত ইবনে কুদামা রাহিমাহুল্লাহ। তিনি বলেন: "তারাবীহ ২০ রাকাআত হওয়ার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে ইজমা (মতৈক্য) হয়েছে।"[১৫৬]

৮. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ১৩৫২ হি.]

ভারতের প্রখ্যাত এই মুহাদ্দিস [পরবর্তীতে লিখিতভাবে প্রকাশিত] একটি বক্তৃতায় বলেন: "চার ইমামের একজনও বিশ্বাস করেন নি, তারাবীহ নামায ২০ রাকাআতের কম। অধিকাংশ আসহাবে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুমের আমল ও বিশ্বাস তা-ই ছিলো। ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বিশ্বাস করতেন, ২০ রাকাআত থেকে বেশী। তিনি নিশ্চিত ছিলেন, তারাবীহ নামায ৩৬ রাকাআত। ইমাম মালিকের আমল অনুযায়ী ২০ রাকাআত হবে জামাআতে। কিন্তু মদীনার সাধারণ মানুষের আদত ছিলো চার রাকাআত পর পর ইমাম সাহেব থামার সময়ও তারা দাঁড়িয়ে আরো চার রাকাআত নিজে নিজে আদায় করে নিতেন। মক্কা শরীফে যারা তারাবীহ আদায় করতেন তারা ইমামের থামার সময়টুকুতে কা'বা শরীফের চতুর্দিকে তাওয়াফ করে নিতেন। মদীনার মানুষ স্বভাবতই কা'বা শরীফের চতুর্দিকে তাওয়াফের সুযোগ পান নি, তাই তারা ১৬ রাকাআত নামায অতিরিক্ত পড়ে নিতেন।"[১৫৭]

[১৫৫] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ, পৃ. ৪০৬, ফাতহুল বারী, খ.৪, পৃ. ২১৯, ইমাম ইবনে নাসির মারওয়াজি প্রণীত ক্বিয়ামুল লাইল, পৃ. ৯১।
[১৫৬] আল-মুগনি, খ.১, পৃ. ৮০৩।
[১৫৭] তিরমিযিল মা'রফু বাআরফা'শ শাযযী, খ.১, পৃ. ৩২৯।

৯. ইমাম বাদরুদ্দীন আ'ইনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ৪৫৫ হি. / ১৪৫১ ঈ.]

আল্লামা আ'ইনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর প্রণীত শরহে বুখারীতে লিখেছেন: "তারাবীহ নামায মোট ২০ রাকাআত। ইমাম শাফিঈ এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা একই কথা বলেছেন। তাঁদের প্রমাণ হলো ইমাম বাইহাকীর রিওয়ায়েত। বর্ণনাকারী হলেন সা'ইব ইবনে ইয়াজিদ রা.। বিখ্যাত সাহাবী উমর ইবনে খাত্তাব ও উসমান ইবনে আফ্‌ফান রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা এবং খ্যাতিমান তাবিঈগণও ২০ রাকাআত তারাবীহ নামাযের আমল করেছেন।" তিনি আরো বলেন: "সর্বাধিক উত্তম ও সবচেয়ে ভালো পরামর্শ হলো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর আসহাবে কিরামের আ'মলের প্রতি আস্থাশীল থাকা।"[১৫৮]

১০. হাফিজ তকিউদ্দীন আহমদ ইবনে তাইমিয়া হাম্বলী রাহিমাহুল্লাহ [মৃ. ৭২৪ হি.]

সালাফিরা এই ষষ্ঠ হিজরীর মুহাদ্দিসকে 'ইমাম' বানিয়ে ফেলেছে। তা-ই তারাবীহ নামাযের ক্ষেত্রে তাঁর একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরা এখানে প্রণিধানযোগ্য হবে। তিনি তাঁর ফাতওয়ায়ে ইবনে তাইমিয়ায় লিখেছেন: "এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, রমজান শরীফে হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাদ্বিআল্লাহু আনহু ২০ রাকাআত তারাবীহ ও ৩ রাকাআত বিত্‌র নামাযে সাহাবায়ে কিরামের জামাআতে ইমামতি করেছেন। সুতরাং এটাই অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মসলক (বিশ্বাস ও আমল) হয়েছে যে, তারাবীহ নামায একটি সুন্নাহ। কারণ হযরত উবাই ইবনে কা'ব ২০ রাকাআতের ইমামতি করেছেন মুহাজিরীন ও আনসার আসহাবে কিরামদের উপস্থিতিতে। আর তাঁদের একজনও এর বিরোধিতা করেন নি!"[১৫৯]

[১৫৮] উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারী, খ.৭, পৃ. ১৭৮।
[১৫৯] ফাতওয়ায়ে ইবনে তাইমিয়া, খ.১, পৃ. ১৯১।

সুতরাং এই প্রসঙ্গের উপসংহারে আমরা বলতে পারি, উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে, আলবানি ও তার অনুসারীরা হাদিস ও ফিকাহ শাস্ত্রের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও উসূলের নবিস গবেষক! তাহাজ্জুদের নামাযের হাদিসকে তারাবীহ নামাযের সঙ্গে তারা সম্পৃক্ত করে বসেছেন! তারা কি একবারও ভাবলেন না, সহীহ বুখারীর উক্ত উভয় হাদিস সম্পর্কে ফকীহ উলামায়ে কিরাম অবগত ছিলেন। এছাড়া আসহাবে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুমের ইজমাকৃত সর্বসম্মত আমলও যে দলিল হিসাবে যথেষ্ট, এটাও কি তাদের জানা নেই? তাদের ইমাম ইবনে তাইমিয়াও যে এটা মেনে নিয়েছিলেন- তা-ও কি তারা ভাবলেন না? বাস্তবে ফকীহ মুজতাহিদ মহাত্মন মাশাইখবর্গ সবদিক বিবেচনা করেই ২০ রাকাআত পড়া সঠিক হিসাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন- এ কথা কি আলবানি বিবেচনাও করলেন না? আমরা আশা করবো এরূপ বাজে ফাতওয়া দ্বারা কেউ কোনদিন আর সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করবেন না।

১৭. ***তারা ফাতওয়া দিয়েছেন, "জানাযার নামাযের অন্যতম রুকন বা ফরয হচ্ছে- নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করা, যা ব্যতীত নামাযই সহীহ্ হবে না।"***[১৬০]

তাদের এই ফাতওয়ার খণ্ডন:

প্রথমেই আমরা হানাফী মাজহাবের সিদ্ধান্ত মুতাবিক জানাযার নামাযের নিয়মটি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করছি। কোন্ আমলের সঙ্গে কোন্ হাদিস সম্পৃক্ত তা-ও তুলে ধরছি। এ থেকে সকলের সন্দেহ দূর হবে যে, জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ মোটেই [হানাফী মাজহাব মতে] 'ফরয' নয়।

জানাযার নামাযে দু'টি ফরয আছে: ১. চার বার 'আল্লাহু আকবার' বলে তাকবীর দেওয়া ও ২. দাঁড়িয়ে নামায পড়া।

চার তাকবীর ও দাঁড়িয়ে নামায আদায়ের হাদিস:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ

-"হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে নাজ্জাসির মৃত্যুসংবাদ জানালেন, যেদিন তিনি মারা যান। এরপর তিনি মুসাল্লার দিকে অগ্রসর হলেন। মানুষ তাঁর পেছনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ালেন। তিনি চারটি তাকবীর উচ্চারণ করলেন (অর্থাৎ জানাযার নামায পড়লেন)।" [বুখারী, হা. নং ১২৪৭]

জানাযার নামাযে সুন্নাত মাত্র তিনটি: ১. প্রথম তাকবীরের পর সানা পাঠ করা, ২. দ্বিতীয় তাকবীরের পর দরূদ শরীফ পাঠ করা এবং ৩. তৃতীয় তাকবীরের পর মৃতের জন্য দু'আ করা।[১৬১] এই ফরযদ্বয় ও সুন্নাতগুলো ইমাম

---

[১৬০] ফিকহুল হাদিস, প্রথম খণ্ড, ২৭২-২৭৩ পৃষ্ঠা, শাইখ আব্দুর রাউফ বিন সুলাইমান, সম্পাদনায়- আল্লামা দেলোওয়ার হোসাইন সাঈদী; আবুল কালাম মুহাম্মদ আব্দুর রহমান নামক একব্যক্তি প্রণীত 'আল্লাহর রাসূল (সা.) এর শিখানো জানাযার নামায', পৃ; ৪৫ থেকে উদ্ধৃত।

[১৬১] বাহারে শরীয়ত, খ.১, পৃ. ৮২৯।

ও মুক্তাদী সকলেই আদায় করবেন। জানাযার নামযের জন্য জামাআত শর্ত নয়। একজনেও নামায পড়ে নিলে 'ফরযে কিফায়া' আদায় হয়ে যাবে।

এবার আমরা সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত কেনো আমাদের মাজহাবে 'ফরয' নয় সে প্রসঙ্গে আসছি। তিলাওয়াতের উদ্দেশ্যে জানাযার নামাযে কুরআনের কোন আয়াত তিলাওয়াত নিষিদ্ধ হওয়ার দলিল হলো:

১. ইমাম মালিক ইবনে আনাস রাহিমাহুল্লাহ বর্ণিত হাদিস:

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ

-"হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা কোনো সময়ই জানাযার নামাযে [কুরআন শরীফ থেকে] তিলাওয়াত করেন নি।"[১৬২]

ইমাম মালিক আরো বলেন: "নিশ্চিতই, আমাদের মদীনা শহরে জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠের আমল কেউ করেন না।"[১৬৩]

২. যে হাদিসে জানাযার নামাযে ফাতিহা পঠিত হয়েছে বলে বর্ণিত আছে তার ব্যাখ্যা হলো: একমাত্র দু'আর নিয়তে এটা পাঠ করা বৈধ হতে পারে। অন্যথায় সূরা ফাতিহা পড়া 'ফরয' হওয়ার কোনো দলিল নেই।[১৬৪]

অবশ্য শাফিঈ মাজহাবে সূরা ফাতিহা পাঠ সুন্নাত বলা হয়েছে। অনুরূপ হাম্বলী মাজহাবে ফাতিহা পাঠ সুন্নাত।

হানাফী সিদ্ধান্তের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা: সালাফিরা সকল ক্ষেত্রের মতো এক্ষেত্রেও তাদের আক্বীদা অপরের উপর চাপানোর চেষ্টা করছেন। তারা যদি 'শাফিঈ' ও 'হাম্বলী' মতামতকে গ্রহণ করেন, তা অস্বীকার করেও জানাযার নামাযে ফাতিহা পাঠ ফরয সাব্যস্ত করে থাকেন, তাহলে আমাদের কিছু বলার নেই। কিন্তু তাই বলে, আমাদের মাজহাবের সিদ্ধান্ত তাদের কথায় বাদ দিয়ে দেবো- তা কিন্তু গ্রহণযোগ্য নয়। তাদের সিদ্ধান্ত যেহেতু আমাদের মাজহাবের

---

[১৬২] মুয়াত্তা ইমাম মালিক।

[১৬৩] বিদায়াতুল মুজতাহিদ।

[১৬৪] বাযলুল মাজহূদ।

অনুকূলে নয় তাই আমরা তাদেরটা মানতে পারি না। তারা যেসব হাদিস দ্বারা দলিল দেন, এসব হাদিস আমাদের ফুকাহাদের সামনেও ছিলো। এবার বুঝা যাক কোন্ কারণে ফাতিহা পাঠ ফরয বলে সিদ্ধান্ত হয় নি।

১. তারা দলিল দিতে যেয়ে বলেন: হাদিসে আছে, সূরা ফাতিহা পাঠ না করলে কোন নামাযই সহীহ হবে না।

কিন্তু বাস্তবে জানাযার নামায মূলত একটি দু'আ। এটি পূর্ণাঙ্গ নামায নয়। কারণ ফাতিহা পাঠসহ পূর্ণাঙ্গ নামাযে রুকু সিজদা, শেষ বৈঠক ইত্যাদিও আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বললেন: "সূরা ফাতিহা ও এর সঙ্গে অপর সূরা ছাড়া কোনো নামায নেই" [ইবনে মাজাহ, তিরমিযী], তা পূর্ণাঙ্গ নামাযের কথা উদ্দেশ্য ছিলো- জানাযার নামাযের কথা নয়। আর জানাযার নামায যে আসলে 'নামায' বা 'সালাহ' নয় তার প্রমাণ হযরত বদরুদ্দীন আ'ইনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উক্তি। তিনি বলেন: "মৃত ব্যক্তির জন্য কিছু বিশেষ কাজের আদেশ দিয়েছেন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এর মধ্যে একটি হলো 'সালাহ' যাতে না আছে রুকু কিংবা সিজদা। 'সালাহ' শব্দটির প্রয়োগ এখানে বাস্তব নামাযের জন্য নয়, না এটি ব্যবহৃত হয়েছে যুক্ত অর্থে। বাস্তবে এটি ভাবার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যবহৃত হয়েছে।"[১৬৫]

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণিত একটি হাদিসে আছে: তিনি বলেন, "জানাযার নামায একটি দু'আ। এতে কোনো তিলাওয়াত নেই। ইমামের সঙ্গে তাকবীর শেষে দু'আ করতে হয়।"[১৬৬]

মূসা আল-জুহানী বর্ণনা করেন: তিনি জানাযার নামায সম্পর্কে হাকাম, শাবি, আতা ও মুজাহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমকে জিজ্ঞেস করলেন, জানাযার নামাযে তিলাওয়াত আছে কি না? তাঁরা জবাব দিলেন, "না। আপনি একজন দু'আকারী। সুতরাং যেভাবে পারেন দু'আ করবেন।[১৬৭]

[১৬৫] উমদাতুল ক্বারী, খ.৮, পৃ. ১২২।
[১৬৬] আল-বাদি'উ, আওযাজুল মাসালিক, শরাহ মুয়াত্তা ইমাম মালিক, খ. ৪, পৃ. ২৩১।
[১৬৭] প্রাগুক্ত।

একই কিতাবে আছে, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, ফাতিহা ছাড়া নামায নাই, সালাতুল জানাযার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কারণ হলো, এটা আসলে কোনো নামায নয়। এটা একটি দু'আ এবং মৃতের মাগফিরাতের ওয়াসিলা। এই নামাযে সাধারণ নামাযের মতো নিয়ম-কানুন জড়িত নেই। যেমন, রুকু ও সিজদা। একে সালাহ বলা হয় এজন্য যে, এতে দু'আ আছে।'[১৬৮]

ফাতিহা পাঠের পক্ষে ছিলেন ইমাম শাফিঈ ও ইমাম হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা। তবে ফরয হিসাবে নয়- বরং সুন্নাত হিসাবে। তাঁদের সিদ্ধান্তের কারণ হলো নিম্নোক্ত হাদিস শরীফ।

হযরত তালহা বিন আবদুল্লাহ বিন আউফ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, "আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমার পেছনে আমি জানাযার নামায পড়েছি। তিনি সূরা ফাতিহা পড়েছেন। পরে আমি তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি এটা পড়লাম এজন্য যে, মানুষ যাতে বুঝে নেয় এটি একটি সুন্নাত।" [বুখারী]

কিন্তু এরপরও অনেক ফকীহ উলামা বলেছেন, সূরা ফাতিহা জানাযার নামাযে পড়া সঠিক নয়। তাঁরা বলেন, ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুর আমলের বিপরীত অনেক বর্ণনা আছে। এর ফলে ফাতিহা পাঠের পক্ষে তাঁর ও গোটা আরো ক'টি বর্ণনার সম্মুখে ফাতিহা না পড়ার পক্ষে বর্ণনাগুলোর ওজন অনেকটা বেশী।

এ সম্পর্কে আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে প্রশ্ন করা হয়েছিল: জানাযার নামাযে কুরআন তিলাওয়াত করা যায় কি না? তিনি জবাব দিলেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এ ব্যাপারে বলেন নি, পড়া যায় কি না।"[১৬৯]

[১৬৮] আওযাজুল মাসালিক, খ.৪, পৃ. ২৩১।
[১৬৯] উমদাতুল ক্বারী, খ.৮, পৃ. ১৪১; আওযাজুল মাসালিক, খ.৪, পৃ. ২৩১।

এ ব্যাপারে আরেকটি বর্ণনা এখানে তুলে ধরা যায়। বর্ণিত আছে প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ ও ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা উভয়ে বলেছেন: "জানাযার নামাযে কুরআন তিলাওয়াত নেই।"[১৭০]

ইবনে আবি শাইবাহ রাহিমাহুল্লাহ তাঁর মুসান্নাফে হযরত জাবির রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে হযরত আবু জুবায়ির রাদ্বিআল্লাহু আনহুর একটি রিওয়ায়েত তুলে ধরেছেন: "আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃতের জন্য আমাদেরকে তিলাওয়াত করতে নির্দিষ্ট করে কিছু বলেন নি। আবু বকর ও উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমাও নির্দিষ্ট কিছু বলেন নি।"[১৭১]

হযরত আমর বিন শুয়াইব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর পিতামহ থেকে বর্ণনা করেন: "ত্রিশ জন সাহাবায়ে কিরাম থেকে বর্ণিত আছে, তাঁরা জানাযার নামাযে কোনো বিশেষ তিলাওয়াত নির্দিষ্ট করে পাঠ করেন নি।"[১৭২]

আবুল মিনহাল বলেন, "আমি আবু আ'লিয়াকে জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি জবাব দিলেন, সূরা ফাতিহা শুধুমাত্র ওসব নামাযে পড়া হয় যেগুলোতে রুকু ও সিজদা আছে।"[১৭৩]

উপরে আমরা কয়েকটি মাত্র হাদিস, রিওয়ায়েত ও বর্ণনা তুলে ধরেছি। জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা কিংবা কুরআন শরীফ থেকে তিলাওয়াত না পড়ার ব্যাপারে আরো বহু বর্ণনা পাওয়া যায়। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে হযরত আমর বিন আউফ, উমর ইবনে খাত্তাব, আলী বিন আবু তালিব, ইবনে উমর, আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহুম প্রমুখ কুরআন থেকে তিলাওয়াতের কথা সমর্থন করেন নি। আমরা এখন তাবিঈদের বর্ণনা তুলে ধরছি।

তাবিঈদের মধ্যে যারা ফাতিহা পাঠের পক্ষে ছিলেন না তাদের নামের তালিকা দীর্ঘ। নীচে আমরা কয়েক জনের নাম ও তাঁদের উক্তি উল্লেখ করছি।

হযরত আতা, হযরত তাউস, হযরত সাঈদ বিন মুসাইব, হযরত ইবনে সিরীন, হযরত সাঈদ বিন জুবায়ির, হযরত সালিম, হযরত ইব্রাহীম, হযরত

[১৭০]আওযাজুল মাসালিক, খ.৪, পৃ. ২৩১।

[১৭১]প্রাগুক্ত।

[১৭২]প্রাগুক্ত।

[১৭৩]প্রাগুক্ত।

শাবী, হযরত হাকাম, হযরত ইবনে মুনজির রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমুখ বলেছেন, ফাতিহা না পড়ার পক্ষে হযরত মুজাহিদ, হযরত হাম্মাদ, হযরত সুফিয়ান সওরী, হযরত ইমাম মালিক, হযরত ইমাম আবু হানিফা এবং কুফার ফকীহবৃন্দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম ছিলেন। ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন: "আমাদের শহরের [মদীনার] কেউ জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠের আমল করেন না।"[১৭৪]

ইমাম তাহাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "এটা সম্ভব যে, কিছু কিছু সাহাবী জানাযার নামাজে সূরা ফাতিহা পাঠ করেছেন। কিন্তু তাঁরা তিলাওয়াতের নিয়তে পাঠ করেন নি বরং দু'আর নিয়তে করেছেন।"[১৭৫]

উপসংহারে বলা যায়, অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈগণ জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন নি। তারা কথায় ও আমলে এর বিপক্ষে ছিলেন। ইমাম মালিক তো সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়েছেন: তাঁর যুগে মদীনার কেউ সূরা ফাতিহা জানাযার নামাযে পড়েন নি। তিনি তাঁর মুয়াত্তায় হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে রিওয়ায়েত করেছেন, যাতে বলা হয়েছেন, তিনি [আবু হুরাইরাহ] জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করেন নি।[১৭৬] তিনি আরো বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু কুরআনের কোন অংশ জানাযার নামাযে তিলাওয়াত করেন নি।[১৭৭] সুতরাং, হানাফী ও মালিকী সিদ্ধান্ত সুদৃঢ়ভাবে হাদিস, সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈদের আমলের ভিত্তিতে হয়েছে। এই উভয় মাজহাবের কারোর জন্য ফাতিহা [তিলাওয়াত হিসাবে] পাঠ বৈধ হবে না। শাফিঈ ও হাম্বলী মাজহাবের অনুসারীরা পাঠ করতে পারবেন- কারণ এটা পাঠ সুন্নাহ হিসাবে তাঁদের ইমামদ্বয় সাব্যস্ত করেছেন।

এটুকু বলার পর আমরা মন্তব্য করতে বাধ্য যে, সালাফিদের এরূপ বলা: 'সূরা ফাতিহা পাঠ জানাযার নামাযে ফরয', কিংবা 'এটা না পড়ায় কারো জানাযা হয় নি!' ইত্যাদি উক্তি নিতান্তই দুঃখজনক যা একমাত্র হিংসার

[১৭৪]উমদাতুল ক্বারী, খ.৮, পৃ. ১৩৯।

[১৭৫]উমদাতুল ক্বারী, খ.৮, পৃ. ১৪১।

[১৭৬]মুয়াত্তা পৃ. ২০৯।

[১৭৭]মুয়াত্তা, পৃ. ২১০।

বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। আমরা তাদেরকে এরূপ প্রচারণা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানাচ্ছি। তাদেরকে এটাও বুঝার পরামর্শ দিচ্ছি যে, প্রত্যেক মাজহাবের প্রতিটি শরঈ সিদ্ধান্ত সঠিক ও নির্ভুল। কুরআন, হাদিস, সাহাবায়ে কিরামের আমল, তাবিঈদের মন্তব্য ও আমল ইত্যাদি সবকিছু বিবেচনা, গবেষণা করেই সকল মাজহাবী সিদ্ধান্ত হয়েছে। সুতরাং সালাফিরাসহ সকল গায়র মুকাল্লিদদের উচিৎ হবে, ভ্রষ্টতার পথ পরিহার করে তাক্বলিদের পথে ফিরে আসা। আল্লাহ তাদেরকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন- আমরা মনে-প্রাণে তাঁর কাছে এই কামনা করি। কারণ তারাও আমাদের মুসলিম ভাইবোন।

১৮. ***একই ব্যক্তি (১৮ নং আলোচনায় উল্লেখিত) 'তাক্বওয়া ভিত্তিক একটি আদর্শ মসজিদের সন্ধানে' নামক এক বুকলেটে ফাতওয়া জারী করেছেন, "খুতবাহ্ দিতে হবে মাতৃভাষায়"***। [পৃ. ২৭]

তাদের এই সিদ্ধান্তের খণ্ডন: খুতবার ভাষা কি হবে তার উপর প্রথমেই আমরা চার মাজহাবের সিদ্ধান্ত সূত্রসহ তুলে ধরছি।

হানাফী মাজহাব: "খুতবা আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় প্রদান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতে মুয়াক্কাদার সঙ্গে নিঃসন্দেহে সংঘাতপূর্ণ। সুতরাং এটি আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় প্রদান 'মাকরুহে তাহরিমী' [যা নিষিদ্ধ ও গুনাহের কাজ]।"[১৭৮]

শাফিঈ মাজহাব: এই মাজহাবের দু'টি সিদ্ধান্ত আছে। প্রথমটি হলো: "খুতবা আরবী ভাষায় হওয়া একটি শর্ত। উভয় খুতবার আহকাম আরবী ভাষায় হতে হবে (খুতবার আহকামসমূহ সম্পর্কে ব্যাখ্যা পরবর্তীতে তুলে ধরেছি)। সুতরাং আরবী ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় খুতবা প্রদান গ্রহণযোগ্য নয়- কারণ আরবী ভাষা (খতীবের জন্য) শিক্ষা করা সম্ভব। আহকাম ছাড়া খুতবার বাকী অংশ আরবী না হলেও (খুবতা বৈধ হওয়ার ক্ষেত্রে) অসুবিধা নেই। কিন্তু এটি সুন্নাতের খেলাফ।"[১৭৯]

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত হলো: "পুরো খুতবা বৈধ হওয়ার জন্য আরবী ভাষা ব্যবহার একটি শর্ত। কারণ এটাই হলো মানুষের আমল (অর্থাৎ উম্মাহ্‌র আমল)। যদি (ইমামসহ) মুসল্লিদের মধ্যে একজনও আরবী পড়তে না পারেন তাহলে সে ক্ষেত্রে নিজের ভাষায় খুতবা প্রদান করলে আদায় হয়ে যাবে। যদিও তাদের মধ্যে অন্তত একজনের জন্য আরবী পড়া শিক্ষাগ্রহণ ফযর (খুতবা পাঠের জন্য)। যদি আরবী শিখে নিতে যথেষ্ট সময় অতিবাহিত হয়, আর কেউই তা শিখেন না, তাহলে

[১৭৮] উমদাতুর রিয়াহ।
[১৭৯] মাজাহিবুল আরবা'আহ, খ.১, পৃ. ৩৯২।

সকলেই গুনাহগার হবেন। তাদের জন্য জুমু'আ নেই। তাদের জন্য বরং যুহরের নামায আদায় করা ফরয।"[১৮০]

উচ্চ পর্যায়ের শাফিঈ ফকীহ ছিলেন ইমাম রাফি'ই রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি বলেন: "পুরো খুতবা আরবীতে দেওয়া ওয়াজিব কিনা, এ প্রশ্নে দু'টি মতামত বিদ্যমান। সহীহ মতামত হলো এটা শর্ত। সুতরাং, যদি মুসল্লিদের মধ্যে একজনও আরবী পড়তে অপারগ হন, তাহলে খুতবা আরবী ছাড়া তাদের ভাষায় দেওয়া যাবে। কিন্তু একই সময় আরবী শিক্ষা তাদের জন্য ওয়াজিব- অন্যথায় তারা গুনাহগার হবে। তাদের জন্য জুমু'আর নামায পড়াও বৈধ হবে না।"[১৮১]

উক্ত উদ্ধৃতিগুলো থেকে এটা স্পষ্ট যে, শাফিঈ মাজহাবেও খুতবা আরবীতে দেওয়া শর্ত। অপারগ হলে ভিন্ন কথা।

মালিকী মাজহাব: "শ্রোতারা অনারব হলেও এবং না বুঝলেও খুতবা আরবী ভাষায় দেওয়া ওয়াজিব। ইমাম ও মুসল্লিদের মধ্যে একজনও যদি আরবী পাঠ করেত অপারগ হন, তাহলে তাদের জন্য জুমু'আ নেই।"[১৮২]

উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে মালিকী সিদ্ধান্ত স্পষ্ট। খুতবা আরবী ছাড়া হবেই না। আরবী পাঠে ইমাম-মুসল্লি সকলে অপারগ হলে তাদের জন্য জুমু'আই বৈধ নয়। এবার দেখা যাক হাম্বলীরা কি বলেন।

হাম্বলী মাজহাব: তাদের বক্তব্য হলো: "খতীব যদি আবরী পড়তে অপারগ না হন তাহলে আরবী ছাড়া খুতবা প্রদান বৈধ নয়। কিন্তু খতীব যদি আরবী ভাষায় পাঠ করতে অপারগ হন তাহলে তার নিজের ভাষায় খুবতা দিতে পারেন। শ্রোতারা আরব কিংবা অনারব হলেও খতীব এ ক্ষেত্রে তার মাতৃভাষায় খুবতা দিতে পারবেন। কিন্তু জানা থাকা দরকার, উভয় খুতবার আরকানসমূহের মধ্যে কুরআনের আয়াত পাঠ একটি রুকন। আর আয়াত আরবী ছাড়া অন্য (অনূদিত) ভাষায় বলা

[১৮০] আল-কালিউবী, খ.১, পৃ. ২৭৮।
[১৮১] সাঈদ মুর্তাজা জুবাইদী, শাহরুল ইহইয়া, খ.৩, পৃ: ২২৬। অনুরূপ বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, ইমাম নববী তাঁর 'রওজাতুত্ তালিবীন' গ্রন্থে, খ.২, পৃ: ২৬।
[১৮২] মাজাহিবুল আরবা'আ, খ.১. পৃ: ৩৯২।

যাবে না। (খতীব আরবী ভাষা না জানলে) তার উচিৎ কোনো ধরনের 'জিকির' আরবী ভাষায় প্রদান করা। এতেও তিনি অপারগ হলে (অর্থাৎ আরবী ভাষায় জিকির পাঠ করতে না পারলে) তার উচিৎ হবে কুরআনের আয়াত পাঠের সময়টুকু তিনি নীরবে কাটিয়ে দেবেন।"[১৮৩]

আমরা চারটি মাজহাবের সিদ্ধান্ত তুলে ধরলাম। পাঠকবৃন্দ লক্ষ্য করুন, আরবী ভাষায় খুতবা প্রদান সকল মাজহাবেই শর্ত। ইমাম ও মুসল্লিদের কেউই যদি আরবী না জানেন তাহলে কোন কোন মাজহাবে (শাফিঈ ও হাম্বলী) ভিন্ন ভাষায় খুতবা প্রদান জায়িয আছে। এরপরও তাতে শর্তারোপ আছে। মোটকথা, মুসল্লিদের উচিৎ হলো আরবী ভাষায় শুদ্ধ পাঠ করতে পারেন এরূপ একজন ইমামকে মসজিদের দায়িত্ব দেওয়া। প্রত্যেক মাজহাবে এটা স্পষ্ট বলা হয়েছে, শ্রোতাদের আরবী জানা বা না জানা খুতবা ভিন্ন ভাষায় প্রদানের কারণ হতে পারে না। সুতরাং সকল মাজহাবের সিদ্ধান্ত স্পষ্ট: আরবী ছাড়া খুবতা প্রদান সাধারণভাবে বৈধ নয়। এর মূল কারণ হলো, খুতবা আসলে 'জিকরুল্লাহ' ও 'দু'আ, দরূদ'। খুতবা বুঝতে পারলে ভালো কিন্তু না বুঝতে পারলেও নেকী হবে এবং নামাযের কোন ক্ষতি হবে না।

যুগ যুগ ধরে মুসলিম বিশ্বের সকল ভাষাভাষি অঞ্চলে জুমু'আর খুতবা আরবীতে হয়ে আসছে। সুতরাং, আজকের এক দু'জন স্ব-ঘোষিত একেবারেই অরিপক্ক 'মুজতাহিদদের!' ফাতওয়ার অনুসরণ করে জুমু'আর খুতবায় ভাষাগত রদবদল আনয়ন কোন্ কারণে? মুকাল্লিদ যারা তারা তো এমনিতেই আরবী ভাষা ছাড়া খুতবা পাঠ করতে পারবেন না। বাকী থাকলো গায়র মুকাল্লিদরা। তারা তো সবাই মুজতাহিদ! যাচ্ছেতাই আমল তারা করতে দোষ কিসের! বাস্তবে গায়র মুকাল্লিদ হওয়ার কুফলই হলো এটা। এই হাদিসে পেয়েছি, ঐ হাদিসে পাই নি! ইত্যাদি বলতে বলতে এরা ধীরে ধীরে দ্বীনের গণ্ডিসীমা থেকে বেরিয়ে যান! এ কারণেই হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এদের সম্পর্কে দূরদর্শী মন্তব্য করেছিলেন আজ থেকে আড়াই শতাধিক বছর পূর্বে: "তাক্বলিদ প্রত্যাখ্যানের অর্থ হলো

[১৮৩] প্রগুক্ত।

ইসলাম থেকে বের হওয়ার প্রথম পদক্ষেপ।"[১৮৪] আমরা আল্লাহর দরবারে আশ্রয়প্রার্থী।

খুতবা সম্পর্কে শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "আমরা যখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর আসহাবে কিরাম কর্তৃক প্রদানকৃত খুবতাগুলোর দিকে লক্ষ্য করি তখন কয়েকটি বিষয় আমাদের নিকট ধরা পড়ে। এদের মধ্যে আছে, 'হামদ', 'দু'টি শাহাদাত', 'দরূদ শরীফ', 'তাক্বওয়ার নির্দেশ', 'কুরআনের তিলাওয়াত', 'মুসলমানদের জন্য দু'আ' এবং 'খুতবাগুলো আরবী ভাষায়'। পূর্ব ও পশ্চিমের সকল মুসলমানের স্থায়ী আমল সর্বদা এটাই ছিল এবং আছে, যদিও অনেক স্থানের মুসলমান অনারব।"[১৮৫]

সবশেষে পাঠকদের অবগতির জন্য খুতবার নিয়ম-কানুন এখানে তুলে ধরার প্রয়াস পাচ্ছি।[১৮৬]

১. জুমু'আর খুতবা প্রদান শর্ত। খুতবা ছাড়া জুমু'আর নামায হবে না।

২. খুতবার শর্ত পূর্ণ হবে 'জিকরুল্লাহ' দ্বারা।

৩. পুরো খুতবা আরবীতে দিতে হবে। অন্য ভাষায় খুতবা প্রদান 'বিদআত'।[১৮৭]

৪. আরবীতে খুতবা দেওয়ার পর নামাযের পূর্বে অনুবাদ করে শুনানোও বিদআত। তবে নামায শেষে অনুবাদ করে শুনানো যাবে।[১৮৮]

৫. খুবতা প্রদানের সময় খতীবকে অযু অবস্থায় থাকা সুন্নাত। অযু না থাকা মাকরুহ। [প্রাগুক্ত]

---

[১৮৪] শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহ. 'ফুইউদ্বুল হারামাইন', পৃ: ৪৮।
[১৮৫] শাহ ওয়ালিউল্লাহ, শারহুল মুয়াত্তা।
[১৮৬] মুফতি মুহাম্মদ শফি উসমানীর বয়ান, হযরত আশরাফ আলী থানবী প্রণীত 'খুতবাতুল আহকাম লি জুমু'আতুল আম' থেকে উদ্ধৃত।
[১৮৭] শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী, শরহে মুয়াত্তা; ইমাম নববী, কিতাবুল আজকার; দুররুল মুখতার, শুরুতুস্ সালাত, শরহে ইহইয়া।
[১৮৮] তাক্বরিদ রিসালা; মুসলিম শরীফের হাদিস দ্বারা সাবিতকৃত।

৬. মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা দেওয়া সুন্নাত। বসে খুতবা দেওয়া মাকরুহ।[১৮৯]

৭. মুসল্লিদের দিকে মুখ রেখে খুতবা প্রদান সুন্নাত। কিবলামুখী বা অন্য কোনদিকে ফিরে খুতবা দেওয়া মাকরুহ। [প্রগুক্ত]

৮. খুতবা শুরুর পূর্ব মুহূর্তে 'আউযুবিল্লাহিমিনাশ শাইতানির রাজীম' পাঠ করা সুন্নাত। [ইমাম আবু ইউসূফ, আল-বাহরুর রায়িক]

৯. মুসল্লি শ্রোতারা যাতে শুনতে পারে এরূপ উচ্চ কণ্ঠে খুতবা দেওয়া সুন্নাত। অতি বেশী নিম্ন স্বরে খুতবা দেওয়া (ফলে মানুষ তা শুনতে অসুবিধা হয়) মাকরুহ। [আল-হিদায়া]

১০. অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত খুতবা প্রদান সুন্নাত। সর্বোচ্চ ততটুকু সময় পর্যন্ত খুতবা দেওয়া যেটুকু সময় 'তিওয়াল মুফাস্সাল' [সূরা হুজুরাত থেকে বুরুজ পর্যন্ত সূরাসমূহ হলো তিওয়াল মুফাস্সালের অন্তর্গত] সূরার একটি পাঠ করতে অতিবাহিত হয়। [হিদায়া, রাদ্দুল মুহতার, আল-বাহরুর রাইক্ব]

খুতবার আরো ১০টি সুন্নাত আছে। আমরা এগুলোকে নীচে তুলে ধরলাম।[১৯০]

১. 'হামদ' [আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা] দ্বারা খুতবা শুরু করা।

২. 'ছানা' পাঠ করা।

৩. দুই কালিমা [শাহাদাতাইন] পাঠ করা।

৪. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের প্রতি সালাত ও সালাম প্রেরণ করা।

৫. কিছু দিকনির্দেশা ও পরামর্শ প্রদান।

৬. কুরআন শরীফ থেকে কিছু আয়াত তিলাওয়াত করা।

---

[১৮৯]ফাতওয়ায়ে হিদায়া, বাহরুর রায়িক্ব।
[১৯০]মুফতি মুহাম্মদ শফি উসমানীর বয়ান, হযরত আশরাফ আলী থানবী প্রণীত 'খুতবাতুল আহকাম লি জুমু'আতুল আম' থেকে উদ্ধৃত; ফাতওয়ায়ে হিদায়া, বাহরুর রায়িক্ব।

৭. উভয় খুতবার মাঝখানে কিছুক্ষণের জন্য বসা।

৮. সকল মুসলমান নারী-পুরুষের জন্য দু'আ করা।

৯. দ্বিতীয় খুতবার সময় 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলা এবং 'ছানা' ও 'সালাত ও সালাম' পাঠ করা।

১০. উভয় খুতবা পাঠে 'মুফাস্‌সাল সূরার' মধ্য থেকে একটি পাঠের সমপরিমাণ সময়ের অধিক অতিবাহিত না করা।[১৯১]

[১৯১] আবদুল মুকিত মুখতার প্রণীত **'আরবী ছাড়া ভিন্ন ভাষায় জুমু'আর খুতবা পাঠ একটি যৌক্তিক পর্যালোচনা'**। গ্রন্থটি খানকায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া থেকে প্রকাশ হয়েছে। পাঠকরা এটি সংগ্রহ করে অধ্যয়ন করতে পারেন।

১৯. *উপযুক্ত দলিল-প্রমাণ ছাড়া উক্ত বুকলেটের লেখক, 'ফাজায়েলে আমল' কিতাবের অধিকাংশ হাদিস 'যঈফ', 'জাল', 'মিথ্যা', 'বানোয়াট', 'ভিত্তিহীন' ইত্যাদি বলে ঘোষণা দিয়েছেন*। [প্রাগুক্ত বুকলেটের পৃষ্ঠা ২০-২৬ দ্র:]

তাদের এই মতামতের খণ্ডন: প্রথমেই বলে রাখি, উক্ত সূত্রহীন মতামত দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, সালাফিরা তাবলীগ জামাআতের ঘোর বিরোধী। ভালো কথা, তাবলীগের বিরোধী বলে খ্যাত আরো অনেক ফিরকা আছে কিন্তু তাবলীগ দ্বারা সমগ্র দুনিয়াব্যাপী মুসলমানদের বিরাট ফায়দা হচ্ছে। অসংখ্য মানুষ নাফরমানী ছেড়ে দ্বীনের পথে ফিরে আসছেন। ঠিক হচ্ছে তাদের ঈমান ও আমল। সুতরাং যারা তাবলীগের বিরোধিতা করেন, তাদের উচিৎ পুনরায় চিন্তা-বিবেচনা করা। আর প্রয়োজনে তাবলীগে অংশগ্রহণ করে এর হাক্বিকাত উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন। এটুকু বলার পর আমরা নিম্নে তাবলীগ সম্পর্কে কিছু তথ্য তুলে ধরছি। আশা রাখি পাঠ শেষে এই মহান দ্বীনি আন্দোলন সম্পর্কে সকল সন্দেহ দূর হয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে সালাফিদের মতামতের অসারতাও উন্মোচন হবে।

ফাজায়েলে আমলের লেখক: তিনি ছিলেন বুখারী শরীফের দীর্ঘদিনের উস্তাদ, ভারতের সাহারানপুরের প্রখ্যাত শাইখুল হাদিস হযরত মুহাম্মদ জাকারিয়া কান্ধলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (১৩১৫-১৪০২ হিজরী)। ভারত ও মদীনা মুনুওয়ারায় হাদিস শিক্ষাদান করেছেন। তিনি উচ্চ পর্যায়ের মুহাদ্দিস ও ওলি ছিলেন। অনেক গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনি কিতাব রচনা করেছেন। এর মধ্যে ৬ খণ্ডে সমাপ্ত ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মুয়াত্তার শরাহ 'আওযাজুল মাসালিক ইলা মুয়াত্তা ইমাম মালিক', 'আল আবওয়াবুল তারাজিম লিল-বুখারী', এবং 'খাসাইন-নাবাবী শরহে শামায়েলে তিরমিযী' এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশ্বের অসংখ্য মুসলমান ও খাস করে তাবলীগ জামাআতের ভাইদের নিকট তিনি সর্বাধিক পরিচিত 'ফাজায়েলে আমল' কিতাবখানার রচয়িতা হিসাবে। হযরত জাকারিয়া কান্ধলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মদীনা মুনওয়ারার বিখ্যাত কবরস্থান জান্নাতুল বাকীতে সমাহিত আছেন।

ফাজায়েলে আমল কিতাব রচনার প্রেক্ষাপট: হযরত জাকারিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ফাজায়েলে আমল কিতাবের ভূমিকায় লিখেছেন: "মুজাদ্দিদে ইসলাম ও যামানার উলামা-মাশায়িখের উজ্জ্বল রত্ন হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস (রাহ.) আমাকে তাবলীগে দ্বীনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আয়াত ও হাদিস লিখে পেশ করতে আদেশ করেছেন।"

সুতরাং বুঝাই যাচ্ছে, শাইখুল হাদিস জাকারিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সকলের নিকট সহজবোধ্য একখানা কিতাব রচনার জন্য স্বীয় চাচা, তাবলীগ জামাআতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক নির্দেশপ্রাপ্ত হয়ে প্রণয়ন করেন। কিতাবে তিনি বহু হাদিস বর্ণনা করেছেন শরয়ী আইন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নয়, বরং উত্তম আমলের ফাজায়েল বা উপকার তুলে ধরতে। আর উপকার বা ফাজায়েল বর্ণনা করতে যেয়ে দুর্বল হাদিসের উদ্ধৃতি দেওয়া মোটেই দোষের কিছু নয়। এছাড়া প্রতিটি হাদিসের সূত্রও কিতাবে উল্লেখিত হয়েছে। সুতরাং জাকারিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কোনো কিছু লুকান নি। নীচে আমরা ফাজায়েলে আমলে বর্ণিত হাদিস ও বিভিন্ন বর্ণনার কয়েকটি সূত্র তুলে ধরছি।

ফাজায়েলে তাবলীগ: বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, আল-ইসফাহানী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, দারা'নী, বাইহাকী, মিশকাতুল মাসাবিহ, আহমদ, তাবারানী।

ফাজায়েলে নামায: মুত্তাফাকুন আলাইহি (বুখারী-মুসলিম), আহমদ, নাসাঈ, তাবারানী, তিরমিযী, আবু দাউদ, নুযহাতুল মাজালিস, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকিম, দুররে মানসুর, জাওয়াজির ইবনে হাজর মক্কী, তাম্বিহুল গাফিলীন, মুনাব্বিহাতে ইবনে হাজর, জামে সাগীর, ইবনে কাসীর, মাজালিসুল আকবর, নাসাঈ, বায্যার, দারা কুতনী, একামাতুল হুজ্জাহ্, ইতবাক, দারিমী, সাঈদ ইবনে মানসুর।

ফাজায়েলে কুরআন: বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, নাসাঈ, দারেমী, বাইহাকী শুয়াবুল ঈমান, মুসলিম, শরহুস সুন্নাহ, ইবনে হিব্বান, আহমদ, হাকিম, মারাসীল, শরহে এহইয়া, জামউল ফাওয়াইদ, কবীর, ইবনে খুজাইমাহ, রহমতে মুহদাত, রাযীম।

ফাজায়েলে যিকির: বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, দুররে মানসুর, মিশকাত, তাবারানী, হিসনে হাসীন, ইবনে মাজাহ, হাকিম, মুসনাদে আহমদ, ইবনে হিব্বান, আবি দারদা, মিশকাত, বায়হাকী, নাসাঈ, বাযযার, আবু ইয়া'লা, ইবনে ইসহাক, আবু শাইখ, আসমা, আবু দাউদ, মুন্তাখাব কানযুল উম্মাল, জামউল ফাওয়াইদ, শরহে এহইয়া, আবু নুয়াইম, দারা কুতনী।

হিকায়াতে সাহাবা (রাদ্বি.): সীরাতে ইবনে হিশাম, বুখারী, ফাতহুল বারী, উসদুল-গাবাহ, বয়ানুল কুরআন, জামউল ফাওয়ায়িদ, তরীখুল খুলাফা, আশহারে মাশাহীর, মুনতাখাব কানযুল-উম্মাল, ইসলাম, খামীস, দুররে মানসুর, মিশকাত, কিয়ামুল্লাইল, শামায়েল, আশহার, বযলুল মজহুদ, আবু দাউদ, কিতাবুল আমওয়াল, মুয়াত্তা ইমাম মালিক, এহইয়া উলূমুদ্দীন, বাইহাকী, তারীখে খামীস, কুর্‌রাতুল উয়ূন, ইসাবাহ, আশহার, তাবাকাতে ইবনে সাদ, মুসনাদে আহমদ, তাযকিরাহ্, মুকাদ্দামা আওজায, ইবনে মাজাহ, দারিমী, ইস্তীআব।

ফাজায়েলে রমযান: ইবনে খুযাইমাহ, বাইহাকী, ইবনে হিব্বান, মুসনাদে আহমদ, হাকিম, তাবারানী, শুয়াব, বুখারী, বিররুল ওয়ালিদাইন, বায্যার, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, নাসাঈ, মুসলিম, মিশকাত, দুররে মানসুর।

ফাজায়েলে হাজ্ব: মিশকাত, মুসলিম, কান্‌জ, ইবনে খুজাইমাহ, ইবনে হিব্বান, তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ, ইহতাফ, দুররে মানসুর, বায়হাকী, তাবারানী, তাফসীরে আজিজী, আবু দাউদ, বুখারী, ইত্তিহাফ, হিসনে হাসীন, ইবনে মাজাহ, দারে কুতনী, শরহে মাসালিকে নববী, মাজাহির, শরহে মাওয়াহিব, শরহে লুবাব, জারকানী, খাসাইসুল কুবরা, খামীস, নুজহাত, রাওদ্বা, নূরুল ইজাহ।

ফাযায়েলে আমল কিতাব সম্পর্কে একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

মুফতি হযরত তকী উসমানী দামাত্ বারাকাতুহুমের ইন্টারনেট সাইটে একটি প্রশ্নোত্তর প্রকাশিত হয়েছে। জুন ২০০৩ সালে প্রকাশিত এই প্রশ্নোত্তর থেকেই আমরা ফাজায়েলে আমল এর গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে অনেকটা নিশ্চিত হতে পারবো। নিম্নে ইংরেজী থেকে এটি অনুবাদ করে তুলে ধরা হলো।

প্রশ্ন: মাওলানা জাকারিয়া কান্ধলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রণীত ফাজায়েলে আমল কিতাবখানা সম্পর্কে আপনার (মুফতি তকী উসমানী

সাহেবের) মতামত জানতে চাই। অনেক সৌদি আলিম ফাতওয়া দিয়েছেন যে, উক্ত কিতাবে প্রচুর দুর্বল ও মিথ্যা হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তাদের মতে এটা পাঠ করা বৈধ নয়। অনুগ্রহ করে আপনার মতামত দিন। [এন আহমদ (ইউকে)]

উত্তর: ফাজায়েলে আমলের বইগুলোর রচয়িতা মাওলানা মুহাম্মদ জাকারিয়া সাহারানপুরী একজন উচ্চ পর্যায়ের হাদিস বিশারদ ছিলেন। সুতরাং এটা ভাবাই যায় না যে তিনি তাঁর গ্রন্থে 'মিথ্যা' হাদিস বর্ণনা করেছেন। তবে, এটা সত্য, গ্রন্থের মধ্যে কিছু হাদিস আছে যার সদন দুর্বল। কিন্তু ফাজায়েলের ক্ষেত্রে এরূপ হাদিসের ব্যবহার বহুসংখ্যক মুহাদ্দিস গ্রহণযোগ্য বলেছেন। এর মূল কারণ হলো, এগুলো দ্বারা শরীয়তের মৌলিক আইন-কানুন সৃষ্টি হয় না। বরং এসব হাদিসে আমলের মূল্যায়ন করা হয়েছে। আর ঐসব আমল তো আগে থেকেই সহীহ সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এসব গ্রন্থে যদি উক্তরূপ (দুর্বল) হাদিস থাকে তাহলে এর দ্বারা কোন পার্থক্য নির্ণিত হচ্ছে না। বরং যে কোন মুসলমান এগুলো পাঠ করে উপকৃত হতে পারেন।[১৯২]

মুফতি তকী উসমানী সাহেবের উপরোক্ত মন্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট হলো যে, দুর্বল হাদিস হলে তা একেবারে পাঠ করাই যাবে না- এরূপ সিদ্ধান্ত মূলত ভ্রান্ত। দুর্বল হাদিস তাই আদি যুগ থেকে ফুকাহা, আলিম, গবেষক, মুহাদ্দিসীনে কিরাম হাদিসের কিতাব থেকে মুছে দেন নি। এসব হাদিস দ্বারাও মুসলিম উম্মাহ্ অতীতে যেভাবে উপকৃত হয়েছেন, বর্তমানে এবং ভবিষ্যতেও বিরাটভাবে উপকৃত হবেন নিঃসন্দেহে।

ফাজায়েলে আমল পাঠ করে মানুষ কুফর, বিদআত, বে-আমলী ইত্যাদি অনৈসলামিক কার্যকলাপ ত্যাগ করে সঠিক দ্বীনদারিত্বের দিকে ফিরে আসছেন। এই কিতাব ও তাবলীগ জামাআতের সফলতাই হলো পুরো আন্দোলনটি হক্ব ও সঠিক হওয়ার সুস্পষ্ট দলিল। আমরা অনুরোধ করবো, সালাফি ভাইগণ তাবলীগ জামাআতকে আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকুন। তাবলীগ জামাআত না থাকলে আজকের যামানায় ক'জন মানুষ সঠিক দ্বীনদারিত্বের মধ্যে টিকে থাকতো, তা একবার ভেবে দেখুন। সমগ্র বিশ্বব্যাপী কোটি কোটি মানুষ এই জামাআত থেকে সরাসরি উপকৃত হচ্ছেন। ধন্য হচ্ছে তাদের ইহ ও পরকালের জীবন।

---

[১৯২] মুফতি তকী উসমানী, ওয়েবসাইট: http://www.albalagh.net/qa/fazail_amaal.shtml)

২০. কে কোন্ মাজহাব অনুসরণ করেন- তার প্রতি কোন তোয়াক্কা না করে যাবতীয় আ'মল একমাত্র তাদের ইমামদের কর্তৃক প্রচারিত পদ্ধতিতে করার জন্য তারা সকল মুসলমানদের উপর 'নির্দেশ' দেন। যেমন:

১. তাকবীরে তাহরিমার পর বুকের উপর হাত বাঁধা, ২. রাফে ইয়াদাইন করা, ৩. দ্বিতীয় সিজদা শেষে সোজা না দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ বসা, ৪. আমিন জোরে বলা, ৫. আত্যাহিয়্যাতু পাঠের সময় শাহাদাত আঙ্গুল তুলে ঘোরানো ও কাঁপানো, ৬. মলিহাদেরকে ঠিক পুরুষের মতো নামায পড়া, ৭. পা ছড়িয়ে নামাযে দাঁড়ানো ইত্যাদি। এসব প্রমাণ করতে যেয়ে তারা কিছু কিছু হাদিস বর্ণনা করেন ঠিকই কিন্তু অপর কোন হাদিসে যে অন্যভাবে নামায আদায়ের কথাও আছে তা তারা গোপন রাখেন। তাদের একটি মাত্র এজেন্ডা- মাজহাব ধ্বংস করা ও তাদের বাতিল বিশ্বাস-আক্বীদা সবার উপর চাপিয়ে দেওয়া। [উক্ত লেখক কর্তৃক প্রণীত বুকলেট, 'সালাতের ধারাবাহিক পদ্ধতি' দ্র:]

তাদের এসব আমল মূলত অগ্রহণযোগ্য হওয়ার দলিল: তাদের এসব আ'মল সকল মাজাহবে অনুসরণ করা হয় না। প্রথমে আমরা চার মাজহাবের সিদ্ধান্ত কি তা জেনে নেবো। এরপর তাদের আমল অমূলক বলে প্রমাণ করবো ইনশাআল্লাহ।

১. তাকবীরে তাহরিমার পর বুকের উপর হাত বাঁধা প্রসঙ্গে: প্রথমে আমরা হানাফী মতামত তুলে ধরবো।

হানাফী মতামত: নাভির নীচে হাত বাঁধতে হবে। এ ব্যাপারে অনেক হাদিস আছে। নীচে কয়েকটি তুলে ধরছি।

ক. হযরত ওয়াইল ইবনে হাজর রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: আমি দেখেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম [নামযে] তাঁর বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে নাভির নীচে হাত বাঁধলেন। [ইবনে আবি শাইবা এই হাদিসখানা সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন]

খ. হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেছেন, "নামাযে বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে নাভির নীচে হাত বাঁধা সুন্নাত।" [দারে কুতনী]

গ. হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেছেন: "ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে নাভির উপর বাঁধা হলো নবুওয়াতের একটি বৈশিষ্ট্য।" [ইবনে হাজম]

ঘ. হযরত আবু জুবাইফা রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু একদা বললেন: "নামাযে হাত বাঁধা সুন্নাত। উভয় হাত (বাঁধাবস্থায়) নাভির নীচে রাখতে হবে।" [রাযিজ]

শাফিঈ মতামত: নাভির উপরে হাত বাঁধতে হবে। বুকের উপর কিংবা স্তনের উপর নয়।

বুকের উপর হাত রাখার ব্যাপারে একটি হাদিস আছে। এটির বর্ণনাকারী ওয়াইল ইবনে হুজর রাদ্বিআল্লাহু আনহু। তিনি বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নামায পড়েছি। তিনি বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে 'বুকের উপর রেখেছেন'"।[১৯৩]

উক্ত হাদিসটি সহীহ না দুর্বল এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের মধ্যে মতানৈক্য আছে। হাদিসের পূর্ণাঙ্গ সনদে 'মুয়াম্মাল বিন ইসমাঈল' নামক একজন বর্ণনাকারী আছেন। তিনি অধিকাংশ হাদিস বিশারদের মতে দুর্বল বর্ণনাকারী। সহীহ মুসলিমসহ অন্যান্য কিতাবে একই হাদিস বর্ণিত হয়েছে ভিন্ন সনদে। কিন্তু কেউই 'বুকের উপর রেখেছেন' কথাটি বলেন নি। এছাড়া হযরত সুফিয়ান সওরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং আসিম বিন কুলাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকেও একই হাদিস বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপ নিম্নলিখিত বিভিন্ন বর্ণনাকারী হাদিসখানা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু কোথাও বলা হয় নি- 'তিনি বুকের উপর হাত রেখেছেন'। এরূপ বর্ণনার কয়েকটি সূত্র হলো:

১. শুয়াব, আবদুল ওয়াহিদ এবং জুবায়ির বিন মুয়াবিয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহুম থেকে - মুসনাদে আহমদে। [মুসনাদে আহমদ: ১৮৩৯৮, ১৮৩৭১ এবং ১৮৩৯৭]

[১৯৩] ইবনে খুজাইমাহ।

২. হযরত জায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে (মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ, দারিমী, নাসাঈ এবং বাইহাকীতে)।

৪. হযরত বিশ্‌র বিন মুফাজ্জাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে (ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ ও নাসাঈতে)।

৫. আবদুল্লাহ বিন ইদ্রিস রাদ্বিআল্লাহু আনহু (ইবনে মাজাহ্‌র মধ্যে)।

৬. সালাম বিন সালিম রাদ্বিআল্লাহু আনহু (আবু দাউদ ও মুসনাদে তাইলিসিতে)।

আমরা বলেছি প্রথম হাদিসের একজন রাবী মুয়াম্মাল বিন ইসমাঈল রাহিমাহুল্লাহ দুর্বল বর্ণনাকারী। এখানে কথাটির প্রমাণ তুলে ধরছি।

হাত বুকের উপর রাখা সম্পর্কিত যেসব হাদিসে মুয়াম্মাল বিন ইসমাঈল একজন রাবী হিসাবে উল্লেখিত হয়েছেন ওসব হাদিসেই এই অতিরিক্ত কথাটি আছে। সুতরাং এই রাবীর উপর বিশেষ দৃষ্টি পড়ে মুহাদ্দিসীনে কিরামের।

ইমাম মুহাম্মদ নাসির মারওয়াজি রাহিমাহুল্লাহ মুয়াম্মাল বিন ইসমাঈলকে একজন দুর্বল বর্ণনাকারী বলেছেন। বিখ্যাত হাদিস বিশারদ মারওয়াজি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ২০২ হিজরীতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিশাপুরে বেড়ে ওঠেন ও শেষমেশ সমরকন্দে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। ইসলামী জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে তিনি তখনকার যুগের প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র মক্কা মুকাররমা, মদীনাতুল মুনওয়ারা, বাগদাদ, খুরাশান, রায়, বসরা, কুফা, মিশর ও দামেস্ক সফর করেন। তাঁর উস্তাদদের মধ্যে ছিলেন ইয়াহইয়া ইবনে তামিম, ইসহাক ইবনে রাহওয়ায়ী, ইউনুস ইবনে আবদুল আ'লা এবং ইব্রাহীম ইবনে মুনদার রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমুখ হাদিস বিশারদ। যুগের প্রসিদ্ধ ফকীহ, ওলি ও মুহাদ্দিসীনে কিরাম তাঁর প্রশংসা করেছেন, যেমন: ইবনে হিব্বান, খতীবে বাগদাদী, ইমাম হাকিম এবং কাজি মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ। শেষোক্ত ব্যক্তি বলেন: "আমরা আগের যুগের ফকীহদের বর্ণনা থেকে জানতে পেরেছি, খুরাশানে চার ব্যক্তি সর্বাধিক জ্ঞানবান ছিলেন: ১. আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক, ২. ইসহাক ইবনে রাহওয়ায়ী, ৩. ইয়াহইয়া ইবনে তামিমী এবং ৪. আবু আবদুল্লাহ মারওয়াজী (তাঁর অপর নাম) রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম।"

মুয়াম্মাল বিন ইসমাঈল রাহিমাহুল্লাহ হাদিসের রাবী হিসাবে তাঁর সম্পর্কে নেতিবাচক আরো মন্তব্য করেছেন: ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মায়ীন, ইমাম তিরমিযী, ইমাম নাসাঈ, ইমাম ইবনে হাজর হাইছামী, ইমাম বুখারী, ইমাম আবু হাতীম, ইমাম দারে কুতনী, হাফিজ ইবনে হাজর আসকালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমুখ জগতখ্যাত উলামা-মাশাইখ।

নাবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুকের উপর হাত বাঁধতেন বলে আরো কয়েকটি হাদিস পাওয়া যায়। তবে এগুলোরও অধিকাংশ জঈফ। আমরা সংক্ষিপ্তভাবে এসব হাদিসের কথা উল্লেখ করবো মাত্র।

১. হযরত আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর মুসনাদে বলেন: হযরত হুল্‌ব রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, 'আমি দেখেছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বাম ও ডান দিক থেকে ঘুরেছেন এবং বুকের উপর (হাত) রেখেছেন।' একজন রাবী ইয়াহইয়া বলেন, এটা হলো বাম হাতের উপর ডান হাত কব্জি বরাবর রাখা। [মুসনাদে আহমদ]

হযরত হাসিম সিন্ধী রাহিমাহুল্লাহ 'দিরহামুস-সুররা' কিতাবে বলেন: এই হাদিসের দুজন রাবী সিমাক বিন হারব ও কাবীসাহ উভয়ে তা'দিল নন [সাব্যস্ত নন] বলে উলামায়ে কিরামের অনেকে মন্তব্য করেছেন। একই হাদিস অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত আছে কিন্তু 'তাঁর বুকের উপর' এই অতিরিক্ত কথাটি নেই। যেসব কিতাবে হাদিসখানা বর্ণিত আছে এদের মধ্যে দারে কুতনী উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ইমাম নববী তা'লিক্ব আল-হাসান গ্রন্থে বলেন, সম্ভবত কথাটি হবে, 'ইয়াদাহু আলা ইয়াদিহি', অর্থাৎ 'তিনি হাতের উপর হাত রাখতেন' এবং একথা নয় 'ইয়াদিহি আলা সাদরিহি' অর্থাৎ 'এই হাত তাঁর বুকের উপর'। যারা এই হাদিসখানা সন্দেহ হেতু স্ব-স্ব কিতাবে উদ্ধৃত করেন নি তাঁরা ও তাঁদের কিতাব হলো: হযরত হাইছামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর মাজমাল জওয়ায়িদ, হযরত সুয়ূতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর জাম'আল জাওয়ামী এবং আলী মুত্তাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর কানযুল উম্মাল।

আবু দাউদ শরীফেও 'বুকের উপর হাত রাখার' একটি হাদিস আছে। কিন্তু ইমাম নববী এটি দুর্বল বলে ঘোষণা দিয়েছেন।[১৯৪] এছাড়া হাসিম সিন্ধী

[১৯৪] তা'লিক্ব আল-হাসান, খ.১, পৃ: ১৪৫।

বলেছেন, হাদিসখানার দু'জন রাবী সম্পর্কে সন্দেহ আছে। এরা হলেন সুলাইমান বিন মূসা ও হাইছাম বিন হুমাইদ।[১৯৫]

বাইহাকী শরীফেও 'বুকের উপর হাত রাখার' একটি হাদিস লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু ইমাম নববী এই হাদিস সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন: "এর ইসনাদ অত্যন্ত দুর্বল। জাহাবী মিযান গ্রন্থে বলেন, মুহাম্মদ হুজর (একজন রাবী) মুনকার [অস্বীকৃত] বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারীও বলেছেন, তাঁর উপর সন্দেহ আছে। রাবী সাঈদ বিন আবদুল জাব্বারও দুর্বল। জাহাবী তাঁর মিযানে নাসাঈ শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, সাঈদ বিন আবদুল জাব্বার শক্তিশালী নন। হাফিজ ইবনে হাজর তাঁর তাক্বরীব কিতাবে বলেন, 'সাঈদ বিন আবদুল জাব্বার হাদরামী আল-কুফী দুর্বল।'"[১৯৬]

'বুকের উপর হাত রাখার' বর্ণনাসহ আরো তিনটি বিশেষ হাদিস আছে। এগুলো বর্ণিত হয়েছে: বাইহাকীতে দু'টি ও একটি আবু দাউদ শরীফে।

প্রথম দু'টি হাদিস কুরআনের আয়াত: "আপনার প্রভুর উপাসনা করুন ও কুরবানী দিন" [সূরা কাওসার : ২] এর ব্যাখ্যা হিসাবে বর্ণিত হয়েছে: "আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু (প্রথম হাদিসের বর্ণনাকারী) এবং ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু (দ্বিতীয়টির বর্ণনাকারী) বলেছেন: এটার অর্থ বাম হতের উপর ডান হাত রেখে বুকের উপর বাঁধা।" কিন্তু ইবনে জরীর তাবারি উক্ত আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন: "এই আয়াতের অর্থ হলো, হে রাসূল! আপনার প্রভুর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আপনার যাবতীয় উপাসনা করুন, এতে যেনো অন্য কোন খোদা বা মিথ্যা প্রভুর অংশীদারিত্ব না হয়। অনুরূপ আপনার সকল কুরবানীও যেনো একমাত্র আপনার প্রভুর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হয়, এতেও যেনো কোনো মিথ্যা খোদাকে শরীক করা হয় না।"[১৯৭] তাহলে বাইহাকীতে বর্ণিত আলী ইবনে আবি তালিব ও ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমার মতো মহান সাহাবীদ্বয়ের বর্ণনা সঠিক বলে কেনো সাব্যস্ত করেন নি ইবনে জরীর রাহিমাহুল্লাহ? আসলে এই হাদিস সম্পর্কে ইবনে তুরুকমানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এই হাসীদের মুত্‌ন ও ইসনাদ উভয়টি 'মুজতারাব'

[১৯৫] দিরহাম আস-সুররা, পৃ: ২৭।
[১৯৬] তা'লিক্ব আল-হাসান, খ.১, পৃ: ১৪৫।
[১৯৭] তাফসীরে তাবারী, খ. ১২, পৃ: ৭২৪।

[ধারণাভিত্তিক]।[১৯৮] আর এ কারণেই ইবনে জরীর এটির উপর আস্থা রাখেন নি।

দ্বিতীয় হাদিসের তিনজন রাবী দুর্বল। এরা হলেন, আমর বিন নকরী, ইয়াহইয়া ও রাওহ বিন মুসাইয়িফ। এছাড়া হাদিসটি 'মুনক্বাতি' [কর্তিত] পর্যায়ের।[১৯৯] ইমাম নববীও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন তাঁর তা'লিক্ব আল-হাসান গ্রন্থে। [খ.১, পৃ: ১৪৬] এছাড়া ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণিত একটি মারফু হাদিস মুহিতুল বুরহানী ও মাযমা'আল বাহরেইন কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে যেখানে তিনি বলেন: "এটা সুন্নাতের অংশ যে, বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে নাভির নীচে বাঁধা হবে।"

হযরত আলী ইবনে আবু তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণিত তৃতীয় হাদিসে অবশ্য 'বুকের উপর' কথাটির বদলে 'নাভীর উপরে' বলা আছে।

এই হাদিস সম্পর্কে ইমাম নববী বলেন: "অতিরিক্ত শব্দদ্বয় 'নাভির উপরে' সহীহ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। একই হাদিস সফীনাহ জারাদিয়্যাতে বুখারী রাহিমাহুল্লাহর একজন উস্তাদ মুসলিম ইবনে ইব্রাহীম রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে। এছাড়া এটি মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহতেও আছে। এসব কিতাবের বর্ণনায় 'নাভীর উপরে' কথাটি নেই।

উপরোক্ত আলেচনা থেকে শাফিঈ কিংবা যে কোন মাজহাবের আমলকে অবৈধ কিংবা অগ্রহণযোগ্য হিসাবে সাব্যস্ত করা মোটেই আমাদের উদ্দেশ্য নয়। ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত এটি। সুতরাং তাঁর মাজহাবের অনুসারীরা এই আমল করবেন এটাই স্বাভাবিক। আমরা এই আলোচনা দ্বারা এটাই বুঝাতে চাচ্ছি যে, হাত নাভীর নীচে রাখার ক্ষেত্রে হানাফী সিদ্ধান্ত মূলত সঠিক। আর মাজহাবের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সালাফিদের বক্তব্য সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন।

সবশেষে আমরা মালিকী ও হাম্বলী মাজহাবের সিদ্ধান্ত কি তা এখন জেনে নেবো। মালিকী মাজহাবের একটি বিরাট দল আছেন যারা হাত বাঁধাই জরুরী মনে করেন না! অপর দল বলেন, ইমাম মালিক হাত ছেড়ে নামায পড়ার কথা

[১৯৮] আয-জাওহারুন নাক্বী, খ.২, পৃ: ৪৬।
[১৯৯] আল্লামা হাসিম, দিরহামুস-সুররা, পৃ: ৩৮।

বলেন নি। হাম্বলী মাজহাবের সিদ্ধান্ত হানাফীদের মতো। অর্থাৎ তারাও নাভির নীচে হাত বাঁধেন।

সুতরাং বুকের উপর হাত বাঁধার ক্ষেত্রে শাফিঈ সিদ্ধান্ত ইজতিহাদী। বাকী তিন মাজহাবের ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত নাভির নীচে কিংবা (মালিকীদের একদলের ক্ষেত্রে) হাত না বাঁধা। সালাফিরা কিন্তু এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে থাকেন। তাদের কেউ কেউ নিজেদের আলাদা বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করতে যেয়ে বুকের উপর নয় বরং একেবারে উভয় স্তন ঢেকে মহিলাদের মতো হাত বাঁধেন! অবশ্য মহিলাদের হাত বাঁধা তারা নকল করেই ছাড়েন নি, মহিলাদেরকে তারা ইদানিং নির্দেশ দিচ্ছেন পুরুষের মতো পা ছড়িয়ে দাঁড়াতে এবং পুরুষের মতো সিজদায় যেয়ে নিতম্ব উঁচু রাখতে! তাদের মতে নারী ও পুরুষের নামাযে নাকি মোটেই পার্থক্য নেই! অথচ ১৪০০ বছরব্যাপী সবাই বলে আসছেন, নারীদের নামাযে কিছুটা পার্থক্য বিদ্যমান। নারী-পুরুষের নামাজে পার্থক্য সম্পর্কিত তাদের ধারণাও যে বাতিল, তার প্রমাণ আমরা পরবর্তীতে তুলে ধরবো ইনশাআল্লাহ।

২. রাফে ইয়াদাইন প্রসঙ্গে: সালাফিরা রাফে ইয়াদাইনের ক্ষেত্রে অনড়। শুধু তাই নয়, তাদের অন্যান্য সকল আমলের মতো জগতের সকল মুসলমান এটিও অনুসরণ করুক- এটাই তাদের কাম্য। চার মাজহাবের সিদ্ধান্তের উপর তারা মোটেই তোয়াক্কা করেন না। তাদের কথিত ইমাম আলবানি, বিন বায আর উসাইমিন কি বললেন, সেটাই তাদের নিকট মূখ্য। অর্থাৎ তারা এদের 'অন্ধ অনুসারী'। সালফে সালিহীনের যুগ থেকে এযুগ পর্যন্ত অসংখ্য মহাত্মন উলামায়ে কিরাম কি বলেন, সেটা তারা শুনতেই রাজী নন।

নামাযে প্রথম তাকবীর (তাকবীরে তাহরিমা) সম্পর্কে কোন মতানৈক্য নেই। মুতাওয়াত্তির হাদিস দ্বারা এটি প্রমাণিত। ফিকহুস্ সুন্নাহ'র লেখক সাঈদ সাবিক বলেন: "ইবনুল মুনযির বলেছেন: 'সকল উলামা এ ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাতদ্বয় নামাযের শুরুতে [তাকবীরে তাহরিমার সময়] উঠিয়েছেন।' এই বর্ণনার ব্যাখ্যায় ইবনে হাজর আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ লিখেছেন, 'প্রথম তাকবীরের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক হাত উত্তোলনের বর্ণনা এসেছে পঞ্চাশ জন সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুম থেকে। এদের মধ্যে

আছেন দশ জন সাহাবা যাঁরা পৃথিবীতে থাকাকালে বেহেশত লাভের সুসংবাদ পেয়েছিলেন।’

ইমাম বাইহাকী বর্ণনা করেছেন, হাকিম রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ‘আমি এটি ছাড়া এমন আরেকটি সুন্নাহ পাই নি, যার উপর নিঃসন্দেহে আমল করেছেন খুলাফায়ে রাশিদীন, ১০ জন বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্ত আসহাবে কিরাম ও বহু দেশে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুম।’[২০০] একটি সূত্র থেকে জানা যায়, আজকের যুগেও সে যুগের ‘খারিজী’ ফিতনাবাজদের একদল লোক অবশিষ্ট আছে যারা তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত উত্তোলন করে না এবং হাত (নভি কিংবা বুকের উপর) বাঁধেও না। এদেরকে বলে, ‘ইবাদিয়া সম্প্রদায়’।

উপরের আলেচনা থেকে স্পষ্ট, প্রথম তাকবীরের সময় হাত উত্তোলন করতে হবে। কিন্তু এরপর নামাযের মধ্যে অন্যান্য তাকবীরের সময় [যেমন রুকুতে যেতে ও উঠতে, সিজদায় যেতে ও উঠতে, দাঁড়াতে ইত্যাদি ক্ষেত্রে] হাত উত্তোলন করা জরুরী কি না সে ব্যাপারে (এ যুগে এসে) বেশ মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে। এ নিয়ে সালাফি ভাইগণ ‘চায়ের কাপে ঝড়’ তুলে ফেলেছেন! রাফউল ইয়াদাইন না করলে তারা দস্তরমতো রাগান্বিত হন, মুসল্লিদেরকে গালিগালাজও করেছেন বলে প্রমাণ আছে। আমরা এরূপ বাড়াবাড়ি কামনা করি না। এখন কথা হচ্ছে, রাফউল ইয়াদাইন সম্পর্কে হাদিসের ভাষ্য কি? একটু পরই আমরা তা জেনে নেবো, ইনশাআল্লাহ। প্রথমে সালাফিরা কেনো রাফউল ইয়াদাইনে এতো অনড় তা তলিয়ে দেখা যাক।

আলবানি তার ‘সিফাতু সালাতিন নাবী’ গ্রন্থে বলেন: ***“হাত উত্তোলন মুতাওয়াতির হিসাবে বর্ণিত হয়েছে, যেভাবে রুকুর পরে হাত উত্তোলনের বর্ণনা এসেছে। এটাই তিনজন মাজহাবের ইমাম- ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমদের সিদ্ধান্ত। এছাড়া হানাফী ফিকাহ্‌র অধিকাংশ আলিমও তা-ই মনে করেন। ইমাম মালিক তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এই আমল করেছেন। এটি ইবনে আসাকির [১৫/৭৮/২] বর্ণনা করেছেন। কিছু হানাফী রাফি ইয়াদাইন করতে পছন্দ করেছেন। এদের মধ্যে ইমাম ইবনে ইউসুফ এবং আবু আসামা***

[২০০] ফিকহুস-সুন্নাহ, খ.১, পৃ. ১২৯।

বলখী (মৃ. ২১০ হি.) উল্লেখযোগ্য। তিনি ইমাম আবু ইউসুফের ছাত্র ছিলেন। এ সম্পর্কে ভূমিকায় বলা হয়েছে।”[২০১]

আলবানির উক্ত মতের উপরই সালাফিরা ‘অন্ধভাবে তাক্বলিদ’ করেন। কিন্তু তার এই মতামত সূক্ষ্মভাবে আলেচনার প্রয়োজন। এতে যে ভ্রান্তি আছে তা সহজেই পাঠকরা বুঝতে পারবেন বলে আমরা আশা করি।

প্রথমে এটা বলে রাখা দরকার যে, মরহুম আলবানি ‘একটি অংশ সত্য বলেছেন ঠিকই, কিন্তু নিজের মতামত অংশটি বানিয়ে ফেলেছেন!’ এটা সত্য যে ইমাম শাফিঈ ও ইমাম হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা রাফউল ইয়াদাইনের পক্ষে মতামত দিয়েছেন। কিন্তু এটা মোটেই সত্য নয় যে, ইমাম মালিক মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এই আমল করেছেন। সূত্র হিসাবে তিনি ইবনে আসাকিরের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি ছিলেন শাফিঈ মুহাদ্দিস এবং আবুল হাসান আশআরী রাহিমাহুল্লাহর শক্ত সমর্থক।

বাস্তবে ইমাম মালিকের মতামত ও মালিকী মাজহাবের সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্ত হলো, তাকবীরে তাহরীমার সময় ছাড়া রাফউল ইয়াদাইন বৈধ নয়। ইবনে আসাকির যদি বলেও থাকেন, বলতে পারেন। কিন্তু তিনি মালিকী ফকীহ ছিলেন না। মালিকী মাজহাবের সিদ্ধান্ত কি তা জানতে হলে কোনো নির্ভরযোগ্য মালিকী সূত্র থেকে জানতে হবে। অন্যান্য মাজহাবের ক্ষেত্রেও একই কথা সত্য। আলবানি তার মতামতকে দৃঢ় করার অপচেষ্টা করেছেন সংশ্লিষ্ট হাজহাবের সূত্র ছাড়া ভিন্ন সূত্রকে ব্যবহার করে! এটা বিজ্ঞানের সমস্যা সমাধানে দর্জির নিকট থেকে সমাধান খোঁজার মতোই মনে হয়!

ইবনে আসাকিরের মন্তব্য (যদি তা সঠিক হয়ে থাকে, এ ব্যাপারে সন্দেহ আছে) তিন শত বৎসর পর এসেছে। ইমাম মালিক ইবনে আনাস রাহিমাহুল্লাহ ইন্তিকাল করেন ১৭৯ হিজরীতে। ইবনে আসাকির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মারা যান ৪৯৯ হিজরীতে। রাফউল ইয়াদাইন সম্পর্কে ইমাম মালিকের বাস্তব সিদ্ধান্ত কি ছিলো, তাঁর সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ছাত্রের সূত্রে আমরা একটু পরই উদ্ধৃত করবো।

[২০১] সিফাতু সালাতিন নাবী, পৃ. ৪২।

ইবনে আসাকির (মালিকী মাজহাবের বিরোধী হয়ে) যদি উপরোক্ত মন্তব্য করেই থাকেন, তথাপি ইমাম মালিকের বাস্তব সিদ্ধান্তের আলোকে এটি বাতিল বলে মেনে নিতে হবে। অন্য কথায়, এই বর্ণনা কখনো মালিকী মাজহাবের দলিল হতে পারে না, যা আলবানি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। বাস্তবে রাফউল ইয়াদাইনের আমল করেন নি এমন একদল সালফে সালিহীন আছেন যাঁরা ছিলেন দ্বীনের নক্ষত্র স্বরূপ। এদের মধ্যে ইমামে আজম হযরত আবু হানীফা, হযরত হাম্মাদ ইবনে আবি সুলাইয়মান, হযরত ইব্রাহীম নাখাওয়ী, বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর দু'জন শাগরিদ হযরত আলক্বামা এবং হযরত আসওয়াদ, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ শাইবানী, হযরত সুফিয়ান সওরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমসহ অসংখ্য প্রাথমিক যুগের উলামা-মাশাইখ। অনেক সহীহ বর্ণনা দ্বারা এ সত্যটি প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং কেনো এই মতপার্থক্য?

বিষয়ের উপর সহীহ হাদিসের আলোকে 'ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত' হলো এই মতানৈক্যের কারণ। একজন মুজতাহিদ এক হাদিসের উপর অপরটি থেকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। অপরজন অপরটির উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন- এই যা। সুতরাং দু'টি মাজহাবে [হানাফী ও মালিকী] প্রথমটির পর রাফউল ইয়াদাইন নেই। আর দু'টিতে আছে। উভয় মতামত বৈধ ও সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। এখন কেউ যদি তার মাজহাব অনুসরণের কারণে রাফে ইয়াদাইন করে তাহলে সেটা তার জন্য সঠিক। অনুরূপ কেউ যদি তার মাজহাব অনুসরণের কারণে রাফে ইয়াদাইন করে না, তাহলে সেটাও তার জন্য বৈধ এবং সঠিক। কিন্তু সমস্যা দাঁড়ায় যখন কেউ এটার উপর আমল করে ও অপরকে আমল করতে বলে মাজহাবের সিদ্ধান্তের উপর তোয়াক্কা না করে। এই কাজটি ইসলামে বৈধ নয়। এরূপ বলা হবে 'ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত' করার অনুরূপ। আর ইজতিহাদ করার যোগ্যতা অর্জন ছাড়া এর প্র্যাকটিস মোটেই বৈধ নয়।

সালাফিদের কথিত ইমাম আলবানি, উসাইমিন এবং বিন বায প্রমুখ কেউই 'মুজতাহিদ' ছিলেন না। ইজতিহাদী সিদ্ধান্তের উপর ভিন্ন মত তারাই মানতে পারেন যারা তাক্বলিদ করেন না। বাস্তবে চার মহাত্মন মুজতাহিদ মতলক ইমামের সমপর্যায়ের কোনো ফকীহ আজ পর্যন্ত জন্ম নেন নি। এ কারণেই অসংখ্য ইমাম পর্যায়ের ফকীহ, ওলি, উলামা ও দ্বীনের গবেষক যুগ

যুগ ধরে কোন না কোন মাজহাবের অনুসরণ করে আসছেন। দ্বীনকে সঠিকভাবে পালনের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা অতিরিক্ত তাক্বওয়া হেতু মুজতাহিদ ইমামদের সিদ্ধান্তকে মেনে নিয়েছেন। কারণ, তাঁরা জানেন- দ্বীন সম্পর্কে আইম্মায়ে মুজতাহিদীন থেকেও অধিক জ্ঞানের অধিকারী তাঁরা নন।

আমরা এখানে যেসব মহাত্মন নক্ষত্রপুরুষের কথা বলার চেষ্টা করছি তাঁদের জ্ঞান-প্রজ্ঞা, কুরআন-হাদিসের উপর জ্ঞানের গভীরতা ইত্যাদি গুণাবলী আজকের যুগের সর্বাধিক বড় আলিমের সঙ্গে তুলনা করাই অচিন্তনীয় ব্যাপার। অথচ সালাফিরা ইমাম হিসাবে এ যুগের স্ব-শিক্ষিত আলবানি, সাধারণ আলিম বিন বায ও উসাইমিনকে গ্রহণ করে নিয়েছেন! আগের যুগের মহাত্মনরা রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের নিকটবর্তী ছিলেন। আর এ যুগের আলিমরা অনেক দূরে। পাঠকরা ভেবে দেখুন, দ্বীন সম্পর্কে সঠিক বুঝ-জ্ঞান-প্রজ্ঞা কাদের বেশী হবে? বাস্তবে সে যুগের তাঁদের তুলনায় এ যুগের চরম বিদআতী আলবানি গং কিছুই নন!

সালাফি ইমাম আলবানি ও আরেক সালাফি গবেষক আবু আমিনা বিলাল ফিলিফ্স এক আশ্চর্য তথ্য দিয়েছেন। তারা বলেছেন, ইমাম ইউসুফ বলখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রাফউল ইয়াদাইনের আমল করতে 'পছন্দ' করেছেন এ কারণে যে, তিনি জানতেন না ইমামে আজমের সিদ্ধান্ত ছিলো, প্রথমটির পরে রাফেউল ইয়াদাইন অহেতুক।[২০২]

কী অদ্ভুত কথা! ইমামে আজমের একান্ত নিকটস্থ শাগরিদ ও ছাত্র ছিলেন ইমাম ইউসুফ। তিনি কি কখনো তাঁর উস্তাদের পেছনে বা সাথে নামায পড়েন নি? তিনি কি লক্ষ্য করেন নি, ইমামে আজম প্রথমটির পর আর রাফউল ইয়াদাইন করেন নি? এই অবিশ্বাস্য তথ্য দ্বারা সালাফি গবেষকরা প্রমাণ করতে চান হানাফীরাও রাফউল ইয়াদাইন করেছেন! আর যে কোন ক্ষেত্রে এটাও জানা থাকা দরকার যে, মুজতাহিদ ইমামের নিকটস্থ উচ্চপর্যায়ে ফকীহ ছাত্ররাও ইজতিহাদের যোগ্যতা রাখতেন। বাস্তবে দেখাও গেছে চার মাজহাবের ইমামের কিছু কিছু সিদ্ধান্তের উপর তাঁদের ছাত্ররা ভিন্নমত পোষণ

---

[২০২] সিফাতু সালাতিন নাবী, পৃ: ১৭ এবং আবু আমিনা বিলাল ফিলিফ্স প্রণীত 'দ্যা ইভুলুশন অব ফিক্হ', পৃ. ১২৬।

করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁদের এসব ভিন্নমত মাজহাবের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসাবে গৃহীতও হয়েছে।

সবশেষে আমরা হযরত ইমামে আজম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত একটি সহীহ হাদিস এখানে তুলে ধরছি। হাদিসটি এই:

-"ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর উস্তাদ ইব্রাহীম নাখায়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে, তিনি হযরত আবি সুলাইমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে, তিনি তাঁর দু'জন উস্তাদ [হযরত ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর শাগরিদ] ইমাম আলক্বামা ও ইমাম আসওয়াদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা থেকে, তাঁরা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন:

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً

-আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন: 'আমি কি আপনাদেরকে নামাজ পড়ে দেখাবো যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়তেন?' রাবী বলেন, 'তিনি পড়লেন এবং শুধুমাত্র একবার [তাকবীরে তাহরিমার সময়] হাত উঠালেন।'" [আবু দাউদ][২০৩]

রাফে ইয়াদাইন শুধুমাত্র প্রথম তাকবীরের সময় করাই সহীহ মতামত। কেউ কেউ প্রাথমিক জীবনে রাফউল ইয়াদাইন [প্রথম তাকবীর পরেও] করেছেন কিন্তু শেষমেশ এটা যে 'রহিত' হয়ে গিয়েছিল তা নিশ্চিতভাবে জানতে পেরে এই আমলটি ছেড়ে দিয়েছিলেন। আমরা নীচে প্রমাণ হিসাবে দু'জন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির কথা তুলে ধরছি।

---

২০৩ ইবনে মাসউদের এই প্রখ্যাত হদীসটি বিভিন্ন ইসনাদে ইমাম তিরমিযী, ইমাম নাসাঈ, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম দারে কুতনী, ইমাম ইবনে আবি শাইবাহ, ইমাম তাহাবী ও ইমাম ইবনে মাজাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম তাঁদের স্ব-স্ব কিতাবে বর্ণনা করেছেন।

ক. হযরত আবু জা'ফর তাহাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ৩২১ হি.]

তিনি 'মুজতাহিদ ফিল মাসাঈল' ছিলেন। তবে তিনি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ 'আল আক্বীদাতুত তাহাবী' গ্রন্থের জন্য। প্রাথমিক জীবনে তিনি শাফিঈ মাজহাবের অনুসারী ফকীহ ছিলেন। তিনি তাঁর বিখ্যাত চাচা ইমাম মুজানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির শাগরিদ ছিলেন। আর মুজানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির শাগরিদ। পরবর্তীতে ইমাম তাহাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি শাফিঈ মাজহাব পরিত্যাগ করে হানাফী মাজহাবের অনুসারী হন। সুতরাং রাফউল ইয়াদাইনের আমলও তিনি পরিহার করেন। তিনি যে যুগে জীবিত ছিলেন, সে সময় অধিকাংশ হাদিস গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়ে গিয়েছিল। যেমন বুখারী ও মুসলিম শরীফ। তাই রাফউল ইয়াদাইনের উপর হাদিসগুলো তিনি ভালোভাবে পরীক্ষা-নীরিক্ষার সুযোগ পান। অবশেষে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মতামত সর্বাধিক শক্তিশালী। তিনি কিছু হাদিসের উদ্ধৃতিও দিয়েছেন যার দ্বারা তিনি প্রমাণ করেছেন, রাফউল ইয়াদাইন একটি 'রহিত' আমল।

খ. ইমাম মুহাম্মদ আমিন ইবনে আবিদীন রাহিমাহুল্লাহ [মৃ. ১২৫২ হি.]

তিনিও প্রাথমিক জীবনে শাফিঈ মাজহাবের অনুসারী আলিম ছিলেন। কিন্তু পরে এই মাজহাব ছেড়ে হানাফী মাজহাবের প্রসিদ্ধ বুজুর্গ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। এরই মাধ্যমে রাফউল ইয়াদাইনের আমল তিনিও পরিত্যাগ করেছিলেন। হযরত ইবনে আবিদীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সর্বাধিক প্রসিদ্ধ কিতাবের নাম 'হাশিয়া রাদ্দুল মুখতার'।

রাফউল ইয়াদাইনের ক্ষেত্রে ইমাম মালিকের মতামত

আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি আলবানি ইবনে আসাকিরের উদ্ধৃতি দিয়ে **'ইমাম মালিক রাফউল ইয়াদাইন করেছেন মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত'** কথাটি বলে তার নিজের মতামতকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এই মতামত ইমাম মালিকের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ শাগরিদ ইমাম ইবনুল ক্বাসিম রাহমাতুল্লাহি

আলাইহি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সঙ্গে সরাসরি সাংঘর্ষিক! মালিকী মাজহাবের গুরুত্বপূর্ণ কিতাবের নাম 'আল-মুদাওয়ানাহ'। এই গ্রন্থে লিখিত আছে: "ইমাম মালিক বলেছেন, শুধুমাত্র প্রথমটি ছাড়া অন্য কোন তাকবীরের সময়, এমনকি রুকুর সময়ও রাফউল ইয়াদাইন করা তাঁর জানা নেই।" এটুকু বলে ইবনে ক্বাসিম মন্তব্য করেন: "ইমাম মালিকের মতে রাফউল ইয়াদাইন একটি জঈফ আমল [দুর্বল আমল]।"[২০৪]

অনেকে প্রশ্ন করবেন, ইমাম সাহেব রাফউল ইয়াদাইনের বিপক্ষে মতামত দিয়েও কেনো তাঁর মুয়াত্তায় রাফউল ইয়াদাইনের পক্ষে দু'টি হাদিস বর্ণনা করলেন? প্রথমে আমরা মুয়াত্তায় বর্ণিত হাদিসদ্বয়ের উদ্ধৃতি তুলে ধরছি।

১. প্রথম হাদিস: "ইয়াহইয়া আমার নিকট ইমাম মালিক থেকে, তিনি ইবনে শিহাব থেকে, তিনি সালিম ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের শুরুতে [প্রথম তাকবীরের সময়] তাঁর কাঁধ মুবারক পর্যন্ত হাত তুলতেন এবং রুকু থেকে মাথা মুবারক উত্তোলন করাকালেও তিনি হাতদ্বয় কাঁধ পর্যন্ত তুলতেন একথা বলে, 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ!'। তিনি সিজদার সময় হাত তুলেন নি।" [মুয়াত্তা ইমাম মালিক]

২. দ্বিতীয় হাদিস: "ইয়াহইয়া আমাকে ইমাম মালিক থেকে, তিনি হযরত নাফি' থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা নামাযের প্রথম তাকবীরের সময় তাঁর কাঁধ বরাবর হাত উত্তোলন করতেন এবং যখন তিনি রুকু থেকে উঠতেন তখনো তাঁর হাতদ্বয় এর থেকে কম উঠাতেন।" [মুয়াত্তা ইমাম মালিক]

উপরোক্ত [২য়] হাদিসখানা ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমও বর্ণনা করেছেন। এছাড়া একই হাদিস সামান্য রদবদল করে আরো অনেক হাদিস সংকলক তাঁদের স্ব-স্ব কিতাবে বর্ণনা করেছেন। এই হাদিসগুলোই রাফে

[২০৪]আল-মুদাওয়ানাহ, খ.১, পৃ. ৭১।

ইয়াদাইনের পক্ষে সর্বাধিক সহীহ প্রমাণ। কিন্তু হানাফী ও মালিকী মতামতের পক্ষে নিম্নলিখিত প্রমাণগুলো মূখ্য।

রাফে ইয়াদাইনের বিপক্ষে প্রমাণ ১: ইমাম আবু দাউদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উপরোক্ত হাদিসের মতোই রাফে ইয়াদাইনের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেন,

عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَإِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَيَرْفَعُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ أَبُو دَاوُد الصَّحِيحُ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ لَيْسَ بِمَرْفُوعٍ قَالَ أَبُو دَاوُد وَرَوَى بَقِيَّةُ أَوَّلَهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَأَسْنَدَهُ وَرَوَاهُ الثَّقَفِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَأَوْقَفَهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ فِيهِ وَإِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ يَرْفَعُهُمَا إِلَى ثَدْيَيْهِ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ : قَالَ أَبُو دَاوُد وَرَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَمَالِكٌ وَأَيُّوبُ وَابْنُ جُرَيْجٍ مَوْقُوفًا وَأَسْنَدَهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَحْدَهُ عَنْ أَيُّوبَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَيُّوبُ وَمَالِكٌ الرَّفْعَ إِذَا قَامَ مِنْ السَّجْدَتَيْنِ وَذَكَرَهُ اللَّيْثُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِيهِ قُلْتُ لِنَافِعٍ أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجْعَلُ الْأُولَى أَرْفَعَهُنَّ قَالَ لَا سَوَاءً قُلْتُ أَشِرْ لِي فَأَشَارَ إِلَى الثَّدْيَيْنِ أَوْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ

"ইমাম নাফি' হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নামায সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, তিনি [ইবনে উমর] যখন নামায পড়তেন তখন শুরুতে তাকবীর বলার সময় হাত উঠাতেন। তিনি যখন রুকুতে যেতেন তাকবীর বলে তখনো হাত উঠাতেন। তিনি যখন 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলতেন তখনো হাত উঠাতেন। তিনি এই আমল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের অনুসরণে করতেন।" এটুকু বর্ণনার পর ইমাম আবু দাউদ নিজেই মন্তব্য করেন: "যা সঠিক তাহলো, বাস্তবে এই হাদিসখানা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত যায় নি!" তিনি আরো বলেন: "হাদিসের একজন রাবী বাক্বিয়াহ এটির প্রথম অংশ উবাইদুল্লাহ

থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তা রাসূলুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন। এই বর্ণনা মতে বলা হয়েছে: "তিনি যখন দু' রাকাআতের পর দাঁড়িয়েছিলেন, তখন তিনি তাঁর হাতদ্বয় বুক পর্যন্ত তুলেছিলেন। আর এটাই সঠিক বর্ণনা।" আবু দাউদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এরপর বলেন: "ইবনে উমরের এই বর্ণনাটি এসেছে লাইস ইবনে সা'দ, মালিক, আইউব এবং ইবনে জুরাইজ থেকে। এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তি হিসাবেও বর্ণনা করেছেন হযরত হাম্মাদ ইবনে সালামাহ, হযরত আইউব থেকে। ইবনে জুরাইজ তার বর্ণনায় বলেছেন: "আমি নাফি' রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করেছি, ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু কি উপরে হাত তুলেছেন? তিনি জবাব দিলেন, 'না।' আমি বললাম, কতটুকু পর্যন্ত তুলেছিলেন আমাকে দেখান। তিনি বুক পর্যন্ত বা আরো একটু নীচে ইশারা করে দেখালেন।"[২০৫]

উপরে উদ্ধৃত ইমাম আবু দাউদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মন্তব্য দ্বারা স্পষ্ট হয়েছে যে, ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু সর্বদা রাফে ইয়াদাইন করেন নি। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'রাফে ইয়াদাইন' করতেন বলেছেন ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু। কিন্তু পরবর্তীতে এই আমলটি রহিত হয়ে যায়। এর প্রমাণ হলো আরো অনেক হাদিস আছে যেখানে স্বয়ং আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা সর্বদা রাফে ইয়াদাইনের আমল করেন নি বলে সুস্পষ্ট বর্ণনা মিলে। এছাড়া স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এই আমল থেকে পরবর্তীতে বিরত থাকেন। নিম্নে আমরা ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে কিছু এরূপ হাদিস তুলে ধরছি।

১. হাদিসের ইমাম হযরত আবু আওয়ানাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর সহীহ সংকলনে [খ.২, পৃ. ৯০] হযরত সুফিয়ান ইবনে ওয়াইয়ানা থেকে, তিনি হযরত ইবনে শিহাব জুহরী থেকে, তিনি হযরত সালিম ইবনে আবদুল্লাহ থেকে, তিনি তাঁর পিতা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উভয় হাত উত্তোলন করতে দেখেছি তাঁর কাঁধ মুবারক বরাবর পর্যন্ত যখন তিনি নামায শুরু করতেন। কিন্তু রুকুতে যেতে কিংবা রুকু থেকে উঠার সময় তিনি হাত তুলেন নি; এমনকি উভয় সিজদার মাঝখানেও নয়।"

[২০৫] সুনানে আবু দাউদ।

চার মাজহাবের আলো

২. হাদিস বিশারদ ও ইমাম হযরত ইসমাঈল বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উস্তাদ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর হুমাইদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'মুসনাদে' [খ.২, পৃ. ২৭৭] হযরত সুফিয়ান ইবনে উয়াইয়ানা থেকে, তিনি হযরত ইবনে শিহাব জুহরী থেকে, তিনি হযরত সালিম ইবনে আবদুল্লাহ থেকে, তিনি তাঁর পিতা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি [ইবনে উমর] বলেন, "নামাযের শুরুতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উভয় হাত মুবারক উত্তোলন করেছেন কাঁধ মুবারক পর্যন্ত। কিন্তু রুকুতে যাওয়া ও ওঠার সময় তিনি হাত তুলেন নি। এমনকি উভয় সিজদার মাঝখানেও নয়।"

৩. হাদিস বিশারদ ইমাম ইউসুফ জাইলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ৭৬২ হি.] তাঁর 'নাসবুর রাইয়া' কিতাবে একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন। হাদিসখানার রাবীগণ হলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে খাররাজ, তিনি ইমাম মালিক থেকে, তিনি ইবনে শিহাব জুহরী থেকে এবং তিনি হযরত সালিম বিন আবদুল্লাহ থেকে, তিনি তাঁর পিতা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন: তিনি বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামায শুরুর সময় হাত উঠাতে দেখেছি, এবং তিনি এরপর আর দ্বিতীয়বার হাত তুলেন নি।"[২০৬]

৪. হাদিসের দু'জন বিখ্যাত ফকীহ মুহাদ্দিস ইমাম তাহাবী ও ইমাম ইবনে আবি শাইবাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুর শাগরিগ বিখ্যাত তাবিঈ ইমাম মুজাহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন: "আমি অনেক বার ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর পেছনে নামায পড়েছি। তিনি শুধুমাত্র নামাযের শুরুতে [তাকবীরে তাহরিমার সময়] একবার মাত্র হাত উত্তোলন করেছেন।"[২০৭]

উপরোক্ত চারটি হাদিস দ্বারা শক্তভাবে প্রমাণিত হলো যে, একমাত্র প্রথম তাকবীরের সময় ছাড়া রাফউল ইয়াদাইন এর আমল রহিত হয়ে গেছে। হানাফী ও মালিকী মতামত তা-ই। এখন সবাই নিজেকেই জিজ্ঞেস করুন: 'অলবানীর মতো সনদহীন আলিমের মতামতের উপর কতটুকু আস্থা রাখা

[২০৬] নাসবুর রায়া, খ.১, পৃ. ৪০৪।
[২০৭] মুফতি আহমদ খান, 'জা'আল হাক্ব', পৃ. ৫৫।

যায়? কারণ, দু'জন মুজতাহিদ ইমামসহ অসংখ্য বিখ্যাত ফুকাহায়ে কিরাম যেখানে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, প্রথমবার ছাড়া নামাযে রাফউল ইয়াদাইন একটি রহিত আমল। সে ক্ষেত্রে আলবানির অনুসরণ কতটুকু যুক্তিযুক্ত হতে পারে?' মোটেই নয়।

আমরা এ প্রসঙ্গের ইতি টানার পূর্বে একটি প্রসিদ্ধ ঘটনার কথা উল্লেখ করতে চাই। জানা যায়, হযরত আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও হযরত আওজাই শামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একদা মক্কা মুকাররমায় এক সাক্ষাতে মিলিত হন। তাঁদের মধ্যে ফিকহী বিষয় নিয়ে একটি বাহাস হয়েছিল। একে অন্যের মধ্যে মতামতের ক্ষেত্রে বিরোধিতা থাকলেও খুব নম্র-ভদ্র ভাষায় বাহাসটি সম্পন্ন হয়। আজকের যুগেও এরূপ ভদ্রতা বজায় রেখে বাহাস হলে কতোই না ভালো হতো! যাক, এখন দেখে নিই উভয় বুজুর্গের মধ্যে বাহাসের বাক্যাবলী কি ছিল।

ইমাম আওজাই রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জিজ্ঞেস করলেন: "রুকুর পূর্বে ও পরে আপনি কেনো হাত উত্তোলন করেন না?

ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জবাব দিলেন: "এটা আর প্রমাণিত করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ ব্যাপারে কোন বর্ণনা কিংবা আমলের দলিল নেই।"

ইমাম আওজাই রাহমাতুল্লাহি আলাইহি: 'কিভাবে তা সঠিক হবে? যখন জুহরী আমার নিকট সালিম থেকে, তিনি তাঁর পিতা (ইবনে উমর রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকুর পূর্বে ও পরে হাত তুলতেন? অপরদিকে আপনিও তো বর্ণনা করেছেন, 'হাম্মাদ আমার নিকট ইব্রাহীম থেকে, তিনি আলক্বামাহ থেকে, তিনি আসওয়াদ থেকে, তিনি ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধুমাত্র নামাযের শুরুতে হাত উত্তোলন করেছেন এবং এর পরে আর তুলেন নি!" তিনি এরপর বললেন, "আমার বর্ণিত হাদিসখানা আপনারটি চেয়েও শক্তিশালী।"

ইমামে আজম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি: "হযরত হাম্মাদ হযরত জুহরী থেকে বেশী জ্ঞানবান ছিলেন! আর হযরত ইব্রাহীম হযরত সালিম থেকে বেশী

জ্ঞানবান ছিলেন! সুতরাং ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে সাহাবী হিসাবে মর্যাদা দান করতে হলে আসওয়াদের মর্যাদা অনেক বলতে হবে। আর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মর্যাদা তো এমনিতেই সুস্পষ্ট।"

প্রজ্ঞাপূর্ণ এই জবাব শুনে হযরত আওজাই রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নীরব হয়ে গেলেন।[২০৮]

আর আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন।

৩. ইমাম [ওজর হেতু] বসে নামায পড়লে মুক্তাদীদেরকেও বসে নামায পড়তে হবে: তাদের এই ফাতওয়ার খণ্ডন: আমরা এ ব্যাপারে দু'একটি দলিল-প্রমাণ তুলে ধরবো যে, বাস্তবে এই আমলটি প্রাথমিক যুগে কিছুদিনের জন্য বৈধ ছিলো। পরে এটা রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ব্যাপারটি সকলের জানা থাকলেও আলবানি তা জানতেন না! একটি সহীহ হাদিসে আমলটির বর্ণনা পেয়েই তিনি ফাতওয়া দিয়ে বসলেন, সকল মুক্তাদীকে ইমামের মতো বসতে হবে! হাদিসের উপর তার স্পল্প জ্ঞান ও তাকে বেশ কিছু মুসলমান অনুসরণ করছেন দেখে আমরা দস্তুরমতো শঙ্কিত! একটি ফাতওয়া দিতে হলে যে ন্যূনত কিছু যোগ্যতার প্রয়োজন এটা তিনি ও তাঁর অনুসারীরা মোটেই অনুধাবন করেন নি। অন্যথায় সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত একটি বিষয় নিয়ে এরূপ ফাতওয়া দেওয়া কখনো সম্ভব হতো না। প্রথমে তুলে ধরছি আলবানি সাহেব তার কিতাবে কি বলেছেন।

আলবানি তার সিফাতু সালাতিন নাবী গ্রন্থে বলেন: ***"তিনি [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] রোগাক্রান্ত অবস্থায় বসে নামায পড়েছেন, যে রোগে তিনি ইন্তিকাল করেন। এর পূর্বে অপর আরেক দিনও তিনি বসা অবস্থায় নামায পড়েছেন। তখন তিনি আহত ছিলেন। মানুষ তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করলেন। সুতরাং তিনি নামায শেষে বললেন, "তোমরা কি এমন কাজ করতে চাও যা পারস্য ও রোমের মানুষ করে থাকে? তারা তাদের চেয়ারে উপবিষ্ট সম্রাটদের সামনে দাঁড়ায়। সুতরাং এরূপ করো না, কারণ***

[২০৮] 'Imam Abu Hanifa: Life and Work' by Shibli Numani, p. 66-67; 'Vide: The Ethics of Disagreement in Islam' by Taha Jabir al-Alwani, p. 59-60. হাফিজ ইবনে হুমাম, ফাতহুল ক্বাদির; শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগ্বাহ।

ইমামকে অনুসরণ করতে হয়। যখন তিনি রুকু করেন, তোমরাও রুকু করবে, যখন তিনি উঠেন তোমরাও উঠবে এবং যখন তিনি বসে নামায পড়েন তোমরাও বসে পড়বে [সকলে]। [দেখুন: সহীহ মুসলিম]"[২০৯]

আলবানির উপরোক্ত উদ্ধৃতির আলোকে এখন আমরা প্রমাণ করবো কেনো তিনি এই মাসআলার ক্ষেত্রে মারাত্মক ভুল করেছেন।

বাস্তবে চিরাচরিত নিয়মানুসারে আলবানি সাহেব পুনরায় আমাদেরকে বর্ণনার অর্ধেকটি মাত্র বলেছেন। এর কারণ কি? আমরা জানি না। তবে হয়তো তার 'ইজতিহাদ' করার ক্ষমতা প্রমাণ করতে যেয়ে নিজেকে অতীতের মহাত্মন সত্যিকার মুজতাহিদ ইমামবর্গ ও হক্কানী উলামা-মাশায়েখের চেয়েও বড় হওয়ার ইচ্ছা হেতু এমনটি করে থাকবেন! তবে তিনি এর দ্বারা বড় হন নি! বরং হাদিস শাস্ত্রে তার সীমিত জ্ঞান থাকার ব্যাপারটি উন্মোচন করেছেন।

হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই বিষয়টির উপর আলোকপাত ও দিক নির্দেশনা করেছেন। তিনি লিখেছেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক উক্ত নির্দেশটি ছিলো প্রাথমিক যুগের। তখনকার মানুষের মন থেকে নেতাদের প্রতি অতিভক্তির প্রবণতা মুছে দিতে তিনি এরূপ নির্দেশ করেন। সে যুগে আরবের প্রতিবেশী দু'টি সাম্রাজ্য- পারস্য ও রোমের মানুষ তাদের সম্রাটকে সম্মান জানাতে দাঁড়াতো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ঐতিহ্যটি পছন্দ করেন নি। এটা মানুষের নৈতিক মর্যাদা বিরোধী আমল। সুতরাং তিনি সকলকে এভাবে দাঁড়াতে নিষেধ করেন। কিন্তু পরবর্তীতে যখন মুসলিম সমাজে আত্মসম্মানবোধ প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন এই নির্দেশটি রহিত হয়ে যায়। মুসলমানরা তখন (ওজর হেতু) বসে বসে নামায আদায়কারী ইমামের পেছনেও দাঁড়িয়ে নামায পড়া শরু করেন। কারণ কোনো বৈধ কারণ ছাড়া নামায বসে বসে পড়ার আমল সঠিক নয়।[২১০]

শাহ সাহেবের উক্তির প্রমাণ ও আলবানির সিদ্ধান্তের বিপরীত ভাষ্য সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদিসে আছে। এটা আশ্চর্যের বিষয়

[২০৯] সিফাতু সালাতিন নাবী, পৃ. ৪।
[২১০] হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগ্বা, খ.২, পৃ. ২৭।

যে, স্বঘোষিত 'মুজতাহিদ' আলবানি সাহেব উক্ত আমলটি পরবর্তীতে রহিত হওয়ার সুস্পষ্ট দলিল থাকার ব্যাপারে গাফিল থাকলেন। আর এ দলিল মুত্তাফাকুন আলাইহির হাদিস দ্বারা প্রমাণিত!

ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ তো এ সম্পর্কে আলাদা একটি বাব বা পরিচ্ছেদ তাঁর কিতাবে সম্পৃক্ত করেছেন। এর নাম 'ইমামকে বৈধ কারণ হেতু (যেমন ভ্রমণ, রোগাক্রান্ত বা অন্য কিছু কারণে) তাঁর বদলে অপর কাউকে নামায পড়ানোর জন্য নিযুক্ত করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। আর যদি কোন ইমাম বসাবস্থায় নামাযে ইমামতি করেন, দাঁড়াতে অপারগ হয়ে, মুক্তাদীদেরকে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে হবে যদি না তারা কোন কারণে দাঁড়াতে অপারগ হন। কারণ, বসা ইমামের পেছনে বিনা কারণে বসে নামায পড়ার নিয়মটি রহিত হয়ে গেছে।' [দেখুন, সহীহ মুসলিম শরীফ, খ.১] এই বাবটি নিশ্চয়ই আলবানির চোখে পড়েছে। কারণ তিনি তো হাদিসের পণ্ডিত!

বাস্তবে যে হাদিসটি দ্বারা উপরোক্ত আমলটি রহিত হয়েছে তা হলো এই দীর্ঘ হাদিস:

এটার রাবী হলেন হযরত উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবা রাহিমাহুল্লাহ, তিনি হযরত আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেন:

مُرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَجَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفْسِهِ خِفَّةً فَقَامَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَرِجْلَاهُ يَخُطَّانِ فِي الْأَرْضِ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمَّا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ حِسَّهُ ذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَتَأَخَّرُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قَائِمًا وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَاعِدًا يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مُقْتَدُونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

-"[হাদিসের গুরুত্বপূর্ণ অংশ] আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহু মানুষকে নামাযে ইমামতি করছিলেন। যখন তিনি দেখলেন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনলেন তখন তিনি ইমামের স্থান থেকে সরে যেতে লাগলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সরে যেতে তাকে নিষেধ করলেন। তিনি তাঁর আরো দু'জন সাহাবীকে বললেন, আবু বকরের কাছে আমাকে বসিয়ে দিতে সাহায্য করো। তাঁরা তাঁকে আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নিকটে বসালেন। আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহু তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে দাঁড়িয়ে নামায পড়লেন এবং সকল মুক্তাদীও নামায পড়লেন দাঁড়িয়ে। তাঁরা সবাই ছিলেন আবু বকরের পেছনে। একমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম [ইমাম হিসাবে] বসে বসে নামায পড়লেন।" [বুখারী, মুসলিম]

উক্ত হদীসটি সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন: "ইমামকে অনুসরণ করার জন্য নিযুক্ত করা হয়। রোগাক্রান্ত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে বসে মানুষকে নামাযের ইমামতি করেছেন, আর মানুষ দাঁড়িয়ে তাঁর ইত্তিবা করেছেন।" [দেখুন বুখারী শরীফ]

ইমাম বুখারী ইমাম হুমাইদী রাহিমাহুল্লাহর উদ্ধৃতি তুলে ধরেছেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ, 'বসে নামায পড়ো যদি তিনি [ইমাম] বসে নামায পড়েন', প্রাথমিক যুগে যখন তিনি অসুস্থ ছিলেন তখন বলেছিলেন। কিন্তু তিনি পরবর্তী সময়ে একই নির্দেশ দেন নি। আমাদেরকে তাঁর সর্বশেষ আমল অনুসরণ করতে হবে।" [২১১]

সুতরাং আমরা সুস্পষ্ট দলিলাদি দ্বারা প্রমাণ করলাম, আলবানি ও তার অনুসারীদের সিদ্ধান্ত মূলত ভ্রান্ত। এই আমলটি রহিত হয়ে গেছে।

---

[২১১] দেখুন বুখারী শরীফ, খ.১, পৃ. ৩৭৩।

৪. সিজদায় যাওয়ার সুন্নাত তরীকা সম্পর্কে তাদের মতামতের খণ্ডন: আলবানি শক্তভাবে মতামত পেশ করেছেন যে, ***সিজদায় যাওয়ার সুন্নাত তরীকা হলো প্রথমে হাত মাটিতে রাখা, এরপর হাঁটুদ্বয়। তিনি বলেন: "তিনি (নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাত মাটিকে রাখতেন, হাঁটু রাখার পূর্বে।" এরপর ফুটনোটে উল্লেখ করেন: "ইবনে খুজাইমাহ (১/৭৬/১), দারাকুতনী এবং হাকীম এটা সহীহ হিসাবে ঘোষণা দিয়েছেন। জাহাবীও তাঁদের সাথে একমত। যেসব আক্বীদা এর সাথে সাংঘর্ষিক তা সবই দুর্বল। এটা মালিক কর্তৃক সত্যায়িত হয়েছে। অনুরূপ ইবনে জাওযী তাঁর 'তাহক্বীক' গ্রন্থে [১০৮/২] আহমদ থেকে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া মাওয়াজী সহীহ ইসনাদে ইমাম আওজায়ীর মাসাঈল [১/১৪৭/১] থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন এই বলে: "আমি মানুষকে পেলাম যারা নামাজে সিজদায় যাওয়ার সময় হাঁটুর পূর্বে মাটিতে হাত রাখলেন।" একই পৃষ্ঠায় আলবানি সাহেব আরো বলেন, "তিনি অনুরূপ আমল করতে উপদেশ দিয়েছেন এই বলে: "যখন কেউ সাজদায় যাবে, তখন উটের মতো তাকে বাঁকা হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তাকে প্রথমে হাত মাটিতে রেখে তারপর হাঁটু রাখা উচিৎ। [আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণিত আবু দাউদের হাদিস, ১/৮৩৯, পৃ. ২১৫ দ্র. ইংরেজী সংস্করণ]।"*** - এখানেই আলবানি সাহেবের উদ্ধৃতির শেষ।

লক্ষ্য করুন, আলবানি সাহেব নিশ্চিতভাবে ঘোষাণা দিয়েছেন, 'যেসব হাদিসে হাঁটু আগে মাটিতে রাখার কথা বলা আছে ওগুলো সবই দুর্বল!'। এটা অবশ্য তার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 'স্তরবিন্যাস' অনুযায়ী সত্য হতে পারে। এ ক্ষেত্রেও তার মতের বিপরীত কোন হাদিসের বর্ণনা দিতেও তিনি নারাজ! তিনি এটাও বলতে অপারগ যে, উক্ত হাদিস ছাড়াও আরো অনেক হাদিস আছে যার দ্বারা প্রমাণিত হয়, হাঁটু আগে রাখা ও হাত পরে। এছাড়া মুজতাহিদ ইমামদের ইজতিহাদী সিদ্ধান্তও তিনি এড়িয়ে গেছেন। এটাই তার চিরাচরিত অভ্যেস! তাঁর চেয়ে হাজার গুণ প্রজ্ঞাশীল জ্ঞানবান ফকীহদের মতামতের প্রতি একটুও ভ্রূক্ষেপ তিনি করেন না।

ইমামে আজম ও ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা এ ক্ষেত্রে একমত যে, সিজদায় যাওয়ার সুন্নাত তরীকা হলো প্রথমে হাঁটু (যা স্বাভাবিক) ও পরে হাত মাটিতে রাখা। আর উভয় ইমাম কুরআন-হাদিস, সাহাবায়ে

কিরাম ও তাবিঈদের আমলের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। আমরা বলতে বাধ্য 'আলবানি যা জানেন না, তাঁরা তা জানতেন, আলবানি যা দেখেন নি তাঁরা তা দেখেছেন'। সুতরাং আলবানির সিদ্ধান্ত সঠিক হবে, না মুজতাহিদ ইমামদেরটা হবে? পাঠকরা একটু বিবেচনা করুন। তবে হ্যাঁ, তিনি যদি বলতেন আমি এই আমলটি (আগে হাত ও পরে হাঁটু মাটিতে রাখা) এজন্য মানি, যেহেতু দু'জন মুজতাহিদ ইমাম এই মতামত দিয়েছেন। তাহলে আমাদের কোন কথাই থাকতো না। তিনি বলছেন, যেসব হাদিসে এর বিপরীত কথা বর্ণিত আছে তা সবই দুর্বল! তিনি নিজেকে মুজতাহিদ হিসাবে জাহির করতে যেয়ে এরূপ বলে থাকবেন। অন্যথায় এরূপ বলার আর কোন কারণ থাকতে পারে না।

এবার আসল কথায় আসি। বাস্তবে এ সম্পর্কে ফিকহুস সুন্নাহর লেখক সাঈদ সাবিক বলেছেন: "অধিকাংশ উলামা হাঁটু আগে ও পরে হাত মাটিতে রাখার উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ইবনে মুনদির বলেছেন হযরত উমর বিন খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু, হযরত ইমাম নাখয়ী, মুসলিম ইবনে ইয়াসার, সুফিয়ান সওরী, আহমদ ইবনে হাম্বল (তাঁর দ্বারা বর্ণিত দু'টি মতের একটি), ইসহাক ইবনে রাওয়াহীসহ অনেক মহাত্মন (ইনবে মুনদিরসহ) রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমের আমল ছিলো, সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে হাঁটু ও পরে হাত মুসাল্লায় রাখা। আবু তায়িব বলেন, অধিকাংশ মুফতি এটাই বলেছেন। ইবনে কাইউম জাওযী বলেন: "যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়তেন তিনি প্রথমে হাঁটু ও পরে হাত মাটিতে রাখতেন। তারপর তাঁর মাথা ও নাক রাখতেন। এটাই সঠিক, যা শুরাইক আসিম ইবনে কালিব থেকে তাঁর পিতার সূত্রে হযরত ওয়াইল বিন হাজর রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন: তিনি বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সিজদার সময় দেখেছি। তিনি প্রথমে হাঁটু মাটিতে রাখলেন হাত রাখার পূর্বে। ওঠার সময় তিনি হাত উঠাতেন হাঁটু ওঠানোর পূর্বে। অন্যরকম করতে আমি কখনো তাঁকে দেখি নি।"[২১২]

[২১২] দেখুন আবু দাউদ, ১. ৮৩৭-৮৩৮, পৃ. ২১৫।

চার মাজহাবের আলো

এটুকু উদ্ধৃত করার পর সাঈদ সাবিক এ ব্যাপারে ইমাম মালিক, হযরত আওজায়ী এবং আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমের মতামতও তুলে ধরেন।

হযরত ওয়াইল ইবনে হাজর ও হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহুম বর্ণিত হাদিসখানা মিশকাতুল মাসাবিতেও আছে। এখানে বলা হয়েছে: "আবু সুলাইমান খাত্তাবী রাহিমাহুল্লাহ [মৃ. ৩৮৮ হি.] বলেন, ওয়াইল ইবনে হাজর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর বর্ণনা তাঁর (হযরত আবু হুরাইরার) বর্ণনা থেকে অধিক সহীহ। এটাও বলা আছে যে, [হাত আগে ও হাঁটু পরে] এই আমলটি রহিত হয়েছে [যা আবু হুরাইরাহ'র বর্ণনায় আছে]।"

উক্ত বর্ণনাসমূহ ছাড়াও 'আওনাল মা'বূদ' গ্রন্থের প্রণেতা হযরত শামসুল হক আজিমাবাদী তাঁর আবু দাউদ শরীফের শরায়, প্রথমে হাত আগে ও পরে হাঁটু এর পক্ষে কয়েকজন উলামার মন্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন, "কিন্তু হযরত খাত্তাবী এই মতামত দিয়েছেন যে, হযরত ওয়াইল ইবনে হাজর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর বর্ণনা অধিক গ্রহণযোগ্য কারণ এটা আরো কয়েকটি সহীহ রিওয়ায়েত দ্বারা সমর্থিত [এগুলোর উদ্ধৃতি আলবানি দেন নি]। ইবনে খুজাইমাহ রাহিমাহুল্লাহ (যিনি ছিলেন শাফিঈ মুহাদ্দিস) মতামত পেশ করেছেন, আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাদিসটি আসলে মনসূখ [রহিত] হয়ে গেছে। এছাড়া তিনি হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণিত একটি হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন: "আমরা প্রথমে হাঁটুর পূর্বে আমাদের হাত মাটিতে রাখতাম, কিন্তু পরে আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয় হাঁটু আগে ও পরে হাত রাখতে!" হযরত ওয়াইল ইবনে হাজর রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদিসটি ইমাম তিরমিযীও তাঁর সুনানে বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি [তিরমিযী রাহ.] বলেছেন, হাদিসটি হাসান গরীব। হযরত আজিমাবাদী আরো বলেন, "ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফিঈ এবং ইমাম আহমদ (তাঁর দ্বিতীয় মতামত অনুযায়ী) রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম এটাই সিদ্ধান্ত নেন যে, সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে হাঁটু মুসাল্লায় লাগবে এরপর হাত। আর এটাই সর্বাধিক সুবিধাজনকও মনে হয়।"[২১৩]

[২১৩] হযরত শামসুল হক আজিমাবাদী, শরহে সুনানে আবু দাউদ।

সুতরাং এ ব্যাপারে মতানৈক্যের কোন কারণ নেই। নামাযে সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে হাঁটু ও পরে হাত মুসাল্লায় রাখাই সুন্নাত বলে অধিকাংশ ফকীহ উলামায়ে কিরাম মত প্রকাশ করছেন। আমরা যারা হানাফী তারা এভাবেই সিজদায় যাই। আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক অবগত।

৫. নামাযে সঠিকভাবে দাঁড়ানোর ব্যাপারে সালাফিদের আমলের খণ্ডন: বিংশ শতকে এসে 'তথাকথিত সালাফি' নামধারীরা রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের নামে আরো একটি অদ্ভুত 'বিদআত' আবিষ্কার করেছেন। তাদের এসব বিদআত খাইরুল কুরুনের অসংখ্য উলামায়ে কিরাম ও মহাত্মনের আমলের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বলে বার বার প্রমাণিত হওয়ার পরও তারা এগুলো পরিহার করছেন না। আধুনিকবাদী কিছু 'ইমামদের' অন্ধ অনুসরণ করে অসংখ্য মানুষ পথভ্রষ্ট হচ্ছে এসব বিদআত পালনে অনড় থেকে। তারা হাদিস শাস্ত্রকে নিজেদের ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝা ও সে মুতাবিক আমল করার ক্ষেত্রে খুব আগ্রহশীল। অথচ এভাবে অনুসরণ শুধু মারাত্মক হতে পারে তা নয়, বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অসন্তুষ্টির কারণ হবে।

বিখ্যাত আইম্মায়ে মুজতাহিদীন ও তাঁদের প্রসিদ্ধ শাগরিদরা কুরআন-হাদিস গবেষণা, সাহাবায়ে কিরামের আমল, তাবিঈদের আমল ইত্যাদি ব্যাপারে আল্লাহর অনুগ্রহ হেতু উচ্চ পর্যায়ের পারদর্শী ও অভিজ্ঞ ছিলেন। সুতরাং তাঁরা যেভাবে, যে উসূল অনুসরণ করে দ্বীনের আইন-কানুন, আমল-ইবাদাতের পদ্ধতি ভবিষ্যতে আগত সকল মুসলিম প্রজন্মের জন্য রেখে গিয়েছিলেন, তার থেকে উত্তম কোন পদ্ধতি যা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের সন্তুষ্টির অনুকূলে হবে এ যুগে তো নয়ই, কোন যুগেও কেউ খুঁজে পান নি। পাওয়ার কথাও নয়।

এটা সাধারণ জ্ঞান বহির্ভুত কথা যে, রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছের মানুষ, তাঁর যুগ ও পরবর্তী নিকটস্থ যুগের মানুষ দ্বীনকে কম বুঝেছেন অথচ এ যুগের মানুষ বেশী বুঝে ফেলেছেন! সালাফিরা আমাদেরকে এ কথাটাই বলছেন। অবশ্য তারা কুরআন-হাদিস দ্বারাও তাদের এসব আক্বীদা-মতবাদ প্রমাণ করার চেষ্টা করে থাকেন। মনে হয় যেনো, সেই

উত্তম তিন যুগে তাদের উদ্ধৃত কুরআনের আয়াতসমূহ ও হাদিসগুলো ছিলো না! সে যুগের ফকীহ মহাত্মনরা এগুলো দেখেন নি! তারা যদি একটু ভাবেন যে, সাহাবায়ে কিরামের ছাত্র ও ছাত্রদের ছাত্র এবং রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক ঘোষিত 'খাইরুল কুরুনের' অন্তর্গত মহাত্মন আইম্মায়ে মুজতাহিদীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম কখনো এমন কোন আমল সমর্থন করতে পারেন না, যা রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সুন্নাতের পরিপন্থী হতে পারে। এই অতি সহজে অনুধাবনযোগ্য যুক্তিটিও কি তাদের মাথায় ঢুকে না? তাদের কি হলো? এটাও তারা ভাবেন না, যে কোন আমলের ক্ষেত্রে সমগ্র উম্মাহ্‌র মধ্যে প্রাথমিক যুগ থেকে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হলে তা কখনো বাতিল হতে পারে না। তারা কি এসব সাধারণ মানবিক যুক্তি নিয়েও চিন্তা করেন না? কেন? একমাত্র আল্লাহ মা'লুম।

যাক, এ প্রসঙ্গে আমরা নামাযে অদ্ভুত ও দেখতে অনেকটা আদবহীন তাদের দাঁড়ানো পদ্ধতি নিয়ে কিছু আলোচনা করার প্রয়াস পাচ্ছি। সকলে জানেন, তারা নামাযে 'ছড়িয়ে' [ছরাইয়া] দাঁড়ান। এই আমলটির প্রতি তারা অনড়। তাদের এ আমল খণ্ডনের পূর্বে দেখা যাক তারা কেন এই আমলটি 'আবিষ্কার' করলেন।

প্রথমে আরো জেনে নিন [নামাযে আপনার পাশে কোন সালাফি কখনো না দাঁড়িয়ে থাকলে] তারা কিভাবে এ আমলটি করে থাকেন। পাশের নন-সালাফি মুসল্লির পায়ের কণিষ্ঠ আঙ্গুল নিজের কণিষ্ঠ আঙ্গুলের সাথে 'লাগানোর জন্য' তারা নিজেদের সাধারণ দাঁড়ানোর স্বাভাবিকতাকে পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে বসেন। ছড়াতে ছড়াতে বিরাট জায়গা দখল করে নেয়। শুধু জামাআতের সময় নয়, একা একা নামাজ আদায়কালেও তারা ছড়িয়ে দাঁড়ানোর আমল করে থাকেন। এই বিদআতটির পক্ষে তাদের নিকট বাস্তবে কোন শরঈ দলিল নেই। একটি মাত্র হাদিস আছে যাতে বলা হয়েছে, পায়ে পায়ে লাগিয়ে লাইনে দাঁড়াতে। তা-ও রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়ালাল্লামের আমলের সঙ্গে এটি সম্পৃক্ত নয়। বাস্তবে এই হাদিসটি তারা সম্পূর্ণরূপে ভুল বুঝেছেন। আর বুঝবেনই তো, তাদের ইমাম আলবানি, বিন বাজ ও উসাইমিনগণ তো এ যুগের 'খালাফী'। তারা কিভাবে মহাত্মন আইম্মামে মুজতাহিদীন থেকেও বেশী বুঝতে পারবেন? আরো একটি ব্যাপার

হলো, একগুঁয়েমি ও নিজেদের ইমামদের সম্মান রক্ষার্থে এই আমল বাতিল হওয়ার সকল দলিল প্রমাণ তারা ইচ্ছে করেই উপেক্ষা করে থাকেন। সালফে সালিহীনের 'অনুসারী' বলে দাবীদার এই ফিরকাটি যে, আসলে সত্যিকার সাফলে সালিহীনের আমলের তোয়াক্কাই করেন না- ছড়িয়ে দাঁড়ানোর আমল দ্বারা তারা এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছেন।

উল্লেখিত হাদিসখানার প্রতি যদি আমরা একটু সূক্ষ্মভাবে দৃষ্টিপাত করি তাহলে পাঠকবর্গ সহজেই অনুধাবন করবেন, সালাফিরা আসলে সালফে-সালিহীনের অসুসারী নন, বরং তারা অনুসরণ করছেন তাদের 'নফসে আম্মারার'। উম্মাহ্র মধ্যে মতানৈক্য, অনৈক্য ও বিরাট ক্ষতিসাধনের লক্ষ্যে এর মধ্যে শয়তান নামক মরদূদেরও কারসাজি বিদ্যমান। যে মুহূর্তে আসহাবে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুমের আমল, অনুসরণ ও নির্দেশের উপর ভিত্তিশীল মহাত্মন আইম্মায়ে মুজতাহিদীন কর্তৃক সিদ্ধান্তকৃত আমলকে মানুষ প্রত্যাখ্যান করে, সেই মুহূর্ত থেকে সে শয়তানের চরম ভ্রান্তির পথে অগ্রসর হয়। আল্লাহর দরবারে আমরা আশ্রয়প্রার্থী।

নামাযে দাঁড়ানোর তাদের পদ্ধতি চারটি মাজহাবের আমলের পরিপন্থী। এরূপ দাঁড়াতে কেউ সমর্থন করেন নি। কোন মাজহাবেই বলা হয় নি, নামাযে ক্বিয়ামের সময় পাদ্বয় অতিরিক্ত ছড়িয়ে মুসল্লিদের একে অন্যের পায়ের কনিষ্ঠ আঙ্গুল লাগিয়ে রাখতে হবে। তাদের এই আমলটি সত্যিই অপর মুসল্লিদের জন্য সময় সময় যথেষ্ট অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়ায়। ঠিক যেভাবে জলসার সময় বার বার ডান হাতের নির্দেশ আঙ্গুল খাড়া করে ঘুরানো ও নাড়ানো দ্বারা পাশের মুসল্লিদের খুজুখুশুতে বিঘ্ন ঘটে। এই আমলটিও আমরা শিঘ্রই খণ্ডন করবো ইনশাআল্লাহ। ইদানিং তারা মহিলাদেরকেও পা ছড়িয়ে নামাযে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিচ্ছেন! কী অদ্ভুত, দায়িত্বহীন নির্দেশ! তাঁদের আরেক নতুন বিদআত 'মহিলা ও পুরুষের নামাযে কোন পার্থক্য নেই!' -তা পাকাপুক্ত করতে যেয়ে তারা 'মহিলাদের জন্য খারাপ লাগে' এরূপ ক্বিয়াম করতে নির্দেশ দিচ্ছেন। মহিলা-পুরুষের নামাযে পার্থক্য নেই- আমরা তাদের এই সিদ্ধান্তেরও খণ্ডন করবো ইনশাআল্লাহ।

প্রথমে আমরা নামাযে ক্বিয়ামের বর্ণনা সম্বলিত কয়েকটি হাদিস তুলে ধরছি।

হাদিস - ১:

يَذْكُرُ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ وَلِينُوا بِأَيْدِى إِخْوَانِكُمْ لَمْ يَقُلْ عِيسَى بِأَيْدِى إِخْوَانِكُمْ وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ

-হযরত উমর বিন খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "সফ সোজা করো, কাঁধে কাঁধ মিলাও, ফাঁক বন্ধ করো এবং তোমাদের ভাইদের হাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত হও। শয়তানের জন্য কোন ফাঁক রেখো না। যে কেউ সফে সংযুক্ত হয়, আল্লাহ তাকে সংযুক্ত করবেন। আর যে সফ কেটে ফেলে আল্লাহ তাকে কাটবেন।" [বুখারী, আবু দাউদ]

হাদিস - ২:

الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّلُ الصَّفَّ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَى نَاحِيَةٍ يَمْسَحُ صُدُورَنَا وَمَنَاكِبَنَا وَيَقُولُ لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الْأُوَلِ

-হযরত বারা' বিন আজিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফের এ প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করতেন। আমাদের কাঁধ ও বুক ছুঁয়ে বলতেন, "লাইনে বেশকম করবে না। কারণ এরূপ করলে তোমাদের হৃদয় বেশকম হবে (অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হবে)"। তিনি আরো বলতেন, "অবশ্যই, আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর ফিরিশতাগণ প্রথম সফের প্রতি সালাম [রহমত] প্রেরণ করেন।" [আবু দাউদ]

হাদিস - ৩.

أَنَس بْنُ مَالِكٍ قَالَ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِى

-হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, যখন নামাযের ইক্বামত হতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিকে ফিরে তাকাতেন ও বলতেন: "তোমাদের লাইনগুলো সোজা করো এবং একে অন্যের অতি কাছে দাঁড়াও, কারণ আমি তোমাদেরকে পেছন থেকেও দেখি।" অপর বর্ণনায় হযরত আনাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, "আমাদের সকলেই একে অন্যের নিকটস্থ ব্যক্তির কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে দাঁড়াতাম।" [বুখারী]

হাদিস - ৪.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ

-হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাস বলেছেন, "তোমাদের লাইনগুলো সোজা করো এবং একে অন্যের কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াও। আমি তাঁর নামে শপথ করছি যার হাতে আমার জীবন, অবশ্যই শয়তান সফের মাঝখাকে ঢুকতে আমি দেখতে পাচ্ছি একটি বকরির বেশে।" [আবু দাউদ]

হাদিস - ৫.

عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْجُدَلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثَلَاثًا وَاللهِ لَتُقِيمُنَّ

صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ قَالَ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَلْزَقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَةِ صَاحِبِهِ وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ

-আবুল ক্বাসিম জুদালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "আমি নু'মান বিন বাশীর রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের [মুসল্লিদের] দিকে ফিরে তাকালেন এবং বললেন, "শপথ আল্লাহর! অবশ্যই তোমাদেরকে সফ সোজা করতে হবে। অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের হৃদয়ের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করবেন।" এরপর আমি দেখলাম একজন তাঁর পাশের জনের কাঁধে কাঁধ, হাঁটুতে হাঁটু এবং পায়ের গোড়ালিতে গোড়ালি মিলিয়ে দাঁড়িয়েছেন।" [বুখারী ও আবু দাউদ]

হাদিস - ৬.

عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّى صُفُوفَنَا فَخَرَجَ يَوْمًا فَرَأَى رَجُلًا خَارِجًا صَدْرُهُ عَنْ الْقَوْمِ فَقَالَ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ

-হযরত নু'মান বিন বাশীর রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের লাইনগুলো সঠিক করতেন। একদিন তিনি [বাড়ি থেকে] বের হয়ে আসলেন। দেখলেন এক ব্যক্তি লাইনে দাঁড়ানো অবস্থায় কিছুটা আগে থাকায় তার বুক বেরিয়ে পড়েছে। তিনি বললেন, "তোমাদের লাইন সোজা করো। অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের মুখের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করে দেবেন [অর্থাৎ তোমাদের কথার মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হবে]।" [তিরমিযী]

হাদিস - ৭:

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَلَّ وَعَزَّ قُلْنَا وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْمُقَدَّمَةَ وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ

-হযরত জাবির বিন সামুরা রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তোমরা কেনো লাইনে দাঁড়াও জানো? ফিরিশতারা তাঁদের প্রভুর সামনেও দাঁড়ান। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ফিরিশতারা কিভাবে প্রভুর সামনে দাঁড়ান? তিনি জবাব দিলেন, তাঁরা প্রথম লাইন পূর্ণ করেন এবং লাইনে একে অন্যের কাছে থাকেন।" [আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ]

হাদীস - ৮:

أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ قَلَّمَا يَدَعُ ذَٰلِكَ إِذَا خَطَبَ إِذَا قَامَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاسْتَمِعُوا وَأَنْصِتُوا فَإِنَّ لِلْمُنْصِتِ الَّذِي لَا يَسْمَعُ مِنَ الْحَظِّ مِثْلَ مَا لِلْمُنْصِتِ السَّامِعِ فَإِذَا قَامَتِ الصَّلَاةُ فَاعْدِلُوا الصُّفُوفَ وَحَاذُوا بِالْمَنَاكِبِ فَإِنَّ اعْتِدَالَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ ثُمَّ لَا يُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَهُ رِجَالٌ قَدْ وَكَّلَهُمْ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ فَيُخْبِرُونَهُ أَنْ قَدِ اسْتَوَتْ فَيُكَبِّرُ

-হযরত উসমান ইবনে আফ্‌ফান রাদ্বিআল্লাহু আনহু খুতবা প্রদানকালে সর্বদাই বলতেন, "ইমাম যখন জুমু'আর দিন খুতবার জন্য দাঁড়াবেন, খুব খিয়াল করে শুনবে। কারণ, যে কেউ শুনতে পারে না কিন্তু খিয়াল করে ও যে কেউ শুনতে পারে এবং খিয়াল করে তাদের উভয়ের অংশ সমান। আর যখন নামাযের ইক্বামত বলা হয়, তখন তোমাদের সফগুলো সোজা করবে এবং একে অন্যের কাঁধ মিলাবে। এর কারণ হলো, সফ সোজা করা নামায পরিপূর্ণ হওয়ার একটি অংশ।" এরপর তিনি তাক্ববির দিতেন যতক্ষণ না সফ সোজা হয়েছে কি না দেখার জন্য নিযুক্ত ব্যক্তি তাঁকে বলেন, সফ সোজা হয়েছে। এরপর তিনি তাকবীর দিয়ে শুরু করতেন। [মুয়াত্তা ইমাম মালিক]

নামাযে সফ সোজা করার ব্যাপারে প্রায় সবগুলো হাদিসের উদ্ধৃতি উপরে তুলে ধরেছি। এসব হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 'কাঁধে কাঁধ মিলানো' নামকরণে একটি পরিচ্ছেদ [বাব] সংযুক্ত করেছেন। তিনি এতে বলেন, "জমহুর ব্যক্তি যা বলেছেন তাহলো এই: 'অবশ্যই (সংযুক্তি ও লাইন ঠিক করা) এর অর্থ হলো পূর্ণাঙ্গভাবে একে

অন্যের নিকটস্থ হওয়া এবং সোজা হয়ে দাঁড়ানো। এর অর্থ নয় যে, সত্যিকার অর্থে একে অন্যকে একেবারে জড়িয়ে ফেলা (বা ছোঁয়া)।'" হাফিজ বলেন: "এর অর্থ হলো লাইন সোজা করা ও মাঝখানে ফাঁক না রাখার ব্যাপারটির উপর গুরুত্ব প্রদান।" বদরুদ্দীন আ'ইনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। এ থেকে এটাই প্রতিষ্ঠিত হলো, সফ সোজা করা ও ফাঁক না রাখার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। হযরত কুসতুলানী ও অন্যান্য বুজুর্গ একই কথা বলেছেন।"[২১৪]

ফায়জুল বারীতে বর্ণিত আছে, "শরহুল বিকায়ায় উল্লেখিত আছে: 'মুসল্লিদেরকে [তাদের পা থেকে পা] চার আঙ্গুল পরিমাণ দূরে রেখে দাঁড়ানো উচিৎ। এই একই মতামত দিয়েছেন ঈমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। অপর মতামত হলো এই দূরত্ব হবে এক হাত [প্রায় ১০ সেন্টিমিটার]।' লেখক বলেন: 'জামাআত ও ইনফিরাদী নামাযে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে সালফে-সালিহীনের মতামতের মধ্যে আমি কোনো পার্থক্য পাই নি। উভয় পায়ের দূরত্বে কোন প্রার্থক্য নেই। একাকী নামায আদায় করার সময় যেটুকু দূরত্বে পাযুগল থাকবে জামাআতের সময়ও তা-ই থাকবে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে পা অতিরিক্ত ছড়িয়ে রাখার কোন নিয়ম নেই।"

উক্ত বর্ণনাগুলোর সারসংক্ষেপ হলো: আমরা সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈগণের মধ্য থেকে জামাআত ও একাকী নামায আদায়ের সময় দাঁড়ানোর মধ্যে কোন পার্থক্য আছে বলে বর্ণনা পাই না। এ থেকে এটাই প্রমাণিত হলো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ: 'কাঁধে কাঁধ মিলাও' এর অর্থ হলো, জামাআতে দাঁড়ালে লাইন সোজা করা ও মাঝখানে ফাঁক না রাখা।

সহীহ বুখারীর শরাহ লামিউদ দুরারীতে এই কথাগুলো লিপিবদ্ধ আছে: "ফুকাহায়ে কিরাম মন্তব্য করেছেন, মুসল্লিদের জন্য সর্বাপেক্ষা উত্তম কাজ হলো নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় উভয় পা চার আঙ্গুল পরিমাণ দূরত্বে রাখা। তারা এটাও বলেন নি, পাদ্বয় রুকু কিংবা সিজদার সময় একত্রিত করতে হবে। বদরুদ্দীন আইনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 'বিকাইয়া'-তে বলেছেন: 'পাদ্বয়ের

---

[২১৪] বুখারী শরীফের শরাহ, 'লামিউদ দুরারী'।

মধ্যে চার আঙ্গুল পরিমাণ দূরত্ব হওয়া উত্তম। কারণ, অবশ্যই এটা খুশুর নিকটবর্তী।'"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা তাঁর পাযুগল (নামাযে দাঁড়ানোবস্থায়) অতিরিক্ত ছড়াতেন না। অন্যের পায়ের সাথে পা লাগাতেনও না। কিন্তু উভয় পা না বেশী কাছে [মিলিয়ে] হতো না বেশী দূরে।

রাদ্দুল মুহতারে আছে: "পায়ের 'গোঁড়ালি থেকে পায়ের গোঁড়ালি' কথাটির অর্থ হলো জামাআতে প্রত্যেকে একে অন্যের পাশে [সোজা লাইনে] দাঁড়াতে হবে। একই কথা 'ফাতওয়ায়ে সমরকন্দে' বলা হয়েছে।"[২১৫]

সুতরাং, উপরে উদ্ধৃত হাদিস শরীফসমূহ ও খাইরুল কুরুনের মহাত্মন মুহাদ্দিসীনে কিরামের উক্তি-মতামত থেকে স্পষ্ট হলো, একটি মাত্র হাদিসে যেখানে পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দাঁড়ানোর কথা বলা হয়েছে, তার অর্থ হলো পাগুলো একই লাইনে সোজা হবে। আক্ষরিক অর্থে এক পা আরেকটির সাথে লাগিয়ে দেওয়া উদ্দেশ্য নয়! আর ছড়িয়ে দাঁড়ানোর কথা তো হাদিসে বলাই হয় নি। সকল হাদিসের উপর আমল করার সঠিক পদ্ধতি হলো, সকল মুসল্লির পায়ের গোঁড়ালি মিলিয়ে একই লাইনে সোজা হয়ে দাঁড়ানো এবং মাঝখানে কোন ফাঁক না রাখা। এভাবে আমল করলে আদায় হবে সফ সোজা করার ওয়াজিবটিও।

এ যুগের তথাকথিত 'সালাফিরা' সত্যিকার সালফে-সালিহীনের মতামত ও আমলের অনুসরণ মোটেই করছেন না। তারা 'পায়ের সাথে পা মিলিয়ে' কথাটির আক্ষরিক আমল করতে যেয়ে ছড়িয়ে দাঁড়ান। অন্যান্য হাদিসে যে বলা আছে, 'কাঁধে কাঁধ মিলাও', 'গলায় গলা মিলাও', 'হাঁটু হাঁটুতে মিলাও' এবং 'পায়ের গিটে পায়ের গিট মিলাও' কথাগুলোর উপর আমল করছেন না। কারণ পা অতিরিক্ত ছড়ালে এই আমলগুলো করা সম্ভব নয়। এছাড়া এ আমলগুলো আক্ষরিক অর্থে পালন করাও অসম্ভব। চিন্তা করুন, হাঁটুতে হাঁটু লাগানো, গলায় গলা লাগানো কিংবা গিট গিটে লাগানো কি আদৌ সম্ভব? এসব আমল আঞ্জাম দিতে গেলে নামাযই হবে না। মানুষের দাঁড়ানোর

[২১৫] ইলাউস সুনান।

স্বাভাবিকতা একেবারে বিঘ্নিত হবে। সুতরাং হাদিসগুলো আক্ষরিক অর্থে পালন নয়- বরং এর ভাবার্থ বুঝে পালন করতে হবে।

বাস্তবে পায়ের ফাঁক যদি ৪ আঙ্গুল পরিমাণ হয় কিংবা এক হাত পর্যন্তও হয় তাহলে অপর সকল হাদিসের নির্দেশের উপর আমল করা সম্ভব হবে। পায়ের মধ্যে নিজের উভয় কাঁধ থেকেও বেশী দূরত্ব থাকলে পাশের মুসল্লির কাঁধে কাঁধ মিলানো কখনো সম্ভব হবে না। মোট কথা প্রতিটি হাদিস দ্বারা এটাই বুঝানো উদ্দেশ্য, জামাআতে সফ সোজা করতে হবে এবং মাঝখানে ফাঁক থাকলে চলবে না। এটুকু বুঝতে পেরেছিলেন আইম্মায়ে মুজতাহিদীনসহ সালফে-সালিহীনের সকলে। কিন্তু এ যুগের 'নিজে নিজে মুজতাহিদ' সালাফি ভাইয়েরা কেনো যে বুঝতে পারেন না বা বুঝতে চান না, তা আমাদের বোধগম্য নয়। এরপরও মুসলমান ভাই হিসাবে তাদের বোধোদয় হবে এবং এই উদ্ভট, অস্বাভাবিক আমলটি তারা পরিত্যাগ করে উম্মাহ্‌র মধ্যে স্বস্তি ফিরিয়ে আনবেন- আমরা এ কামনা করি আল্লাহর পবিত্র দরবারে।

সবশেষে আমরা নামাযে দাঁড়ানোর সঠিক পদ্ধতি চার মাজহাবের সিদ্ধান্ত মুতাবিক বর্ণনা করছি। এর দ্বারা পাঠকদের যিনি যে মাজহাবের অনুসারী সে মুতাবিক আমল করতে পারবেন। আর যারা গায়র মুকাল্লিদ তারাও হয়তো মাজহাবের গুরুত্ব অনুধাবন করে তাক্বলিদের পথে ফিরে আসবেন। কারণ প্রতিটি মাজহাবের সকল শরঈ সিদ্ধান্ত যুক্তিভিত্তিক নয়- বরং সহীহ বর্ণনাভিত্তিক। এসব বর্ণনার সঙ্গে জড়িত সাহাবায়ে কিরাম ও তাঁদের শাগরিদ তাবিঈগণ। এ কথাটি মনে রেখে আমরা সিদ্ধান্তগুলো একে একে তুলে ধরবো।

হনাফী সিদ্ধান্ত: নামাযে ক্বিয়াম অবস্থায় (একাকী কিংবা জামাআতে) উভয় পায়ের মধ্যে ৪ আঙ্গুল পরিমাণ দূরত্ব থাকবে। এর চেয়ে একটু বেশী হলেও সমস্যা নেই। তবে এক হাত থেকে বেশী হবে না। পায়ের গোঁড়ালি ও অঙ্গুলিগুলো সোজা কিবলামুখী থাকবে। গোঁড়ালিদ্বয়ের দূরত্ব ও বৃদ্ধাগুলিদ্বয়ের দূরত্ব সমান থাকবে।

শাফিঈ সিদ্ধান্ত: নামাযে ক্বিয়াম অবস্থায় উভয় পায়ের দূরত্ব হবে এক হাত পরিমাণ। এর বেশী নয়। পায়ের পাতা সম্পূর্ণরূপে কিবলামুখী থাকবে।

মালিকী সিদ্ধান্ত: তাদের সিদ্ধান্ত ঠিক হানাফীদের অনুরূপ।

হাম্বলী সিদ্ধান্ত: তাদেরও সিদ্ধান্ত ঠিক হানাফীদের মতো।

৬. তাশাহহুদের সময় শাহাদাত আঙ্গুল খাড়া করে নড়ানো ও ঘুরানো সম্পর্কিত তাদের আমলের খণ্ডন:

প্রথমে আমরা চার মাজহাবের আলোকে নামাযে তাশাহহুদ পাঠের সময় শাহাদাত আঙ্গুল সোজা ও খাড়া করার এবং নামানোর সুন্নাত আমলটি সম্পর্কে বিভিন্ন হাদিসসহ প্রমাণাদি তুলে ধরবো।

হাদিস - ১:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ فَدَعَا بِهَا وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى بَاسِطَهَا عَلَيْهَا

-"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, যখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশাহহুদের জন্য বসতেন, তিনি তাঁর বাম হাত বাম হাঁটুতে ও ডান হাত ডান হাঁটুতে রাখতেন। এরপর তিনি [ডান হাত] বৃত্তের মতো করে 'লা-ইলাহা' বলার সময় শাহাদাত আঙ্গুল খাড়া করতেন।" [সহীহ মুসলিম]

হাদিস -২:

عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ إِذَا دَعَا وَلَا يُحَرِّكُهَا

-"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ির রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম [তাশাহহুদের সময়] তাঁর আঙ্গুল মুবারক নড়াচড়া করতেন না।" [সুনানে নাসাঈ]

উক্ত হাদিসদ্বয় ও পরবর্তীতে উদ্ধৃত আরো এক দু'টো হাদিস থেকে এটা স্পষ্ট যে, তাশাহহুদের সময় শাহাদাত আঙ্গুল সোজা করে খাড়া রেখে শাহাদাতের সাক্ষ্য প্রদান একটি সুন্নাত আমল। তবে ঠিক কোন্ পদ্ধতিতে এই আমলটি করতে হবে? কোন্‌টি সঠিক?

শাইখুল হাদিস হযরত জাকারিয়া কান্ধলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এ সম্পর্কে চার মাজহাবের সিদ্ধান্তের উপর ধারণা দিয়েছেন। ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সিদ্ধান্ত হলো, আঙ্গুল নড়াচড়া করা যাবে না। অপরদিকে মালিকী মাজহাবের অধিকাংশের মতামত হলো আঙ্গুল নড়াচড়া করা যাবে। কিন্তু মালিকী মাজহাবের দু'জন ইমাম ইবনে কাসিম ও ইবনুল আরাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা এটি সমর্থন করেন নি।[২১৬]

ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [তিনিও শাফিঈ মাজহাবের ইমাম ছিলেন] বলেন, নামাযে তাশাহহুদের সময় আঙ্গুল নড়াচড়া করা মাকরুহ।[২১৭]

ইবনে কুদামা রাহিমাহুল্লাহও মতামত দিয়েছেন যে, তাশাহহুদের সময় আঙ্গুল তুলে নড়াচড়া করা বৈধ নয়।[২১৮]

সুতরাং ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফিঈ এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমের মাজহাবে এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, এই সুন্নাত পালনের সময় আঙ্গুল নড়াচড়া, ঘুরানো, এক পাশ থেকে অপর পাশে বার বার নেওয়া ইত্যাদি বৈধ নয়। এই সিদ্ধান্তের পেছনে নাসাঈ শরীফে বর্ণিত আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ির রাদ্বিআল্লাহু আনহুর উপরোদ্ধৃত হাদিসখানা অগ্রাধিকার লাভ করেছে।

সুতরাং আমরা প্রমাণ করলাম চার মাজহাবের মধ্যে তিনটিরই সিদ্ধান্ত হলো আঙ্গুল নড়াচড়া করা যাবে না। আর মালিকী মাজহাবেরও একাংশের মত এটাই। তাহলে তারা কেনো এই ঘুরানো ও নড়াচড়ার আমলের প্রতি এতো

---

[২১৬] আওয়াযুল মাসালিক, খ. ২, পৃ. ১১৭।
[২১৭] আল-মাজমু, খ.৩, পৃ. ৪৫৪।
[২১৮] মুগনি, খ.২, পৃ. ৯৯।

অটল ও কট্টর? এবার এই প্রশ্নের উপর আলোচনা করবো হাদিসের আলোকে। আমরা প্রমাণ করবো, তাদের এই কট্টরতা মূলত ভিত্তিহীন।

আলবানি 'সিফাতু সালাতিন নাবী' নামক একখানা গ্রন্থ রচনা করেছেন আরবীতে। তিনি এতে দাবী করেন: "***এছাড়া, যে হাদিসে তিনি [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আঙ্গুল নড়াচড়া করেন নি বলা হয়েছে, সেটার ইসনাদ সহীহ নয়, যা আমি 'জঈফ আবি দাউদ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছি (১৭৫)***।"[২১৯]

উক্ত হাদিসখানা আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে। হাদিসটি নাসাঈ শরীফের উপরে উদ্ধৃত হাদিসের অনুরূপ। হাদিসটি এই: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ إِذَا دَعَا وَلَا يُحَرِّكُهَا

-"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ির রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাশাহহুদ পাঠের শেষে) আঙ্গুল খাড়া করতেন কিন্তু তা নড়াচড়া করতেন না।"[২২০]

কিন্তু হাদিসখানা জঈফ হিসাবে আলবানি তার 'জঈফ আহাদিস আবু দাউদ' গ্রন্থে আছে বললেও তা খুঁজে পাওয়া যায় নি! সুতরাং অলবানী এ ব্যাপারে ভুল করে ফেলেছেন। শুধু তাই নয়, উক্ত হাদিসখানা ইমাম মুসলিমও তাঁর মুসলিম শরীফে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন:

كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى

-"[রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাশাহহুদের সময় বসতেন, তিনি তাঁর ডান হাত ডান উরুতে রাখতেন। তিনি শাহাদাত আঙ্গুল সোজা করতেন এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি মাঝের আঙ্গুলের সাথে মিলিয়ে (মুষ্টিবদ্ধ

[২১৯] সিফাতু সালাতিন নাবী, পৃ. ৬৬ [ইংরেজী অনুবাদ]।
[২২০] আবু দাউদ, ১/৯৮৪, পৃ. ২৫২।

অবস্থায়) রাখতেন। তিনি বাম হাত বাম উরুর উপর (স্বাভাবিকভাবে) রাখতেন।"[২২১]

উক্ত সহীহ মুসলিমের হাদিস দ্বারাও মাজহাবের সিদ্ধান্তকৃত আমল সঠিক বলে প্রমাণিত হলো। আর এই একই রাবীর হাদিস আবু দাউদে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত হয়েছে। যদি তিনি ভুলেও তার জঈফ আবু দাউদে এটি সম্পৃক্ত না করে থাকেন এবং বিশ্বাস রাখের এটি জঈফ তাহলে তো, মুসলিম শরীফের হাদিসখানাও [তার হাদিসের স্তরবিন্যাস অনুযায়ী] জঈফ বলে সাব্যস্ত হবে!

সুতরাং আলবানি গং ও তাদের অন্ধ অনুসারী 'সালাফিদের' এই আমলটি সম্পূর্ণ সঠিক নয়। এই আমল দ্বারা নামাযের খুজুখুশু বিঘ্নিত হয়। সোজা করে সাক্ষ্য প্রদানের অর্থ সহজে অনুমেয়, কিন্তু নড়াচড়া করার মানে কি আমরা জানি না। যতো শীঘ্র তারা এই আমলটি পরিহার করবেন ততোই সকলের জন্য মঙ্গলজনক হবে। যে হাদিসের ভিত্তিতে তারা এই আমলের উপর অনড় তাহলো এই:

وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ قَالَ قُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّي فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَوَصَفَ قَالَ ثُمَّ قَعَدَ وَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ قَبَضَ اثْنَتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً ثُمَّ رَفَعَ أُصْبُعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا مُخْتَصَرٌ

-"হযরত ওয়াইল ইবনে হাজর রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আমি দেখতে চাইলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে নামায পড়েন। এরপর তিনি তাঁর নামায সম্পর্কে বললেন: তিনি বসলেন এবং তাঁর বাম পা মাটিতে রেখে তাঁর বাম হাত বাম উরু ও হাঁটুর উপর রাখলেন। তিনি তাঁর ডান কনুই ডান উরুতে রেখে ডান হাত মুষ্টিবদ্ধ করে দু'টি আঙ্গুল (বৃদ্ধাঙ্গুলি ও মাঝের আঙ্গুল) দ্বারা বৃত্ত তৈরী করলেন। এরপর তিনি শাহাদাত আঙ্গুল তুলে সোজা করলেন ও আমি দেখলাম তিনি তা নড়াচড়া করে দু'আ করছেন।" [সুনানে নাসাঈ]

[২২১] সহীহ মুসলিম এবং আবু দাউদ।

উক্ত হাদিসে অতিরিক্ত শব্দ 'ইউহার্‌রিকুহা' [يُحَرِّكُهَا] [নড়াচড়া করেছেন] 'শা-দ্ব' [বিশ্বাসযোগ্য রাবী দ্বারা বর্ণিত কিন্তু আরো বেশী বিশ্বাসযোগ্য রাবীর বর্ণনাবিরোধী] বলে সাব্যস্ত করেছেন অধিকাংশ ফকীহ মুহাদ্দিসীনে কিরাম। একামত্র রাবী জাইদা ইবনে কুদামাহ রাহিমাহুল্লাহ 'ইউহাররিকুহা' শব্দ প্রয়োগ করেছেন তাঁর বর্ণনায়। সুতরাং বুঝাই যাচ্ছে, হাদিসখানা মুহাদ্দিসীনে কিরামের নিকট তেমন গ্রহণযোগ্য হয় নি যেরূপ অন্যান্য 'ইউহাররিকুহা' শব্দ প্রয়োগ ছাড়া সহীহ হাদিসগুলো গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। আর এ কারণেই তিনটি মাজহাবের সিদ্ধান্ত নড়াচড়ার পক্ষে যায় নি।

আমরা নিম্নে হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণিত এই হাদিসটি কিভাবে সুনানে ইবনে মাজায় উল্লেখিত হয়েছে তা সম্পূর্ণটাই তুলে ধরছি।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَدْ حَلَّقَ الإِبْهَامَ وَالْوُسْطَى وَرَفَعَ الَّتِي تَلِيهِمَا يَدْعُو بِهَا فِي التَّشَهُّدِ .

-"আলী ইবনে মুহাম্মাদ থেকে বর্ণিত, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে ইদ্রিস থেকে, তিনি আসিম ইবনে কুলাইব থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, আমি দেখেছি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলি ও মধ্যমা আঙ্গুল মিলিয়ে বৃত্তের মতো বানিয়েছেন। এর পাশের আঙ্গুল (শাহাদাত আঙ্গুল) সোজা করে তাশাহহুদের সময় দু'আ (يَدْعُو) করছেন।"[২২২]

এই হাদিসটি 'সহীহ' বলে সাব্যস্ত হয়েছে।

তারা যে এই আমলটির ক্ষেত্রে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তার আরো প্রমাণ বিদ্যমান। সহীহ মুসলিম শরীফে এ ব্যাপারে আরো একাধিক হাদিস আছে। নীচে দু'টি হাদিস তুলে ধরছি।

[২২২] সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিসটি ইমাম নববী তাঁর রিয়াদুস সালিহীন কিতাবেও উদ্ধৃত করেছেন।

মুসলিম শরীফের প্রথম হাদিস:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ فَدَعَا بِهَا وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى بَاسِطَهَا عَلَيْهَا

-হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাশাহহুদের সময় বসতেন, তিনি তাঁর বাম হাত বাম হাঁটুতে ও ডান হাত ডান হাঁটুতে রাখতেন। তিনি ডান হাতের [শাহাদাত] আঙ্গুল যেটি বৃদ্ধাঙ্গুলির পরে, খাড়া করে সোজা করতেন। এভাবে দু'আ করতেন। তিনি বাম হাত বাম হাঁটুতে খুলে ছড়িয়ে রাখতেন।" [মুসলিম শরীফ]

একই হাদিসের অপর একটি বর্ণনায় আছে:

عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى بَيْنَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ

-ইবনে জুবায়ির রাদ্বিআল্লাহু আনহু তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, "যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের সময় বসতেন, তিনি তাঁর বাম পা উরু ও পায়ের নলির মধ্যে রাখতেন। তাঁর ডান পা ছড়িয়ে বাম হাত বাম হাঁটুর উপর রাখতেন এবং ডান হাত ডান উরুর উপর রেখে আঙ্গুল সোজা করে খাড়া রাখতেন।" [সহীহ মুসলিম]

মুসলিম শরীফের দ্বিতীয় হাদিস:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ أَنَّهُ قَالَ رَآنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصَى فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَانِي فَقَالَ اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فَقُلْتُ وَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ قَالَ

كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى

-হযরত আলী ইবনে আবদুর রহমান মু'ওয়ায়ী রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা আমাকে দেখলেন নামাযের সময় পাথর দিয়ে খেলা করতে। নামায শেষে তিনি আমাকে খেলা করতে নিষেধ করলেন এবং বললেন: "আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা করতেন তাই করো।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি করতেন? তিনি জবাব দিলেন, "তিনি নামাযে তাশাহহুদের সময় বসতেন। তাঁর ডান হাতের তালু ডান হাঁটুতে এবং [মুষ্টিবদ্ধ করে] সকল আঙ্গুল বন্ধ করে দিতেন। এরপর বৃদ্ধাঙ্গুলির পাশের আঙ্গুল [শাহাতাদ আঙ্গুল] সোজা করে রাখতেন।" [সহীহ মুসলিম]

উপরোক্ত হাদিসদ্বয়ের আলোকে হানাফী, শাফিঈ ও হাম্বলী মাহজাবের সিদ্ধান্ত মুতাবিক এই আমলটি ঠিক বর্ণিত পদ্ধতিতে করাই সহীহ শুদ্ধ সুন্নাহ হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। আর মালিকী মাজহাবেরও এক বিরাট দল অনুরূপ আমল করে থাকেন। আল্লাহ ভালো জানেন।

৭. সিজদা থেকে দাঁড়ানোর সময় কিছুক্ষণ বসা (জলসাতুল ইস্তিরাহা) সম্পর্কিত তাদের আমলের খণ্ডন:

এই আমলটির উপর ফুকাহায়ে কিরামের সিদ্ধান্ত হলো এটি ওয়াজিব কিংবা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা নয়। এ ব্যাপারে সকলেই একমত। কিন্তু এটি 'মুস্তাহাব' হিসাবে সাব্যস্ত করা যায় কি না, তা-তে কিছুটা মতানৈক্য আছে।

ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিসহ একদল ফকীহ মুস্তাহাব হিসাবে এটি গ্রহণ করেছেন। তাঁরা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহিমাহুল্লাহর মুসনাদে আহমদ ও ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির 'আল-আদ্বহান'-এ বর্ণিত একটি হাদিসের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। হাদিসটি এই:

أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيُّ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا

হযরত মালিক ইবনে হুয়াইরিছ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিতর নামাযে [প্রথম রাকাআতের উভয় সিজদা শেষে) সরাসরি না দাঁড়িয়ে ক্ষণকালের জন্য বসতে দেখেছি।"

উক্ত হাদিসখানা অধিকাংশ ফকীহ ইমাম ও মুহাদ্দিসীনে কিরাম আমল হিসাবে গ্রহণ করেন নি। এই মতের পক্ষে আছেন হযরত ইমামে আজম আবু হানিফা, ইমাম মালিক ও ইমাম হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম। তাঁদের যুক্তি হলো, উক্ত [বুখারী ও মুসনাদে আহমদে বর্ণিত] দু'টি বর্ণনা ছাড়াও আরো অনেক হাদিস আছে যেগুলোতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লামের নামাযের পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে কিন্তু 'জলসাতুল ইস্তিরাহার' কথা উল্লেখ হয় নি। হয়তো বা এই হাদিসদ্বয়ে ক্ষণকাল বসার বর্ণনাটি হযরতের শেষ জীবনের শারীরিক দুর্বলতার সময়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তখন তাঁর শারীরিক ওজনও কিছুটা বেড়ে গিয়েছিল।

তৃতীয় একদল ফুহাকার মতামত হলো, তিনি হয়তো ওজর হেতু মাঝে মধ্যে এভাবে ক্ষণকাল বসে থাকবেন। আর আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন।

তবে আমরা এবার সোজা দাঁড়িয়ে যাওয়ার প্রমাণ হিসাবে কয়েকটি হাদিস ও বর্ণনা তুলে ধরছি। এসব বর্ণনার কারণেই তিনজন মুজতাহিদে মতলক ইমাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম এ আমলটি মুস্তাহাব পর্যন্ত সাব্যস্ত করেন নি। অবশ্য শরয়ী ওজর হেতু তা পালন গ্রহণযোগ্য।

বর্ণনা - ১: হযরত ইবনে সাহল রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীর বলে সরাসরি সিজদায় যেতেন। এরপর তিনি উভয় সিজদা শেষে তাকবীর বলে সরাসরি দাঁড়াতেন।"[২২৩]

---

[২২৩] আবু দাউদ, হীদস নং ৯৬৬।

বর্ণনা - ২: ইমাম বাইহাকী রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেছেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের আমল ছিলো দ্বিতীয় সিজদা শেষে না বসে সরাসরি দাঁড়ানো। [সুনানে বাইহাকী]

বর্ণনা - ৩: নাসবুর রাইয়ায় বর্ণিত আছে: হযরত উমর, হযরত আলী, আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর এবং আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুম নামাযে প্রথম (বা চার রাকাআত নামাযে প্রথম ও তৃতীয় রাকাআতের) দ্বিতীয় সিজদা শেষে সোজা দাঁড়াতেন। তাঁরা জলসাতুল ইস্তিরাহা করেন নি।[২২৪]

বর্ণনা - ৪. আল্লামা তুর্কমানী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর 'জাওহারুন নাক্বী' কিতাবে অনেক সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুমের আমলের উদ্ধৃতিসহ বর্ণনা করেছেন: "এটা তাঁদের সকলের আমল ছিলো যে, প্রথম ও তৃতীয় রাকাআতের সিজদাদ্বয় শেষে সোজা দাঁড়াতেন। তাঁরা ক্ষণকালের জন্যও বসতেন না।"[২২৫]

৮. মহিলা ও পুরুষদের নামাযে পার্থক্য নেই, তাদের এই ফাতওয়ার খণ্ডন:

আধুনিক যুগে নাসিরুদ্দীন আলবানি ও জাকির নায়েক গং সালাফি-গায়র মুকাল্লিদরা এক আশ্চর্য ফাতওয়া দিয়ে বসেছেন। তারা বলছেন, মহিলা ও পুরুষের নামাযে মোটেই কোন পার্থক্য নেই। অথচ দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত কেউ এরূপ ফাতওয়া দেন নি! তাদের এই মারাত্মক ভ্রান্তি হেতু দুনিয়াব্যাপী অনেক মহিলারা পুরুষের মতো নামায আদায় শুরু করে দিয়েছেন! এই ভ্রান্তির অবসান একান্ত জরুরী।

তারা যে হাদিসটির উপর ভিত্তি করে এই 'নারীবাদী' ফাতওয়া জারী করেছেন তাহলো এই: "নামায পড়ো যেভাবে তোমরা আমাকে নামায পড়তে দেখো।" [বুখারী]

[২২৪] আল্লামা জাইলা'ই রাহিমাহুল্লাহ প্রণীত, নাসবুর রাইয়া, খ.১, পৃ. ২৮৯।
[২২৫] জাওয়াহারুন নাক্বী, খ.১, পৃ. ১২৫।

আসলে এটি সবার জন্য প্রযোজ্য হলেও বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে মহিলাদের নামাযে কিছুটা পার্থক্য স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করে গেছেন। এর মূল কারণ হলো, মহিলাদেরকে পর্দা করা ফরজ। নামাযের বিভিন্ন অবস্থায় তাদের পর্দা, দেহের আকর্ষণীয় অঙ্গসমূহের গোপনীয়তা ও শালীনতাবোধ রক্ষার্থে এসব আমলের অনুসরণ করতে হয়। আমরা প্রথমে এ ব্যাপারে বেশ কয়েকটি সহীহ হাদিস তুলে ধরবো। এরপর মহিলা ও পুরুষের নামাযের মধ্যে যেসব মৌলিক পার্থক্য আছে তার একটি তালিকা লিপিবদ্ধ করবো সকলের সুবিধার জন্য।

হাদিস -১: মহিলাদেরকে পুরুষদের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া যাবে না: হযরত বাকরাগ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "ওসব লোক কখনো সফল হবে না যারা পুরুষের উপর মহিলাদের অগ্রাধিকার দেয়।"[২২৬]

হাদিস - ২. মহিলাদেরকে নামাযে ইমামতি করার অনুমতি নেই: হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "জেনে রাখো, মহিলারা নামাযে পুরুষের ইমামতি করতে পারবে না।"[২২৭]

হাদিস - ৩. পুরুষরা নামাযে লুকমা দিতে যেয়ে সজোরে সুবহানাল্লাহ [বা আল্লাহু আকবার] বলবেন কিন্তু মহিলারা হাততালি দিবেন: হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "পুরুষের জন্য তাসবীহ ও মহিলাদের জন্য হাততালি।"[২২৮]

হাদিস - ৪. পুরুষের জন্য জুমু'আ ফরয কিন্তু মহিলাদের জন্য নয়: হযরত তারিক বিন শিহাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "জুমু'আ জামাআতে আদায় করা

[২২৬] সহীহ বুখারী, খ.২, পৃ. ১০৫২; কাদীমি।
[২২৭] বাইহাকী, আল-কুবরা, খ,৩. পৃ. ৯০; ইদারাতুত তালিফাত আশরাফিয়া।
[২২৮] সহীহ বুখারী, খ.১. পৃ. ১৬০; আল-মিজান।

মুসলমানদের জন্য একটি ফরয আমল, চারজন ছাড়া: ক্রীতদাস, মহিলা, নাবালিগ ছেলে ও যে রোগাক্রান্ত।"[২২৯]

হাদিস - ৫. মহিলাদের নামাযের প্রতিদান বেশী যদি তারা গোপনে নিজেদের গৃহের কোনো কোণে নামায আদায় করেন: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "কোন মহিলার নামায তার 'মাক্বদায়' [থাকার অভ্যন্তরাংশে] তার হুজরা [থাকার কক্ষ] থেকে উত্তম; এবং তার নামাজ তার হুজরায় আদায় করা তার বাড়িতে আদায় করা থেকে উত্তম।"[২৩০]

হাদিস - ৬. মহিলাদের যে নামায আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয়: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় সেই মহিলার নামায যা তিনি তার গৃহের সর্বাপেক্ষা অন্ধকার স্থানে আদায় করেন।"[২৩১]

হাদিস - ৭. নামাযে মহিলা ও পুরুষের আবরুর মধ্যে বড় পার্থক্য বিদ্যমান: মহিলাদের মুখমণ্ডল, হাত ও পায়ের পাতা ছাড়া চুলসহ সমগ্র দেহ ঢেকে রাখতে হবে। অপরদিকে পুরুষের জন্য এতোটা প্রয়োজন নেই। হযরত আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "আল্লাহ কোনো মহিলার নামায গ্রহণ করেন না হিজাব ছাড়া।"[২৩২]

হাদিস - ৮. মহিলাদের আযান দেওয়া নিষিদ্ধ: হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "মহিলাদের কর্তৃক আযান কিংবা ইক্বামত দেওয়া বৈধ নয়।"[২৩৩]

[২২৯] মুসতাদরাকে হাকিম, হাকিম কর্তৃক সহীহ হিসাবে ঘোষিত এবং আমাম জাহাবী কর্তৃক স্বীকৃত; ইলমিয়া।
[২৩০] সহীহ ইবনে খুজাইমাহ, খ.৩, পৃ. ৯৫; আল-মাকতাবাল ইসলামী।
[২৩১] মাযমাল জাওয়ায়িদ, হাফিজ হাইসামী এই হাদীসের সকল রাবী নির্ভরযোগ্য বলেছেন; মাকতাবুল কুদসী।
[২৩২] মুসতাদরাকে হাকিম, মুসলিম শরীফের ওজনে তিনি এটা সহীহ হিসাবে ঘোষণা দিয়েছেন। ইমাম জাহাবী এতে সম্মতি জানিয়েছেন। খ.১, পৃ. ৩৮০; ইলমিয়া।
[২৩৩] বাইহাকী, আল-কুবরা; ইদারাতুত তালিফাত আশরাফিয়া।

হাদিস - ৯. নামাযে মহিলাদেরকে কান পর্যন্ত [তাকবীরে উলার সময়] হাত উত্তোলন বৈধ নয়: হযরত আবদু রাব্বিহী রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, "আমি দেখেছি হযরত উম্মে দারদা নামায আদায়কালে তাকবীরে উলার সময় তাঁর হাত শুধুমাত্র কাঁধ বরাবর উঠিয়েছেন।"[২৩৪]

হাদিস - ১০. মহিলারা তাকবীরের সময় কতটুকু হাত তুলবেন: হযরত ওয়াইল ইবনে হাজর রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "হে ওয়াইল বিন হাজর! তুমি যখন নামায পড়বে, তোমার হাত [তাকবীবের সময়] নিজের কান বরাবর তুলবে; এবং মহিলারা হাত তাদের স্তন বরাবর উত্তোলন করবে।"[২৩৫]

হাদিস - ১১. মহিলারা পুরুষের সাথে একই সফে দাঁড়াতে পারবেন না: মহিলাদেরকে আলাদা সফে সকল পুরুষের পেছনে দাঁড়াতে হবে। হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আমি ও একজন ইয়াতিম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে নামায আদায় করেছি। আমার আম্মা উম্মে সুলাইমও নামাযে শরীক ছিলেন [আমাদের পাশে না দাঁড়িয়ে] তিনি পেছনে দাঁড়ালেন।"[২৩৬]

হাদিস - ১২. মহিলা ও পুরুষের সিজদার মধ্যে পার্থক্য আছে: হযরত ইয়াজিদ ইবনে আবি হাবীব রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা দু'জন নামাযরত মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন: "তোমরা যখন সিজদা দেবে তখন নিজের দেহকে মাটির সাথে মিলিয়ে রাখবে। অবশ্যই, মহিলারা এক্ষেত্রে পুরুষের মতো নয়।"[২৩৭]

হাদিস - ১৩. মহিলাদের জলসা (বসা) পুরুষের মতো নয়: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যখন কোন মহিলা নামাযে জলসা অবস্থায়

[২৩৪] বুখারী (বাব: রাফউল ইয়াদাইন); দার ইবনে হাজম।
[২৩৫] মাযমা' জওয়ায়িদ, খ.৯, পৃ. ৩৭৪; মাকতাবাল কুদসী।
[২৩৬] বুখারী, খ.১, পৃ, ২৩৬; দারুল ফিকর।
[২৩৭] মারাসিলে আবু দাউদ, পৃ. ১১৮; মুয়াস্‌সাসা রিসালাহ। হাদীসের রাবীগণ গ্রহণযোগ্য, ইলাউস সুনান, খ,৩, পৃ. ২৬; ইদারাল কুরআন।

বসবে, তার উচিৎ এক পায়ের উরু অপর পায়ের উরুর উপর রাখা; এবং যখন সে সিজদা দেবে তখন তার উচিৎ নিজের দেহ ও পেটকে উরুর সাথে মিলিয়ে রাখা যাতেকরে তা যেটুকু সম্ভব ঢাকা থাকে। কারণ অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তার দিকে তাকিয়ে বলেন: "হে আমার ফিরিশতারা! তোমরা সাক্ষী থাকো, আমি অবশ্যই তাকে [নামাযরত মহিলাকে] মাফ করে দিলাম।"[২৩৮] এই হাদিসখানা গ্রহণযোগ্য এ কারণে যে, এটা আরো অনেক হাদিস দ্বারা সমর্থিত।[২৩৯]

উপরে বার্ণিত সহীহ হাদিসসমূহ ছাড়াও সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈদের উক্তি ও আমল দ্বারাও মহিলাদের নামায পুরুষের তুলনায় ভিন্ন হিসাবে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। আমরা নীচে কয়েকটি সহীহ-শুদ্ধ বর্ণনা তুলে ধরছি।

১. হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন: "যখন কোন মহিলা সিজদায় যাবেন, তার উচিৎ হবে 'ইহতিফাজ' এর আমল করা এবং নিজের উরু একত্রে এঁটেসেঁটে রাখা।"[২৪০] হাদিসে 'ইহতিফাজ' শব্দের অর্থ হলো, মহিলাকে এঁটেসেঁটে এক দিকে কিছুটা কাত হয়ে নিজেদের নিতম্বের উপর ভর করে ও সম্পূর্ণরূপে সংকোচ অবস্থায় থাকা।

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমাকে প্রশ্ন করা হলো, মহিলাদের নামায কিরূপ? তিনি জবাব দিলেন, "তাকে অবশ্যই এঁটেসেঁটে থাকতে হবে ও 'ইহতিফাজ' করতে হবে।"[২৪১] 'ইতহিফাজ' শব্দের অর্থ আমরা ইতোমধ্যে তুলে ধরেছি।

৩. খালিদ বিন লাজলাজ রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন: "মহিলারা নামাযে বসার সময় 'তারাব্বু' করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তারা অবশ্য পুরুষের মতো নিজেদের নিতম্বের উপর বসবেন না।"[২৪২] 'তারাব্বু' শব্দের অর্থ পা আড়াআড়ি করে বসা।

[২৩৮] বাইহাকী, খ.২, পৃ. ২২৩; ইদারা আত-তালীফাত।
[২৩৯] ইলাউস সুনান, খ.৩, পৃ. ৩৩; ইদারাল কুরআন।
[২৪০] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ, খ.২, পৃ. ৫০৪; আল-মজলিসুল ইল্‌ম।
[২৪১] ঐ, খ.২, পৃ. ৫০৫; আল-মজলিসুল ইল্‌ম।
[২৪২] ঐ, খ.২, পৃ. ৫০৬; আল-মজলিসুল ইল্‌ম।

৪. ইমাম নাফি' রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, "হযরত সাফিয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহা 'তারাব্বু' অবস্থায় নামায আদায় করতেন।"[২৪৩] আমরা ইতোমধ্যে 'তারাব্বু' শব্দের অর্থ তুলে ধরেছি।

৫. ইমাম নাফি' রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন: "ইবনে উমরের [গৃহের] মহিলারা নামায অবস্থায় তারাব্বু করতেন।"[২৪৪]

৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমাকে জিজ্ঞেস করা হলো, মহিলারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কিভাবে তাদের নামায আদায় করতেন? তিনি জবাব দিলেন: "প্রাথমিক অবস্থায় তারা তারাব্বু করেছেন। এরপর তাদেরকে 'ইহতিফাজের' নির্দেশ দেওয়া হয়।"[২৪৫] এই হাদিসের ইসনাদ সহীহ।[২৪৬]

লক্ষ্য করুন, আগের ক'টি হাদিসে তারাব্বু (চারজানু হয়ে পা আড়াআড়ি করে বসা) প্রাথমিক যুগে বৈধ ছিলো এবং উক্ত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হলো, পরবর্তীতে 'তারাব্বু' রহিত হয়ে গেছে। এর বদলে 'ইহতিফাজ' আমলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৭. ইমাম বাইহাকী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: "মহিলাদের নামাযে পার্থক্যের সকল হাদিস মূলত সতর (পর্দার) এর উপর ভিত্তিশীল। এর অর্থ হলো মহিলাদেরকে নির্দেশ করা হয়েছে তারা যেনো নিজেদেরকে নামাযে সর্বাধিক বেশী পর্দানশীন অবস্থায় রাখেন।"[২৪৭]

৮. শায়খ আবদুল হাই লৌক্ষনৌবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন: "নামাযে মহিলা ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান।"[২৪৮]

উপরোক্ত বর্ণনাসমূহ ছাড়াও আরো অনেক সহীহ বর্ণনা দ্বার মহিলাদের নামাযে পার্থক্য আছে বলে প্রমাণিত। আমরা উপরে যে ক'টি উদ্ধৃতি দিয়েছি

[২৪৩] ঐ, খ.২, পৃ. ৫০৬; আল-মজলিসুল ইল্‌ম।
[২৪৪] ঐ, খ.২, পৃ. ৫০৭; আল-মজলিসুল ইল্‌ম।
[২৪৫] শরহে মুসনাদে আবি হানিফা, পৃ. ১৯১; ইলমিয়া।
[২৪৬] ইলাউস সুনান, খ.৩, পৃ. ২৭; ইদারাল কুরআন।
[২৪৭] বাইহাকী, সুনানে কুবরা, খ.২, পৃ. ২২২; ইদারাতুত তালিফাত।
[২৪৮] আস্ সিয়ায়াহ, খ.২, পৃ. ২০৫; সুহাইল একাডেমী।

প্রমাণ হিসাবে তা-ই যথেষ্ট বলে মনে করি। এবার আমরা গাইর মুক্বাল্লিদদের দাবী ও তার খণ্ডন করবো ইনশাআল্লাহ।

এই অংশে অধিকাংশ উদ্ধৃতি এসেছে নাসিরুদ্দীন আলবানি প্রণীত 'সিফাতু সালাতিন নাবী' গ্রন্থ থেকে। গ্রন্থটি পৃথিবীব্যপী সমকালীন হক্কানী মুক্বাল্লিদ এবং অনেক গায়র মুক্বাল্লিদ উলামার নিকটও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে নি। এতে অনেক মৌলিক ভুল-ভ্রান্তি ও গোমরাহী বিদ্যমান। অনেকে এর খণ্ডনও করেছেন, যেমন শায়খ হামুদ তুয়াইজিরী রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৯৯২)। এমনকি সালাফিদের অপর আলীম মরহুম শায়খ বিন বায ও শায়খ সালিহ মুনাজ্জিদ অনেক ফাতওয়া জারী করেছেন যা আলবানির কিতাবের সঙ্গে সরাসরি সাংঘর্ষিক। আর এই বিশেষ বিষয়ে তাদের মতামত সকল মুকাল্লিদদের অনুকূলে।

আলাবানী ও তার অনুসারীরা মহিলাদের নামাযে পার্থক্য দেখেন নি এই হাদিসটির কারণে:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "নামায আদায় করো যেভাবে তোমরা আমাকে নামায আদায় করতে দেখো।" [বুখারী]

তারা বলেন, "***এই হাদিসখানা সাধারণভাবে সকল মুসলাম নারী-পুরুষের জন্য প্রযোজ্য***।"

ভালো কথা, কিন্তু উক্ত হাদিসের এরূপ ব্যাখ্যা ইসলামের ইতিহাসের মধ্যে কেউ দেন নি। বুখারীর প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাতা যেমন ইবনে হাজর আসকালানী, আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী, ইবনে বাত্তাল প্রমুখ জগতখ্যাত মুহাদ্দিসীনে কিরাম একথা কখনো বলেন নি যে, উক্ত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় নারী-পুরুষের নামাযে পার্থক্য নেই! ***বাস্তবে এই ব্যাখ্যা ও বিদআত একমাত্র আলবানি দ্বারা আবিষ্কৃত এবং তা সংঘটিত হয়েছে ঈসায়ী বিংশ শতকে***। সুতরাং যুক্তির নিরিখে ভাবলে আমরা আলবানির এই বিদআত প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য। কারণ, তিনি যেভাবে হাদিসখানার ব্যাখ্যা দিয়েছেন ও বুঝেছেন তা ইতোমধ্যে তার থেকে শত শত গুণ প্রজ্ঞাবান হক্কানী

মুহাদ্দিসীনে কিরাম ব্যাখ্যা দেন নি। এর কারণ হলো, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে, মহিলাদের নামাযে মৌলিক কিছু পার্থক্য বিদ্যমান। অনেক ক্ষেত্রে তিনি নিজেই এসব আমলের উপর নির্দেশ প্রধান করেছেন। আলবানি নিজেকে 'বড়' জ্ঞানী প্রমাণ করতে এরূপ বৈপরিত্যের আশ্রয় নিয়েছেন, না হয় তিনি হয়তো উক্ত হাদিসসমূহ সম্পর্কে গাফিল ছিলেন।

আলবানির অনুসারীরা এই 'বিদআতের' সমর্থনে এটাও বলেন: "***মহিলারা পুরষের জময অর্ধেক***।" [আল-হাদিস]

এই হাদিসটি কখনো মহিলাদের নামাযে পার্থক্য নেই কথাটির সত্যায়নে ব্যবহারযোগ্য নয়। অনুরূপ দ্বীনের অন্যান্য ব্যাপারেও মাহিলারা পুরুষের মতো তা কখনো মানা যাবে না। দ্বীনের সকল ক্ষেত্রে মহিলা ও পুরুষের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। আমরা উপরোক্ত হাদিসগুলোই প্রমাণ হিসাবে যথেষ্ট মনে করি। উপরের হাদিস দ্বারা এটাই বুঝানো উদ্দেশ্য যে, মহিলা ও পুরুষরা মূলত মাবনসম্প্রদায় হিসাবে একই সূত্রে গ্রথিত। উভয়ে আল্লাহর সৃষ্ট মানুষ। এর সমর্থনে বলা যায় হযরত হাওয়া আলাইহাস্সালামকে আল্লাহ তা'আলা আদম আলাইহিস্সালাম থেকেই সৃষ্টি করেছিলেন। দৈহিক মৌলিক কিছু পার্থক্য থাকায় একজন পুরুষ ও অপরজন নারী- কিন্তু উভয়েই মানুষ।[২৪৯]

মহিলা ও পুরুষের মধ্যে মৌলিক কিছু মিল বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আমরা এটা মানতে বাধ্য যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক হাদিস শরীফ, সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈ, তাবে তাবিঈ, আইম্মায়ে মুজতাহিদীনসহ যুগ যুগ ধরে মহাত্মন উলামা-মাশাইখের উক্তি, সিদ্ধান্ত ও আমলকে জলাঞ্জলি দিয়ে সনদহীন এ যুগের এক 'নিজে নিজে মুজতাহিদে'র বিদআতী ফাতওয়ার উপর নির্ভর আমরা করতে পারি না। কখনো নয়! মহিলাদেরকেও বুঝতে হবে, আলবানি তার সকল লা-মাজহাবি সিদ্ধান্তসমূহের মতো এক্ষেত্রেও মারাত্মক ভুল করে বসেছেন। তার ফাতওয়া মুতাবিক আমল করলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অসন্তুষ্টির কারণ হবে। সাথে সাথে অসংখ্য উলামা-মাশাইখের প্রতি বে-আদবীর সামিল হবে, নাউযুবিল্লাহ।

[২৪৯] মা'রিফুস্ সুনান, খ.১, পৃ. ৩৭৪; এইচ, এম. সাঈদ।

সালাফিরা এই হাদিসখানা গ্রহণ করেন নি: আবু মুতী’ হাকাম ইবনে আবদুল্লাহ বলখী রাহিমাহুল্লাহ হযরত উমর ইবনে দার রাহিমাহুল্লাহ, তিনি হযরত মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ, তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যখন কোন মহিলা নামাযে বসবে, সে যেন তার এক উরু অপর উরুর সাথে লাগিয়ে বসে এবং যখন সিজদায় যায় সে যেনো তার উরুর সাথে পেট মিলিয়ে নিজেকে সর্বাধিক পর্দানশীন অবস্থায় রাখে। কারণ আল্লাহ তা’আলা তার দিকে তাকিয়ে বলেন: ‘হে আমার ফিরিশতারা! আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি তাকে মাফ করে দিলাম।”[২৫০]

এই হাদিসখানা তাদের মতে জঈফ। কারণ হিসাবে বলা হয়, এটার রাবী আবু মুতী’ বলখী দুর্বল বর্ণনাকারী। কিন্তু ফুকাহা ও মুহাদ্দিসীনে কিরাম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত উসূলে হাদিসের নিয়মানুসারে এই হাদিসের উপর নির্ভর করা যায়। কারণ একই বর্ণনা অরো অনেক হাদিস ও সাহাবায়ে কিরামের সিদ্ধান্ত দ্বারা সমর্থিত। আর সাহাবায়ে কিরাম স্বয়ং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাগরিদ ও ছাত্র ছিলেন। এটা অনেক ‘শাওয়াহীদ’ [উসূলে হাদিসের একটি বিষয়] দ্বারা সমর্থিত।[২৫১]

তৃতীয় আরেকটি হাদিস হযরত ইবনে আবি হাবীব রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, যেখানে তিনি বলেন: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা দু’জন নামাযরত মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, ‘যখন তোমরা সিজদায় যাবে, তখন তোমাদের দেহ মাটির সাঙ্গে জড়িয়ে রাখবে। কারণ মহিলারা (নামাযের) ক্ষেত্রে পুরুষের মতো আমল করবে না।”

উক্ত হাদিসখানা ইমাম আবু দাউদ তাঁর মারাসীলে বর্ণনা করেছেন [পৃ. ১১৮]। এছাড়া ইমাম বাইহাকীও এটি বর্ণনা করেছেন [২/২২৩]। ***আলবানি গং এই হাদিসকে ‘মুরসাল’ বলেছেন যা হলো জঈফ স্তরের অন্তর্ভুক্ত***।

[২৫০] সুনানে বাইহাকী আল-কুবরা, ২/২২২।
[২৫১] ইলাউস সুনান, খ.৩, পৃ. ৩৩; ইদারাল কুরআন।

মহিলাদের নামাযের ব্যাপারটি একটি ফিকহী বিষয়। সুতরাং ফুকাহাদের সিদ্ধান্তের আলোকে এর উপর গবেষণা হতে হবে। তারা ছিলেন হাদিস বুঝার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে অভিজ্ঞ। ইমাম বুখারীর প্রখ্যাত শাগরিদ ও ছাত্র ইমাম তিরমিযী এ কথাটি বলেছিলেন। চার মাজহাবের সকল ফুকাহা ‘মুরসাল’ হাদিসও ক্ষেত্রবিশেষে গ্রহণযোগ্য বলেছেন ও গ্রহণ করেছেন [আসারুল হাদিস শরীফ দ্র.]। সুতরাং, এটা ভুল ভ্রান্তির অন্তর্ভুক্ত যখন ফুকাহায়ে কিরামের সিদ্ধান্ত বিবেচনা না করে সরাসরি উক্তি করা, ‘এটা মুরসাল হাদিস, যা হলো জঈফ হাদিসের অন্তর্ভুক্ত।’ এরূপ বক্তব্য হলো উসূলে হাদিসের উপর স্বল্প জ্ঞানের পরিচায়ক। এ কথা দ্বারা প্রকারান্তরে এটাই বলা হচ্ছে, ‘এই হাদিস গ্রহণযোগ্য নয়’, যা হলো যুগ যুগ ধরে প্রতিষ্ঠিত ফুকাহায়ে কিরামের উসূল ও সিদ্ধান্তের প্রতি বে-আদবীপূর্ণ আচরণ বৈ কিছু নয়।

আমরা মুরসাল হাদিসের ব্যাখ্যায় এ প্রসঙ্গে যাচ্ছি না। তবে এটা বলা যায়, উক্ত হাদিসের সকল রাবী গ্রহণযোগ্য ও এটি প্রত্যাখ্যান করার কোন কারণ নেই।[২৫২]

তারা বলেন, ***ইবনে আবি শাইবাহ রাহিমাহুল্লাহ তাঁর মুসান্নাফে কিছু সালাফদের বর্ণনা তুলে ধরেছেন তাতে বুঝা যায় মহিলাদের নামাযে পুরুষদের তুলনায় পার্থক্য আছে। কিন্তু আমরা মনে করি, একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা যায়। অবশ্য তিনি কিছু বর্ণনা দিয়েছেন যার দ্বারা বুঝা যায় মহিলা ও পুরুষের নামাযে পার্থক্য নেই।***

তাদের এই উক্তিটি সর্বাধিক প্রত্যাখ্যানযোগ্য ও নিন্দনীয়। এরূপ মন্তব্য দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, আসহাবে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুম, তাদের শাগরিদ ও ছাত্র তাবিঈগণ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম ও পরবর্তী সালফে সালিহীন মহাত্মনের আমল, বর্ণনা, উসূল ইত্যাদি মূল্যহীন! অথচ একমাত্র তাঁরাই ছিলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং পরের যুগের সকল মুসলমানদের মধ্যমণি দ্বীনের সংরক্ষক ও প্রচারক। এদেরকে সন্দেহ করলে কুরআন-হাদিসসহ দ্বীনের যাবতীয় বিষয়ের উপর সন্দেহ সৃষ্টি হবে।

[২৫২] যা ইলাউস সুনান গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে, খ.৩, পৃ. ২৬; ইদারাল কুরআন।

সালাফিদের এরূপ বক্তব্য দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় আসহাবে কিরামসহ সালফে সালিহীন মহাত্মন বুজুর্গানে দ্বীনের প্রতি যে ক্ষমার অযোগ্য বে-আবদী প্রদর্শন হয় তা কি তারা একবারও ভাবেন না? এছাড়া এরূপ ভ্রষ্ট, ধৃষ্টতাপূর্ণ বক্তব্য দেওয়ার পরও তারা কিভাবে নিজেদেরকে 'সালাফি' তথা সালফে সালিহীনের অনুসারী বলে দাবী করতে পারেন?

বাস্তবে উক্ত বক্তব্য থেকে তাদের গোমরাহী ও ভ্রান্তির স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে উন্মোচন হয়েছে। এরূপ বক্তব্য অবশ্যই কুরআন-হাদিসের ভাষ্যের পরিপন্থীও বটে। কারণ স্বয়ং রাব্বুল আলামীন তাঁর কালামে পাকে ঘোষণা দিয়েছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

-"হে ঈমানদারগণ আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা 'উলিল আমর' তাদের।" [সূরা নিসা : ৫৯]

উক্ত আয়াতে করীমার ব্যাখ্যায় প্রাথমিক যুগের তাফসীরবিদ যেমন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা ও হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, "'أُولِي الْأَمْرِ' দ্বারা ফুকাহা ও উলামায়ে কিরাম উদ্দেশ্য [তাফসীরে মা'রিফুল কুরআন, মুফতি শফী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]। সুতরাং আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাবিঈন এবং উলামায়ে কিরামের শিক্ষাকে গ্রহণ ও অনুসরণ করতে। আর তাঁদের শিক্ষা সম্পূর্ণটাই কুরআন-হাদিসের শিক্ষার উপর নির্ভর ও ভিত্তিশীল। এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। উক্ত মন্তব্য একমাত্র 'খারিজী' সম্প্রদায় ছাড়া কেউ করে নি। আমরা আল্লাহর দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তাদেরকে শুধু একটি মাত্র কথা বলবো:

'আপনারা যদি সালফে সালিহীনসহ মহাত্মন উলামায়ে কিরামের বক্তব্য ও উক্তিকে অগ্রহণযোগ্য মনে করেন তাহলে কেনো মিস্টার আলবানি, বিন বায, উসাইমিন ও ইবনে তাইমিয়ার উদ্ধৃতি দেন?'

তারা বুখারী শরীফের একটি বর্ণনা তুলে ধরেন: ***'উম্মে দারদা রাহমাতুল্লাহি আলাইহা নামাযে পুরুষের মতো বসতেন।' তিনি ছিলেন একজন ফকীহা মহিলা।***

এরপর তারা বলেন, ***উক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় হযরত হাফিজ ইবনে হাজর আসক্বালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর ফাতহুল বারীতে বলেছেন, আবুল দারদা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দু'জন স্ত্রী ছিলেন। উভয়কে 'উম্মে দারদা' বলে সম্বোধন করা হতো। এদের মধ্যে বয়স্কা মহিলা ছিলেন সাহাবিয়াহ এবং অল্প বয়স্কা জন ছিলেন তাবিয়াহ। বুখারী যার কথা এখানে বর্ণনা করেছেন তিনি ছিলেন শেষোক্ত মহিলা।***

আমরা বলি, উপরোক্ত বর্ণনা প্রমাণ হিসাবে যথেষ্ট নয়। ইতোমধ্যে আমরা উল্লেখ করেছি, সালাফিরা বলেন, ***'একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা গ্রহণযোগ্য- আর কারোর নয়।'*** সুতরাং তাবিয়াহ কোন মহিলার আমল কেনো এখন প্রমাণ হিসাবে মেনে নেওয়া হবে? তবে আমরা এই পয়েন্টের উপর গুরুত্ব দিচ্ছি না। উক্ত হাদিস প্রমাণ হিসাবে অগ্রহণযোগ্য হওয়ার মূল কারণ হলো ইমাম তাহাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক উদ্ধৃত অপর একটি সহীহ বর্ণনা। বর্ণনাটি এই:

হযরত ইব্রাহীম ইবনে আবি আবলাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন: "আমি দেখেছি উম্মে দারদা নামায আদায় করতে। তিনি তারাব্বু অবস্থায় ছিলেন।"[২৫৩]

তারা বলেন, ***ইমাম আবি শাইবাহ কিছু বর্ণনা সালাফদের থেকে উদ্ধৃত করেছেন যা প্রমাণ করে মহিলা ও পুরুষের নামাযে কোন পার্থক্য নেই।***

উক্ত বর্ণনাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। একজন মহান ব্যক্তির উপর এরূপ অভিযোগ আনয়ন ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। তাঁর মুসান্নাফে কখনো একথা বলেন নি। বাস্তবে একজনও সালাফ একথা বলেন নি যে, মহিলাদের নামাযে পাথর্ক্য নেই। এ যুগের তাদের ইমাম আলবানি ছাড়া আর কেউ একথা বলেন নি। আলবানি তার সিফাতু সালাতিন নাবী গ্রন্থে এই ফাতওয়া দিয়েছেন। তিনি

[২৫৩] ইমাম তাহাবী, তুহফা আখইয়ার, খ.২, পৃ. ৩৩৮; দারুল বালানসিয়া।

দাবী করেছেন ইব্রাহীম নাখয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন: “*একজন মহিলা, পুরুষে যা করেন নামাযে তা-ই করবেন।*” তিনি এটাও দাবী করেছেন, *এই বর্ণনাটি সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে*।

কিন্তু বাস্তবে ইব্রাহীম নাখয়ী একথা বলেন নি! তাঁর মাতমতও কোন সময়ই এটা ছিলো না। মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবায় তাঁর থেকে সঠিক কথাগুলো ছিলো এই:

عن إبراهيم قال : تقعد المرأة فى الصلاة كما يقعد الرجل

ইব্রাহীম বলেছেন: “একজন মহিলা পুরুষ যেভাবে বসেন সেভাবে নামাযে বসবেন।” [মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ, ২৮০৪; মজলিসুল ইলমী]

উপসংহারে আমরা একুটু অতিরিক্ত বলতে চাই, মহিলাদের নামাযে পার্থক্য সম্পর্কিত যতো হাদিস এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করেছি প্রমাণ হিসাবে তা-ই যথেষ্ট। এটা ভ্রান্ত মতামত যে, মহিলা ও পুরুষের নামাযে কোন পার্থক্য নেই। যুগ যুগ ধরে এই সত্য সর্বমহলে গ্রহণযোগ্য ও কুরআন-হাদিসের আলোকে, সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈন ও তাঁদের অনুসারী সকল সালফে সালিহীনের বর্ণনা ও সিদ্ধান্ত দ্বারা এটি প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত। মহিলারা যুগ যুগ ধরে এর উপর আমলও করে আসছেন। ভবিষ্যতেও করবেন। আলবানির মতো অপরিপক্ক গবেষকের ঔদ্ধত্যপূর্ণ উক্তি, মন্তব্য ও হাদিসের অপব্যাখ্যার উপর ভিত্তিশীল একটি গোমরাহী ফাতওয়ার দরুন এই আমল পরিহার করা হবে না। অন্তত মুকাল্লিদরা তো নয়ই, অনেক ‘গায়র মুক্কালিদরাও’ এটা মানবেন বলে আমরা মনে করি না।

মহিলাদের নামাযে পার্থক্যের তালিকা

এ প্রসঙ্গের ইতি টানার পূর্বে সবার সুবিধার্থে মহিলাদের নামাযের পার্থক্যগুলোর একটি তালিকা নিম্নে তুলে ধরার প্রয়াস পাচ্ছি।

১. সকল ক্ষেত্রে যেমন: ক্বিয়াম, রুকু, সিজদা, তাশাহহুদ পালনের সময় মহিলাকে সর্বদা খিয়াল রাখতে হবে তাঁর দৈহিক শালীনতা ও পর্দানশীলতা সুরক্ষিত থাকে।

২. নামাযের শুরুতে তাকবীরে তহারীমার সময় তিনি হাতদ্বয় কাঁধ কিংবা স্তনের উপর পর্যন্ত মাত্র ওঠাবেন।

৩. ক্বিয়াম অবস্থায় তিনি তাহরীমা বাঁধবেন উভয় স্তনের উপর। তিনি হাতদ্বয় ছড়িয়ে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখবেন। হাতদ্বয় থাকবে কাপড় বা ওড়নার ভেতরে। উভয় পায়ের পাতা লাগিয়ে কিবলামুখী থাকবেন।

৪. স্তনের উপর তাহরীমা অবস্থায় হাত বাঁধা সকল মাজহাবের মতে সুন্নাত। এই মাসআলার উপর ইজমা হয়েছে।

৫. রুকু অবস্থায় মহিলাকে তাঁর হাতদ্বয় দেহের সাথে জড়িয়ে রাখতে হবে। তিনি শক্তভাবে না ধরে শুধু হাঁটুতে হাত রাখবেন মাত্র। আঙ্গুলগুলো না ছড়িয়ে এঁটে রাখবেন। বাস্তবে নামায অবস্থায় সর্বদাই তিনি তার হাতের আঙ্গুলগুলো এঁটে রাখবেন। তাঁর পাদ্বয় কিছুটা বাঁকা থাকবে।

৬. সিজদার সময় তিনি তার পুরো দেহটি মুসাল্লার সাথে লাগিয়ে উভয় পা বাঁকাবস্থায় ডানদিকে কাত করে রেখে নিতম্বও মাটিতে লাগিয়ে এঁটেসেঁটে রাখবেন। নিতম্ব কিছুতেই মাটি থেকে উঁচু হবে না, যেভাবে পুরুষের হয়ে থাকে। হাতদ্বয়ও মাটিতে লাগিয়ে রাখতে হবে।

৭. তাশাহহুদের সময় পাদ্বয় কাত করে ডানদিকে নিয়ে নিতম্ব মাটিতে লাগিয়ে বসবেন। তার হাতদ্বয়ের আঙ্গুল এঁটে হাঁটুর উপর রাখবেন, ছড়াবেন না।

৮. জামাআতে সকল পুরুষের সফ শেষে মহিলাদেরকে দাঁড়াতে হবে। ইমামের ভুলের জন্য লুকমা হিসাবে ‘সুবহানাল্লাহ’ কিংবা ‘আল্লাহু আকবার’ সজোরে বা নীরবে না বলে আস্তে আস্তে হাততালি দেবেন মাত্র।

৯. মুত্তাকী হিসাবে একজনও পুরুষ থাকলে মহিলার জন্য ইমামতি করা বৈধ নয়।

১০. শুধুমাত্র মহিলাদের জামাআত মাকরুহ [হানাফি মতে]।

১২. মহিলাদের জন্য জুমু'আ নামায ফরয নয়। তবে অংশগ্রহণ করলে গুনাহ হবে না। পর্দার বিঘ্ন ঘটা ও ফিতনার সম্ভাবনা হেতু মহিলাদেরকে মসজিদে যেয়ে জামাআতে শরীক হতে অপছন্দ করেছেন অধিকাংশ ফুকাহায়ে কিরাম। হাদিস শরীফে বলা হয়েছে: 'আল্লাহ তা'আলার নিকট ঐ মহিলার নামায সর্বাধিক প্রিয় যা তিনি তার ব্যক্তিগত কক্ষের সর্বাপেক্ষা অন্ধকার স্থানে আদায় করেন।"[২৫৪]

১৩. কোন ঈদের নামাযই মহিলাদের জন্য ওয়াজিব নয়। তাকবীরে তাশরীকও ওয়াজিব নয়।

১৪. সুবহে সাদিকের ঔজ্জ্বল্যতা স্পষ্ট হলে মহিলার জন্য নামায আদায় করা মুস্তাহাব নয়। নামাযে তিনি সজোরে কিরাআত পাঠ করবেন না।

উপরোক্ত মাসআলাগুলোর সূত্র হলো উদ্ধৃত হাদিসে রাসূল সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এগুলো লিখিত আছে হানাফী ফিকাহ্‌র কিতাব রাদ্দুল মুখতার ও বাহরুর রাইক্বে।

৯. উচ্চস্বরে 'আমীন' বলা প্রসঙ্গ

প্রথমেই আমরা উল্লেখ করছি, সূরা ফাতিহা পাঠের পর 'আমীন' বলা একটি সুন্নাত আ'মল। এ থেকে খুব বেশী নেকী অর্জিত হয়। একটি হাদিসে আছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِذَا قَالَ الإِمَامُ (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ) فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَنُعَيْمٌ الْمُجْمِرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه

[২৫৪] মাযমাল জওয়ায়িদ, খ.৯, পৃ. ৩৭৪; মাকতাবাল কুদসী।

চার মাজহাবের আলো

হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "যখন ইমাম 'গাইরিল মাগদ্বুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্দোয়া-ল্লিন' বলেন, তোমরা 'আমীন' বলো। [কারণ ফিরিশতারাও এসময় আমীন বলেন] যে কেউ ফিরিশাতাদের সঙ্গে আমীন বলবে, তার অতীতের সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।" [বুখারী]

সুতরাং 'আমীন' বলার মধ্যে যে বিরাট ফায়দা আছে এ ক্ষেত্রে কোন দ্বিমত নেই। সকল উলামা এখানে ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন। আমীন 'সজোরে' না 'নীরবে' বলতে হবে এ ব্যাপারে অবশ্যই মতানৈক্য বিদ্যমান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমীন সজোরে ও নীরবে বলেছেন বলে বর্ণনা আছে। কিন্তু তর্কের কারণ এটা নয়। গায়র মুকাল্লিদ সালাফিরাসহ যারা আমীন জোরে বলার পক্ষে, তারা নীরবে বলাকে অবৈধ মনে করেন, সমস্যাটা এখানেই। বাস্তবে তাদের সকল আমলই 'একমাত্র হক' হিসাবে প্রচার করায় আজ মুসলিম উম্মাহয় এক অনাকাঙ্ক্ষিত ও মারাত্মক ফিতনা ছড়িয়ে পড়ছে। চার মাজহাবের সিদ্ধান্তের প্রতি তাদের বৈরিভাব হলো এর মূল কারণ। তারা যদি বলতেন, আমাদের 'আলবানি মাজহাব' আমাদের জন্য সত্য, আপনাদেরও যারতার মাজহাব আপনাদের জন্য সত্য তাহলে এরূপ গ্রন্থ রচনা আদৌ প্রয়োজন পড়তো না। হয়তো বা আলবানির অসংখ্য ভুলের উপর অনেকে অনেক কিছু মন্তব্য এবং খণ্ডন করতেন মাত্র। যা তারা বহুমাত্রায় করেছেনও।

যাক, আমাদের আলোচনার ব্যাপ্তি এটুকু, আমীন সজোরে বলা না নীরবে বলা অধিক গ্রহণযোগ্য। সুন্নাত হওয়ার ক্ষেত্রে কোন্‌টির দিকে ওজন বেশী?

ইনশাআল্লাহ! এই প্রশ্নের জবাব আমরা প্রমাণসহ উপস্থাপন করবো। পাঠকদের নিকট উন্মোচন হবে, মাজহাবী সিদ্ধান্ত কতো সঠিক এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির অনুকূলে।

হানাফী মাজহাবের ফুকাহায়ে কিরামসহ আমীন নীরবে বলার পক্ষের সকলেই এটা মেনে নিয়েছেন যে, সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোরে ও নীরবে আমীন পাঠ করেছেন। কিন্তু কোন্‌টি তিনি বেশী এবং কত দীর্ঘকাল পাঠ করেছেন, সেটাই

ছিলো উক্ত ফুকাহায়ে কিরামের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের মাপকাঠি। এ সম্পর্কিত সহীহ বর্ণনাসমূহ একসঙ্গে গবেষণা করে জানা গেছে, তিনি আসলে সজোরে আমীন স্থায়ীভাবে বলেন নি। এ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, সাহাবায়ে কিরামকে শিক্ষাদান ও গুরুত্ব বুঝানোর মানসে তিনি কিছুদিন মাত্র আমীন জোরে বলেছিলেন। কিন্তু সকল ফুকাহায়ে কিরাম এতে একমত হন নি। তবে পাঠকদেরকে মনে রাখা উচিৎ আমীন বলার মধ্যে বিরাট ফায়দা থাকলেও না বললে [জোরো বা নীরবে] নামাযের কোন ক্ষতি হবে না। আমীন বলা কারো মতেই ফরজ কিংবা ওয়াজিব নয়- বরং এটা সুন্নাত।

এ ব্যাপার কোন্ মাজহাবের সিদ্ধান্ত কি তা এখন আমরা জেনে নিলে ভালো হয়। এরপর প্রমাণাদিসহ আলোচনা হবে।

নামাযে ইমামের কর্তব্য

প্রথমত আইম্মায়ে মুজতাহিদীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম ঐকমত্যে পৌঁছেছেন যে, ইমাম নীরবে কিরাআত পাঠের নামাযসমূহে [অর্থাৎ যুহর ও আসরের নামাযে] নিজে আমীন নীরবে পাঠ করবেন। এখানে কোন দ্বিমত নেই।

যেসব নামাযে [অর্থাৎ ফযর, মাগরিব, ইশা, জুমু'আ ইত্যাদি] ইমামকে সজোরে কিরাআত পাঠ করতে হয়, ফাতিহা পড়ার পর আমীন জোরে না নীরবে বলবেন এ ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমার সিদ্ধান্ত হলো নীরবে পাঠ করা। অপর দু' মাজহাবের সিদ্ধান্ত হলো ইমাম সজোরে পাঠ করবেন।

নামাযে মুক্তাদিদের কর্তব্য

এ ক্ষেত্রেও ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মলিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা ঐকমত্যে পৌঁছেছেন যে, ইমামের মতো মুক্তাদিরাও আমীন নীরবে বলবেন। শাফিঈ মাজহাবের পরবর্তী ফকীহগণের মাতামতও একই। কিন্তু হাম্বলীদের মতামত হলো মুক্তাদিরাও ইমামের মতো সজোরে পাঠ করবেন।

'আমীন' কি?

আমীন বলা একটি সুন্নাত। এই শব্দটির অর্থ '(আমার প্রার্থনা) কবুল করুন'। অধিকাংশ উলামার মতে আমীন হলো একটি দু'আ। এজন্যই আমীন বলে দু'আ শেষ করে থাকেন অনেকে। পবিত্র কুরআনেও আমীন শব্দ দ্বারা দু'আ উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যেমন:

دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-"সেখানে তাদের প্রার্থনা হল 'পবিত্র তোমার সত্তা হে আল্লাহ!' আর শুভেচ্ছা হল 'সালাম' আর তাদের প্রার্থনার সমাপ্তি হয়, সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপালক আল্লাহর জন্য বলে।।" [সূরা ইউনুস : ১০]

উক্ত আয়াতে দ্বিবচন ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ উভয়ের দু'আ কবুল হয়েছে। অথচ দু'আ করছিলেন শুধুমাত্র মূসা আলাইহিস্সালাম। এতে বুঝা যায় তাঁর সাথী হারুন আলাইহিস্সালাম দু'আয় শরীক ছিলেন 'আমীন' উচ্চারণ করে করে।

ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 'বাব যাহরিল ইমাম বিত-তা'আমীন' নামকরণে একটি পরিচ্ছেদ যুক্ত করেছেন তাঁর সহীহ কিতাবে। এর অর্থ 'ইমাম জোরে আমীন বলার উপর পরিচ্ছেদ'। তিনি এই বাবে উল্লেখ করেছেন:

وَقَالَ عَطَاءٌ آمِينَ دُعَاءٌ

হযরত 'আতা বলেন: "আমীন হলো একটি দু'আ"। [বুখারী]

হাফিজ ইবনে হাজর আসকালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অনুরূপ বলেছেন। তাঁর ফাতহুল বারীতে আছে: "যে আমীন বলে তাকে দু'আকারী বলা হয়।" এরপর তিনি উপরোক্ত সূরা ইউনুসের ১০ নং আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন: "মূসা আলাইহিস্সালাম দু'আ করছিলেন আর হারুন আলাইহিস্সালম আমীন বলছিলেন, যেমনটি বর্ণনা করেছেন, ইবনে মুয়াবিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে।" [ফাতুহুল বারী]

সুতরাং আমীন একটি দু'আ- এটা কুরআন-হাদিসের আলোকে স্পষ্ট প্রমাণিত হলো। এরপর আল্লাহ তা'আলা কিভাবে দু'আ পড়লে তিনি সবচেয়ে বেশী রাজী হন তার বর্ণনা দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে:

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

-"তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে ডাক, কাকুতি-মিনতি করে এবং সংগোপনে, তিনি সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না।" [সূরা আরাফ : ৫৫]

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা দু'আর উত্তম পন্থা কি তা জানিয়ে দিয়েছেন মহান রাব্বুল আলামীন। এটা হবে নীরবে ও সর্বাধিক কায়মনোবাক্যে। অন্যান্য একাধিক আয়াতে তাঁর নবীগণের দু'আর কথা বর্ণিত হয়েছে। হযরত জাকারিয়া আলাইহিস্‌সালামের কথা বলা হয়েছে:

إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا

-"যখন তিনি আল্লাহকে ডাকলেন, গোপনে।" [সূরা মারইয়াম : ৩]

অপর আয়াতে বলা হয়েছে:

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ

-"অতঃপর আমি তার দু'আ কবুল করেছিলাম, তাকে দান করেছিলাম ইয়াহইয়া এবং তার জন্যে তার স্ত্রীকে প্রসব যোগ্য করেছিলাম, তারা সৎকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়ত, তারা আশা ও ভীতি সহকারে আমাকে ডাকত এবং তারা ছিল আমার কাছে বিনীত।" সূরা আম্বিয়া : ৯০]

অন্যান্য আয়াতে কিয়ামতের বর্ণনায় অনুরূপ নীরবতার কথা বলা হয়েছে। যেমন:

يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا

-"সেই দিন তারা আহ্বানকারীর অনুসরণ করবে, যার কথা এদিক-সেদিক হবে না এবং দয়াময় আল্লাহর ভয়ে সব সংক্ষীর্ণ হয়ে যাবে। সুতরাং মৃদু গুণগুণ ব্যতীত তুমি কিছুই শুনবে না।" [সূরা ত্বোয়া হা : ১০৪]

সুতরাং নামাযে আমীন দু'আ হিসাবে পাঠ করা হয়, তা-ই সজোরে বলার মধ্যে আলাদা কোন ফায়দা নেই। এটা কুরআনের তিলাওয়াতও নয়। ফিরিশতারাও সজোরে পাঠ করেন বলে প্রমাণ নেই। আর আল্লাহ তা'আলা তো মনের অভ্যন্তরস্থ সর্বাপেক্ষা গোপনীয় ভাবনা পর্যন্ত শুনেন ও জানেন। তিনি 'আস্‌সামী'" অর্থাৎ সর্বশ্রোতা এবং 'আল-ক্বারীব' অর্থাৎ সর্বাধিক নিকটবর্তী।

এ পর্যন্ত আলোচনা থেকে কুরআন-হাদিসের উদ্ধৃতিসহ আমরা প্রমাণ করলাম 'আমীন' একটি দু'আ। আর দু'আ নীরবে পাঠ করাই উত্তম।

এখন, আমাদের প্রতিপক্ষ সালাফি ভাইরা বলবেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইত্তিবা করছি মাত্র। এটা দু'আ কি না, কিংবা দু'আ হলে নীরবে পড়া উত্তম কি না সেটা মূখ্য নয়। মূখ্য বিষয় হলো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে পড়েছেন, সেটা জানা।

ভালো কথা। তবে এটা কখনো মনে করা উচিৎ নয় যে, মাজহাবী সিদ্ধান্ত যুক্তিভিত্তিক। আসলে সকল মাজহাবী সিদ্ধান্ত কুরআন, হাদিস, কিয়াস ও ইজমার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মোটকথা, সকল সিদ্ধান্তই মূলত তথ্যভিত্তিক বা সহীহ বর্ণনাভিত্তিক। উপরে আমরা দু'আ হিসাবে আমীন জোরে বলার চেয়ে নীরবে বলা উত্তম হওয়ার দীলল পেশ করেছি। কিন্তু এখনও বর্ণনাভিত্তিক প্রমাণাদি উপস্থাপন করি নি। সুতরাং এক্ষুণি সেদিকে মনোনিবেশ করছি।

‘আমীন’ বলবো নীরবে না উচ্চস্বরে- হাদিস কী বলে?

হাদিস - ১:

أَنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ وَعِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ تَذَاكَرَا : فَحَدَّثَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ أَنَّهُ حَفِظَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكْتَتَيْنِ سَكْتَةً إِذَا كَبَّرَ وَسَكْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ { غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ } فَحَفِظَ ذَلِكَ سَمُرَةُ وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَكَتَبَا فِي ذَلِكَ إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَكَانَ فِي كِتَابِهِ إِلَيْهِمَا أَوْ فِي رَدِّهِ عَلَيْهِمَا أَنَّ سَمُرَةَ قَدْ حَفِظَ

-হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব এবং ইমরান ইবনে হুসাইন রাদ্বিআল্লাহু আনহুমার মধ্যে আলোচনা হচ্ছিলো। সামুরা রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন, “আমি দু’বার রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাসকে নামাযে নীরব থাকতে দেখেছি। প্রথমবার ছিলো প্রথম তাকবীর বলার পর ও দ্বিতীয়বার ছিলো ওয়ালাদ্দোয়া-ল্লিন বলার পর।” হযরত ইমরান রাদ্বিআল্লাহু আনহু এ কথাটি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। সুতরাং উভয়ে এ ব্যাপারে হযরত উবাই ইবনে কা’ব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নিকট পত্র লেখলেন। প্রতিত্তোরে তাঁরা যা পেলেন তা ছিলো, “সামুরা [রাদ্বিআল্লাহু আনহু] সঠিকভাবেই স্মরণ রেখেছেন। [অর্থাৎ তাঁর বর্ণনাটি সঠিক]।” [আবু দুউদ]

হাদিস - ২:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ { غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ } فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ آمِينَ وَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُ آمِينَ فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “ইমাম যখন গাইরিল মাগদ্বুবিআলাইহিম ওয়ালাদ্দোয়া-ল্লিন বলেন, তোমরা আমীন বলো, কারণ ফিরিশতারা আমীন বলেন, ইমামও বলেন।” [নাসাঈ]

এই হাদিস দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হলো, ইমামকে আমীন নীরবে বলতে হবে। ফিরিশতাদের আমীন বলা আমরা শুনি না, আর ইমাম যেহেতু নীরবে পড়বেন, তার আমীন বলাও আমাদের শ্রুতিগোচর হবে না। এজন্যই বলা হয়েছে, ইমামও বলেন। ইমাম যদি জোরে বলার নিয়ম হতো তাহলে তিনি বলতেন, ‘ইমামের সঙ্গে’ কিংবা ‘ইমাম যেভাবে বলেন’। আমরা ইমামের ও ফিরিশতাদের আমীন বলা শুনবো না। এজন্যই বলা হয়েছে- তোমরা বলো, কারণ ফিরিশতা ও ইমাম বলেন [যা তোমরা শুনো না]। উভয়ে নীরবে বলেন, তা-ই তোমরাও নীরবে বলো- এটা বুঝানোই হলো হাদিসের উদ্দেশ্য। আশারাখি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে।

হাদিস - ৩: হযরত ওয়াইল ইবনে হাজর রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغَ { غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ } قَالَ آمِينَ وَأَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ

“ওয়াইল তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়েছি। তিনি যখন ‘গ্বাইরিল মাগ্বদ্বুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্দোয়াল্লীন’ বললেন, তখন আমীন নীরবে বললেন।” [আহমদ, আবু ই’লা ও তাবারানী; ফাতহুল কাদীর থেকে উদ্ধৃত]

উপরোক্ত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওাসাল্লাম নীবরে আমীন পাঠ করেছেন।

হাদিস - ৪:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ { غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ } فَقُولُوا آمِينَ

হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "যখন ইমাম ওয়ালদ্দোয়া-ল্লিন বলেন, তোমরা আমীন বলো।" [বুখারী]

উক্ত হাদিস দ্বারা স্পষ্ট, যদি ইমাম ও মুক্তাদীদের জন্য আমীন জোরে বলা উত্তম হতো তাহলে হাদিসের কথাগুলো এভাবে হতো না। হয়তো তিনি বলতেন, ইমাম যখন আমীন বলেন তখন তোমরাও আমীন বলো। কিন্তু যেহেতু ইমামের আমীন বলা শুনা যাবে না, তাই তিনি বলেছেন, তোমরা ওয়ালাদ্দোয়া-ল্লিন শুনে আমীন নীরবে বলবে। আর এটা তো সাধারণ নিয়ম যে ইমাম যা করেন মুক্তাদীরা তাই করবে। ইমাম যদি আমীন নীরবে বলেন তাহলে মুক্তাদীদের পক্ষে আমীন সজোরে বলা নামাযের আদব বহির্ভুত আমল হবে। মনে রাখা দরকার এই দু'আটি নীরবে পাঠ করাই আল্লাহর নিকট বেশী প্রিয়।

লক্ষ্যণীয় ব্যাপার যে, যেসব হাদিসে বলা আছে 'যখন ইমাম আমীন বলেন' তা মূলত একথা বুঝায়, 'যখন ইমামের জন্য আমীন বলার সময় আসে'। উলামায়ে কিরাম ওসব হাদিস শাব্দিক অর্থে গ্রহণ না করে উক্ত ব্যাখ্যানুসারে গ্রহণ করতে হবে বলেছেন। এ ব্যাপারে তাঁরা বিভিন্ন প্রমাণাদিও উপস্থাপন করেছেন।

হাদিস - ৫:

عن علقمة بن وائل عن أبيه أنه صلى مع النبى صلى الله عليه وسلم حين قال : (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) قال : آمين يخفض بها صوته

হযরত শু'বাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত আলক্বামাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নামায পড়েছি। তিনি গাইরিল মাগদ্বুবিআলাইহিম ওয়ালাদ্দোয়া-ল্লিন উচ্চারণ শেষে নিম্নস্বরে আমীন বললেন।" [দারে কুতনী, আহমদ, হাকিম]

উপরোক্ত ৫টি হাদিস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমীন নীরবে পাঠ করেছেন। এবার দেখা যাক আসহাবে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুম ও তাবিঈগণ এ ব্যাপারে কি বলেছেন।

'আমীন' সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরামের মন্তব্য

বর্ণনা - ১.

وعن أبى وائل قال كان علىٰ وعبد الله لا يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم ولا بالتعويذ ولا بالتأمين (رواه الطبرانى فى الكبير)

আবু ওয়াইল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন, হযরত আলী ইবনে আবু তালিব ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা 'আউযুবিল্লাহ', 'বিসমিল্লাহ' ও 'আমীন' সজোরে পাঠ করতেন না।[২৫৫]

বর্ণনা - ২.

عن أبى وائل قال : كان عمر وعلىٰ لا يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم ولا بالتعوذ ولا بآمين (ابن جرير والطحاوى وابن شاهين فى السنة)

আবু ওয়াইল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযরত উমর বিন খাত্তাব এবং হযরত আলী বিন আবু তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা 'বিসমিল্লাহ' ও 'আমীন' সজোরে পাঠ করতেন না।"[২৫৬]

বর্ণনা - ৩.

হযরত আবদুর রাজ্জাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'মুসান্নাফে' প্রখ্যাত তাবিঈ হযরত ইব্রাহীম নাখয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণনা করেন:

---

[২৫৫] তিরমিযী, মাযমাল জাওয়ায়িদ, খ.২, পৃ: ১০৮ থেকে উদ্ধৃত।
[২৫৬] কানযুল উম্মাল, ইবনে জরীর, তাহাবী, ইবনে শাহীন তাঁর সুন্নাহ কিতাবে এবং ইলাউস সুনান, খ.২, পৃ. ২১৫।

عبد الرزاق عن الثورى عن منصور عن إبراهيم قال : خمس يخفين سبحانك اللهم ! وبحمدك والتعوذ وبسم الله الرحمن الرحيم وآمين واللهم ! ربنا لك الحمد

"৫টি জিনিস নীরবে বলবেন: সুবহানাকা আল্লাহুম্মা! ওয়াবিহামদিকা, তা'য়াউউজ, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, আমীন এবং 'আল্লাহুম্মা! রাব্বানা লাক্বাল হাম্‌দ'"।[২৫৭]

বর্ণনা - ৪.

ইমাম মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'কিতাবুল আসারে' প্রখ্যাত তাবিঈ হযরত ইব্রাহীম নাখয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণনা করেন:

محمد قال : أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : أربع يخافت بهن الإمام : سبحانك اللهم وبحمدك والتعوذ من الشيطان وبسم الله الرحمن الرحيم وآمين قال محمد : وبه نأخذ وهو قول أبى حنيفة رضى الله عنه

-"ইমাম মুহাম্মদ বলেন: আমি আবু হানিফা (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে জেনেছি, হাম্মাদ ইব্রাহীম থেকে বর্ণনা করেছেন: তিনি বলেন, ইমামের জন্য চারটি জিনিস নীরবে পাঠ করতে হয়: সুবহানাকা আল্লাহুম্মাহ ওয়াবিহামদিকা, শয়তান থেকে তা'য়াউউজ (শয়তান থেকে ফানাহ চাওয়া), বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম এবং আমীন। ইমাম মুহাম্মদ বলেন: এটা নেওয়া হয়েছে ইমাম আবু হানীফা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর কথা থেকে।"

'আমীন' নীরবে বলার অন্যান্য কারণ

আমরা উপরে হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈগণের আমলের উদ্ধৃতি দ্বারা আমীন নীরবে বলার পক্ষে

[২৫৭] মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক।

দলিলাদি পেশ করেছি। স্বরবে না বলে নীরবে আমীন বলা উত্তম হিসাবে তিনটি মাজহাবের সিদ্ধান্তের কারণ এগুলো থেকেই সুস্পষ্ট। এরপরও আমরা কিছুটা যৌক্তিক আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি আরো পরিষ্কার করবো।

১. উলামায়ে কিরামের মতৈক্য হয়েছে, 'আমীন' সূরা ফাতিহা বা কুরআনের অংশ নয়। এটা আলাদা একটি দু'আ যা সাধারণত দু'আর শেষে বলা হয়। সুতরাং স্বরবে ফাতিহা পাঠের নিয়ম যেহেতু তিলাওয়াতে কুরআন হিসাবে, তা-ই আমীন স্বরবে সংযুক্ত করলে তা তিলাওয়াতের অংশ হিসাবেই অনুভুত হবে। কিন্তু আসলে সেটা তো নয়। তাই নীরবে বলাই হবে উত্তম। হ্যাঁ নামায ছাড়া অন্যান্য সময় কুরআনের দু'আর আয়াত উচ্চারণ শেষে আমীন জোরে বললে কোনো অসুবিধা নেই। তখন ঐ দু'আর সমর্থন হিসাবেই আমীন বলা হয়। সে ক্ষেত্রে নামাযের বিশেষ নিয়ম-কানুন জড়িত নেই। মনে রাখা দরকার ক্বিয়াম অবস্থায় ফাতিহা পাঠ জরুরী। আমীনসহ এই জরুরত আদায় হলে সহজেই ধারণা জন্মামে এটি তিলাওয়াতের অংশ- যা তা নয়। সুতরাং আমীন নীরবে আলাদাভাবে পাঠ করা দ্বারা এই ভুল-ধারণা থেকে বাঁচার উপায় হবে।

২. কোন কোন উলামা বিসমিল্লাহ শরীফ কুরআনের আয়াত হিসাবে মনে করেন। এমনকি সূরা ফাতিহার প্রথম আয়াত হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু এরপরও নামাযে ফাতিহা পড়ার সময় তাঁদের অধিকাংশ বিসমিল্লাহ নীরবে পাঠ করেন। সুতরাং যা তাঁদের মতে ফাতিহার প্রথম আয়াত হওয়া সত্ত্বেও নীরবে পাঠের সুস্পষ্ট দলিল থাকায় স্বরবে পড়া হয় না, সে ক্ষেত্রে ফাতিহার অংশ না হওয়া ও দু'আ হিসাবে গণ্য 'আমীন' কোন্‌ যুক্তিতে সজোরে পাঠ করা সঠিক হতে পারে? এরপরও আমরা এ সম্পর্কে মাজহাবী সিদ্ধান্ত অবৈধ বা ঠিক নয় বলছি না। কিন্তু গাইর মুকাল্লিদ সালাফিরা কেনো তাদের অনুসৃত আমল আমাদের উপর চাপিয়ে দেবেন? তারা কোনো মাজহাবের সিদ্ধান্ত মুতাবিক এই আমল করছেন না। এতে আমাদের কছুই যায় আসে না। যদিও আমরা তাদেরকে উপদেশ দেবো, মাজহাবের অনুসরণ করুন। এতে বিভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতা থেকে বাঁচতে পারবেন। দ্বীনকে সঠিকভাবে পালন করতে সমর্থ হবেন।

এবার দেখা যাক ওসব হাদিস যা 'আমীন' নীরবে পাঠের পরিপন্থী বলে মনে হয়। অর্থাৎ এগুলো দ্বারা ধারণা জন্মে আমীন স্বরবে বলা উচিৎ। কিন্তু আসলে কি তাই? একটু ধীরস্থিরে এগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করে দেখা যাক।

যেসব হাদিস বাহ্যত নীরবে পাঠের বিপরীত বলে মনে হয়

১. হযরত ওয়াইল ইবনে হাজর রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন:

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ { غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ } فَقَالَ آمِينَ وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম [নামাযে] গাইরিল মাগদ্বুবিআলাইহিম ওয়ালাদ্দোয়া-ল্লিন পাঠ শেষে 'আমীন' বললেন। দিনি দীর্ঘ করে তা উচ্চারণ করেন।" [তিরিমিযী, আবু দাউদ]

উক্ত হাদিসে আরবী শব্দ 'মাদ্দা' প্রয়োগ করা হয়েছে। হাদিসের ক্ষেত্রে এর অর্থ 'টেনে লম্বা করা'। এখানে শব্দটির অর্থ যা বুঝাচ্ছে বলে ধারণা করা হয়েছে তাহলো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আমীন' শব্দের প্রথম অক্ষর 'আলিফ' টেনে লম্বা করে বলেছেন। একথা বলা হয় নি, বা এর অর্থ এটা নয় যে, তিনি স্বরবে বলেছেন। বাস্তবে এই ব্যাপারটির ব্যাখ্যা রাবী ওয়াইল ইবনে হুজর রাদ্বিআল্লাহু আনহু অন্য হাদিসে দিয়েছেন। আমরা ইতোমধ্যে এটি উপরে (হাদিস - ৩, পৃ. ২৬৪) উদ্ধৃত করেছি। তিনি এতে স্পষ্ট বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আমীন' নীরবে বলেছেন।

২. হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ رَافِعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ تَرَكَ النَّاسُ التَّأْمِينَ وَكَانَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ { غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ } قَالَ آمِينَ حَتَّى يَسْمَعَهَا أَهْلُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَيَرْتَجُّ بِهَا الْمَسْجِدُ

"…. যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাইরিল মাগদ্বুবিআলাইহিম ওয়ালাদ্দোয়া-ল্লিন শেষে 'আমীন' বললেন তখন প্রথম সফের লোকজন তা শুনতে পেলেন। মসজিদের ভেতর তাঁর এই আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হয়েছে।" [ইবনে মাজাহ, হা. না. ৮৪৩]

প্রথমেই এটা বুঝতে হবে যে, এই হাদিসখানা দুর্বল। আমরা এ কারণেই হাদিসখানা পূর্ণ ইসনাদসহ উদ্ধৃত করেছি। রাবীদের মধ্যে (তৃতীয় স্থানে) বিশর ইবনে রাফী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আছেন। তাঁর সম্পর্কে বেশ কয়েকজন হাদিস গবেষক শক্ত নেতিবাচক মন্তব্য করেছেন। যেমন: ১. ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন: "তার বর্ণনার উপর ভিত্তি করে অনুসরণ করা ঠিক হবে না।" ২. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বলেছেন: "তিনি জঈফ"। ৩. ইমাম নাসাঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন: "তিনি মজবুত নন।" ৪. ইমাম হিব্বান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মন্তব্য করেছেন: "তিনি অনেক বানানো কথা বর্ণনা করেছেন।" [দেখুন, মিজান]

দ্বিতীয়ত, হাদিসের ভাষ্যমতে যদি আমীন বলার আওয়াজ প্রথম সফ পর্যন্ত পৌঁছে থাকে, তাহলে কিভাবে মানা যায় যে, এই আওয়াজ সমগ্র মসজিদে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। এভাবে হলে তো মসজিদের সকল সফ তথা সকল মুক্তাদীদের কানে শব্দ পৌঁছার কথা। সুতরাং এই হাদিসখানা আত্ম-সংঘাতপূর্ণ হওয়ায় একে মানা যায় না।

উপসংহার: 'আমীন' স্বরবে বলা, না নীরবে বলা, এ নিয়ে বেশ আগে থেকেই মতানৈক্য ছিলো। কিন্তু মাজহাবী সিদ্ধান্ত হওয়ার পর এর অবসান ঘটে। দুর্ভাগ্যবশত এ যুগের একদল মানুষ পুনরায় এই সুন্নাতটি পালন নিয়ে বাড়াবাড়িমূলক মন্তব্য শুরু করায় উম্মাহ্র মধ্যে অস্বস্তিবোধ আবারো জেগে উঠেছে। হানাফী ও অন্যান্য মজাহাবী সিদ্ধান্ত মূলত কুরআন-হাদিসের উপর ভিত্তিশীল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আমীন' প্রথম প্রথম স্বরবে বলেছেন সাহাবায়ে কিরামকে বিষয়টির উপর অবগত করতে। পরে এই

আমল তিনি ছেড়ে দেন এবং আমীন নীরবে বলেন। সুতরাং যারা আমীন নীরবে বলার পক্ষে তাদের কথা হলো, এই আমলটি রহিত হয়ে গেছে।

সবশেষে আমরা উপদেশ দিচ্ছি ওসব ভাইদের যারা আমীন সজোরে বলতে অটল। আপনারা বলুন তাতে কিছু যায় আসে না। তবে যারা নীরবে বলেন কিংবা বলেনই না তাদেরকে জোর করে বলানোর চেষ্টা করবেন না, দয়াকরে করবেন না। এতে ফিতনা বৃদ্ধি পাওয়া ছাড়া আর কোন ফায়দা হয় না। উপরোক্ত আলোচনা থেকে নিশ্চয়ই আপনারা অবগত হয়েছেন, 'আমীন' যেমন স্বরবে বলা যায় তেমনি নীরবেও বলা যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় আমল করেছেন বলে সুস্পষ্ট প্রমাণ মিলে। আমরা যারা নীরবে পড়ি তারা মনে করি এই: 'আমীন' স্বরবে পাঠ পরবর্তীতে নীরবে পড়ার স্বার্থে রহিত হয়ে গেছে। এ সিদ্ধান্তের সমর্থনে আরো ক'টি উদ্ধৃতি দিয়ে বিষয়টির ইতি টানছি।

হযরত ওয়াইল ইবনে হাজর রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "আমি মনে করি না, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটি (অর্থাৎ আমীন) জোরে বলেছেন একমাত্র আমাদেরকে শিক্ষা প্রদান ছাড়া।" [ফাতহুল মুলহিম, ইলাউস সুনান]

হযরত ইবনে জরীর তাবারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "উভয় ধরনের বর্ণনা (আমীন সজোরে ও নীরবে পড়া) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এসেছে। আর উভয় বর্ণনাই সহীহ।" [তাফসীরে তাবারী] অথচ অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম নীরবে পাঠের পক্ষে অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন। সুতরাং নীরবে বলাটা হবে অধিক যুক্তিযুক্ত। আল্লামা দারে কুতনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তো বলে দিয়েছেন: 'আমীন জোরে পড়ার পক্ষে বাস্তবে কোন সহীহ হাদিস নেই।'

ইবনুল কাইউম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি খুব সুন্দরভাবে ব্যাপারটির সমাধান দিয়েছেন। তিনি তাঁর জাদুল মা'আদ কিতাবে বলেন: "মুক্তাদীদেরকে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে মাঝে-মধ্যে 'আমীন' উচ্চস্বরে বললে কোন দোষ হবে না। হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু ছানা উচ্চস্বরে পড়েছেন মুক্তাদীদেরকে শিক্ষা দিতে।"

আর এ ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা অবগত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা।

২২. আলবানি ***তার বই 'আদাবুল জাফাফ'-এ মহিলাদেরকে স্বর্ণালঙ্কার আঙটি, ব্রেসলেট, চেইনসহ ইত্যাদি পরা শরীয়তে নিষিদ্ধ বলে ফাতওয়া জারি করেছেন।***

আলবানি সাহেবের এই ফাতওয়ার খণ্ডন: আমরা মনে করি আলবানির এই ফাতওয়াটি দ্বারাও কুরআন-হাদিসের সঠিক ব্যাখ্যা এবং মুফতিয়ানার উসূস সম্পর্কে তার স্বল্প জ্ঞানের সত্যটি আবারো উন্মোচন হয়েছে। মহিলারা যে স্বর্ণালঙ্কার পরতে পারবেন তার সমর্থনে কুরআনের এই আয়াতটিই প্রমাণ হিসাবে যথেষ্ট:

أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ

-"তারা কি এমন ব্যক্তিকে আল্লাহর জন্যে বর্ণনা করে, যে অলঙ্কারে লালিত -পালিত হয় [নারীরা] এবং বিতর্কে কথা বলতে অক্ষম।" [সূরা জুখরুফ : ১৮]

উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলছেন, অলঙ্কারাদি হলো মহিলাদের ভূষণ। আর অলঙ্কারাদির অন্তর্ভূক্ত হলো স্বর্ণ ও রৌপ্য।

একাধিক হাদিস শরীফেও মহিলাদের স্বর্ণালঙ্কার বৈধ বলা হয়েছে। আমরা প্রথমে জায়িদ ইসনাদে বর্ণিত একটি হাদিস তুলে ধরছি।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

قَالَ إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي

-"এই দু'টো (স্বর্ণ ও রেশম) আমার উম্মাহ্র পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ।" [আবু দাউদ, নাসাঈ]

ইমাম ইবনে মাজাহও একই হাদিস বর্ণনা করেছেন। সেখানে এগুলো মহিলাদের জন্য যে অনুমতি আছে সে কথাটিও দেখা যায়,

قَالَ إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ

"এই দু'টো (স্বর্ণ ও রেশম) আমার উম্মাহ্র পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ এবং মহিলাদের জন্য অনুমতি আছে।" [ইবনে মাজাহ, হা.না. ৩৫৮৫]

নিম্নে বর্ণিত হাদিসখানা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল তাঁর মুসনাদে, ইমাম নাসাঈ, ইমাম তিরমিযী, ইমাম হাকিম এবং ইমাম তাবারানী বর্ণনা করেছেন। তাঁরা সকলেই এটি সহীহ হিসাবে ঘোষণা দিয়েছেন। হাদিসটি এই:

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا

-হযরত আবু মূসা আশআরী রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "স্বর্ণ ও রেশম আমার উম্মাহ্র মহিলাদের জন্য বৈধ কিন্তু পুরুষদের জন্য নিষিদ্ধ।" [মুসনাদে আহমদ, হা.নং. ১৮৬৮২]

আলবানির মতে এই হাদিসের ইসনাদে সাঈদ ইবনে আবি হিন্দ ও আবু মূসার মধ্যে নাকি 'ফাঁক' আছে। বাস্তবে এরূপ কিছু নেই। উপরে যেসব মহাত্মন মুহাদ্দিসীনে কিরাম হাদিসখানা সহীহ বলে ঘোষণা দিয়েছেন, মনে হয় আলবানির সেদিকে খিয়াল পড়ে নি! প্রমাণ হিসাবে তাঁদের ঘোষণা আলবানির মন্তব্য থেকে শতগুণ শ্রেয়। আর যদি (যা বাস্তব নয়) তার কথা মেনে আমরা এটি গ্রহণ না করি, তাহলে আরো যে অনেক হাদিস দ্বারা বিষয়টি প্রমাণিত তার ব্যাপারে তিনি কি করবেন? সালফে সালিহীনের হাদিস বিশারদ সবাই সমর্থন দিয়েছেন যে, নারীরা স্বর্ণ ও রেশম ব্যবহার করতে পারবেন কিন্তু পুরুষদের জন্য নিষিদ্ধ। চার মাজহাবের মধ্যে এ ব্যাপারে ইজমাও হয়েছে। ইসলামের আবির্ভাব থেকেই মহিলারা স্বর্ণালঙ্কার ও রেশমের কাপড় পরে আসছেন। আজকের যুগে এসে এক দু'টো প্রশ্নবিদ্ধ হাদিসের উপর ভিত্তি করে অবৈধ বলে ফাতওয়া দেওয়া ফিতনা সৃষ্টির প্রয়াস ব্যতীত আর কিছুই হতে পারে না। অথবা আলবানি সাহেব নিজেকে 'মুজাদ্দিদ', 'মুজতাহিদ', 'আগের যুগের কেউ যা ধরতে পারেন নি তিনি ধরে ফেলেছেন' ইত্যাদি খেতাবধারী ও চাক্ষুষ্মান মুহাদ্দিস হিসাবে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্যতা লাভের আশায় এমন অশুদ্ধ ও অদ্ভুত ফাতওয়া দিতে পারেন। আল্লাহ তা'আলাই এ ব্যাপারে সর্বাধিক অবগত।

২১. *আলবানি সাহেব বলেন, পবিত্র তিন মসজিদ (মসজিদুল হারাম, মসজিদে নববী ও আল-আকসা মসজিদ) ছাড়া অন্য কোন মসজিদে ই'তিকাফ পালন বৈধ নয়।*[২৫৮]

আলবানি সাহেবের এই ফাতওয়ার খণ্ডন: অলবানীর ফাতওয়ার উপর আলোচনার পূর্বে ই'তিকাফ পালনের ক্ষেত্রে মাজহাবী সিদ্ধান্তগুলো নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন। আমাদের নিকট আলবানির ফাতওয়ার চেয়ে ঢের বেশী গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো মাজহাবী সিদ্ধান্ত। কারণ, আমরা তার মতো গায়র মুকাল্লিদ নয়।

ই'তিকাফ নিয়ে সুস্পষ্ট আলোচনা করেছেন শায়খ সাইয়েদ সাবিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর প্রণীত বিখ্যাত কিতাব ফিকহুস সুন্নায়। তিনি লিখেছেন: ই'তিকাফ পালন কোন্ মসজিদে বৈধ এবং কোন্ মসজিদে অবৈধ এ ব্যাপারে উলামার মধ্যে মতানৈক্য আছে। হযরত ইমামে আজম, হযরত আহমদ ইবনে হাম্বল, হযরত ইসহাক, হযরত আবু সওর রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমুখ বলেছেন, ই'তিকাফ যে কোন মসজিদে বৈধ যেখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআতের সাথে নিয়মিত আদায় হয়। তাদের এই মতামত নিম্নের কুরআন শরীফের আয়াত এবং পরে উদ্ধৃত হাদিসটির উপর নির্ভরশীল:

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন: وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

-"যতক্ষণ তোমরা [ই'তিকাফ অবস্থায়] মসজিদে অবস্থান কর।" [সূরা বাক্বারাহ : ১৮৭ (অংশবিশেষ)]

হাদিস শরীফে আছে:

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ كُلُّ مَسْجِدٍ لَهُ مُؤَذِّنٌ وَإِمَامٌ فَالاِعْتِكَافُ فِيهِ يَصْلُحُ

---

[২৫৮] তার ফাতওয়া গ্রন্থ দ্রঃ।

“যে মসজিদে আযানের জন্য মুয়াজ্জিন ও জামাআতের জন্য ইমাম থাকেন, তাতে ই’তিকাফ পালন জায়িয।” [সুনানে দারে কুতনী, হা.নং. ২৩৮২]

ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ এবং ইমাম দাউদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মতামত হলো, যে কোন মসজিদে ই’তিকাফ পালন করা জায়িয। তাঁরা বলেন, কোন বিশেষ মসজিদে পালন করা যাবে না বলে কোন প্রমাণ নেই। শাফিঈ মাজহাবের অনুসারীরা বলেন, ই’তিকাফ কোনো জামে মসজিদে পালন করা উত্তম। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে মসজিদেই ই’তিকাফ করেছেন। অপর কারণ হলো, জামে মসজিদে জামাআতে মুসল্লিদের সংখ্যা অনেক বেশী হয়। জামে মসজিদ না হলে ই’তিকাফ পালনকারী [যদি ১০ দিনের জন্য ই’তিকাফ করে থাকেন কিংবা ই’তিকাফ পালনকালে জুমু’আ-বার সংশ্লিষ্ট থাকে] জুমু’আ নামায তরক করবেন। সুতরাং জামে মসজিদই সর্বাধিক উত্তম।

উক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হলো ই’তিকাফ পালনের ক্ষেত্রে চার মাজহাবের সিদ্ধান্তে তেমন কোন পার্থক্য নেই। পুরুষের জন্য ই’তিকাফ যে কোন মসজিদেই বৈধ যদি সেখানে আযানসহ পাঁচ ওয়াক্তের নামায জামাআতের সাথে পড়া হয়। আর জামে মসজিদে উত্তম, কারণ ই’তিকাফ পালনকারীর জুমু’আ নামায তরক হবে না। নাসিরুদ্দীন আলবানি সাহেবের সিদ্ধান্ত খণ্ডনে আমাদের জন্য এটুকু তথ্যই প্রমাণ হিসাবে যথেষ্ট। এরপরও আমরা একটু তলিয়ে দেখতে পারি কেনো হঠাৎ করে এ যুগের ‘এক্সপার্ট গবেষক (?)’ এ ব্যক্তি নতুন এই ফাতওয়া জারী করলেন?

নাসিরুদ্দীন আলবানি এবং মুহাম্মদ জিবালী যে হাদিসটির উপর ভিত্তি করে এই নতুন ফিতনার জন্ম দিয়েছেন তাহলো এই:

একদল লোক কুফায় হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু ও হযরত আবু মূসা আশআরী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর গৃহের মামামাঝি অবস্থিত একটি মসজিদে ই’তিকাফ পালন করছিলেন। হুজাইফি রাদ্বিআল্লাহু আনহু ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে প্রশ্নে করলেন, “আপনার ও আবু মূসার ঘরের মাঝখানে অবস্থিত মসজিদে ই’তিকাফ পালন আপনার মতে সঠিক কি?” তিনি আরো বললেন, “আপনি তো জানেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “তিনটি মসজিদ [অর্থাৎ মসজিদুল হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদে আকসা] ছাড়া ই’তিকাফ পালন করা যাবে না।” ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু জবাব দিলেন: “তুমি হয়তো ভুলে গেছো [এ কথার অর্থ], কিন্তু তাঁরা [যারা মসজিদে ই’তিকাফ পালনে ছিলো] ভুলেন নি। কিংবা তুমি ভুল পথে আছো, কিন্তু তারা সঠিক।” [তাহাবী তাঁর মিশকাতুল আনওয়ার; জাহাবী তাঁর সিয়ারু আ’লামিন নুবালা; ইসমাঈলী ও সুনানে বাইহাকী]

হাদিসের প্রথম অংশের উপর আমাদের যুগের ফকীহ সাহেব (!) গুরুত্ব দিয়েছেন। ইবনে মাসউদ যে এটি সন্দেহ করেছেন তা তিনি বিবেচনা করেন নি!

হুজাইফাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণিত উক্ত হাদিসে এটা পরিষ্কার যে, হযরত ইবনে মাসউদ (যিনি সাহাবী হিসাবে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ফকীহ ছিলেন) রাদ্বিআল্লাহু আনহু যে কোনো মসজিদে ই’তিকাফ পালন বৈধ বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, যদিও হুজাইফাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু ভিন্নমত পোষণ করেছিলেন। তাঁর বর্ণনা ও এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে তিনি সন্দেহ পোষণও করেছেন। ইমাম শাওকানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন:

“এটা যদি নিশ্চিত সত্য হতো যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধুমাত্র তিনটি মসজিদে ই’তিকাফ বৈধ বলেছেন তাহলে ইবনে মাসউদ কখনো এর উপর সন্দেহ পোষণ করতেন না। অবশ্যই না।” [নাইলান আওতার]

ইবনে হাজর আসকালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই হাদিসখানা সম্পর্কে তাঁর ফাতহুল বারীতে উল্লেখ করেন:

“হুজাইফাহ ইবনুল ইয়ামান রাদ্বিআল্লাহু আনহু তিন মসজিদের কথাই বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।” কিন্তু তিনি তা রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে বলে মনে করেন নি। কারণ উভয় সাহাবীর মধ্যে প্রথম জন (হুজাইফাহ) নিশ্চিত হলেও ইবনে মাসউদ নিশ্চিত হন নি। তিনি আরো বলেন, ইনবে মাসউদের সিদ্ধান্তের উপরই ফুকাহায়ে কিরাম একমত হয়েছেন। তাঁরা সর্বদাই হাদিসখানা হুজাইফা পর্যন্ত নিশ্চিত বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত নয়। ইবনে মাসউদের সন্দেহ ও সতর্কতাই এর প্রমাণ। [ফাতহুল বারী]

অপর একটি বর্ণনায় আছে: ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর কথা শ্রবণ করে হুজাইফা রাদ্বিআল্লাহু আনহু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্পৃক্ত না করে বললেন: "আমি জানি, জামাআত আদায় করা হয় এমন মসজিদ ছাড়া ই'তিকাফ নেই।" [হযরত হাইসামী তাঁর 'মাজমাউয যাওয়াইদ' এবং ইবনে কুদামা তাঁর কিতাব 'মুগ্নি' এর 'ই'তিকাফ' অনুচ্ছেদে এটি বর্ণনা করেছেন]

অন্য এক বর্ণনায় জানা যায় স্বয়ং হুজাইফি রাদ্বিআল্লাহু আনহুও সন্দেহ পোষণ করেছেন। তিনি ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে বললেন: "আপনি জানেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তিন মসজিদ ছাড়া ই'তিকাফ নেই,' অথবা তিনি বলেছেন: 'জামাআত হয় এমন মসজিদ ছাড়া'।" [সুনানে সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব; নাইলাল আওতার] ইমাম শাওকানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "হাদিসে যে সন্দেহ [অথবা তিনি বলেছেন ...] উল্লেখিত হয়েছে তার দ্বারা যে কোন একটির প্রতি আস্থা স্থাপন অপর বর্ণনা হেতু দুর্বল হয়ে যায়।"

হুজাইফা রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদিসখানার অপর একটি ভিন্ন বর্ণনা হাইসামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাবারানীর আল-মু'জামুল কবীর থেকে উদ্ধৃত করেছেন। হাদিসের ইসনাদ সহীহ হিসাবে সাব্যস্ত হয়েছে। ইবনে কুদামা ও শাওকানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমাও এটি উদ্ধৃত করেছেন। এতে দেখা যায় হাদিসটি হুজাইফা পর্যন্ত গিয়ে আর এগোয় নি। তাঁর কাছে এসে বন্ধ হয়ে গেছে। হাদিসের বর্ণনাটি নিম্নরূপ:

قَالَ حُذَيْفَةُ لِعَبْدِ اللهِ: قَوْمٌ عُكُوفٌ بَيْنَ دَارِكَ وَدَارِ أَبِي مُوسَى أَلا تَنْهَاهُمْ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: فَلَعَلَّهُمْ أَصَابُوا وَأَخْطَأْتَ وَحَفِظُوا وَنَسِيتَ فَقَالَ حُذَيْفَةُ : لا اعْتِكَافَ إِلا فِي هَذِهِ الْمَسَاجِدِ الثَّلاثَةِ : مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَمَسْجِدِ مَكَّةَ وَمَسْجِدِ إِيلِيَا

-হুজাইফা রাদ্বিআল্লাহু আনহু ইনবে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে প্রশ্ন করলেন: "আপনার ও আবু মূসা আশআরীর গৃহের মধ্যখানে স্থাপিত মসজিদে মানুষ ই'তিকাফ পালন করছেন। আপনি কি তাদেরকে নিষেধ করবেন না? ইবনে মাসউদ জবাব দিলেন: 'হয়তো তারা সঠিক ও আপনি ভুল করছেন এবং তারা স্মরণে রেখেছেন কিন্তু আপনি রাখেন নি।' একথা শুনে হুজাইফা রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন: 'তিনটি মসজিদ তথা মদীনার মসজিদ, মক্কা শরীফের মসজিদ ও ইলিয়া' [আল-কুদ্স] মসজিদ ছাড়া অন্যত্র ই'তিকাফ নেই।" [তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর, হা.না. ৯৩৯৭]

এছাড়া আ'তা রাহামতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন: মক্কাস্থ মসজিদুল হারাম ও মদীনাস্থ মসজিদে নববী ছাড়া অন্য কোন মসজিদে ই'তিকাফ পালন বৈধ নয়। আরেক ফকীহ ইবনে মুসাইয়িবের মতে একমাত্র মসজিদে নববীতে ই'তিকাফ পালন বৈধ। এই উভয় মতামত হুজাইফা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাদিসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

যাক, আমরা প্রমাণ করলাম যে, হুজাইফা ও ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুমার মধ্যে মতানৈক্য ছিলো। হুজাইফা এক বর্ণনা অনুযায়ী, নিজেই সন্দেহ করেছেন। এছাড়া আরো কিছু ফকীহ ভিন্নমত পোষণ করেছেন। চার মাজহাবের ইমাম ও তাঁদের শাগরিদগণ এসব ব্যাপার সম্যক অবগত ছিলেন। সকলে গবেষণা করে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন তা-ই সঠিক এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির অনুকূলে।

মোটকথা, সকলের ইজমা মুতাবিক আসল ফাতওয়া হলো: "ই'তিকাফ যে কোন একটি মসজিদে বৈধ যেখানে পাঁচ ওয়াক্তের নামায জামাআতের সাথে নিয়মিত পড়া হয়। আর জুমু'আর নামাযে শরীক হওয়া নিশ্চিত করতে জামে মসজিদে ই'তিকাফ পালন সর্বাধিক উত্তম।" ইমামে আজম ও ইমাম আহমদ রাহামাতুল্লাহি আলাইহিমা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন: 'যে কোন মসজিদে ই'তিকাফ হবে যদি সেখানে জামাআতে নামায আদায় নিয়মিত হয়ে থাকে।' হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমাও এই মতের পক্ষে। কিন্তু ইমাম সানাঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর সুবুলুস সালাম কিতাবে বলেন: পাঞ্জেগানা মসজিদে ই'তিকাফ পালনকারী জুমু'আ নামাযের জন্য জামে

মসজিদে যাওয়া দ্বারা ই'তিকাফ বিনষ্ট হয়ে যায় কি না, এ ব্যাপারে বিরাট মতানৈক্য বিদ্যমান।

ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, জামাআত অনুষ্ঠিত হয় এমন মসজিদে ই'তিকাফ পালন বৈধ। ইমাম জুহরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জামে মসজিদে ই'তিকাফ করা ফরয বলেছেন। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর সহীহ কিতাবে [বুখারী শরীফে] "সকল মসজিদে ই'তিকাফ" নামক একটি বাব সংযুক্ত করেছেন। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে সকল মসজিদে ই'তিকাফ পালন বৈধ। তাঁর মতামত এ জন্য যে, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন: "যতক্ষণ তোমরা ই'তিকাফ অবস্থায় মসজিদে অবস্থান কর।" [সূরা বাক্বারাহ : ১৮৭ (অংশবিশেষ)] তিনি কোন বিশেষ মসজিদে অবস্থান করার কথা বলেন নি।

মালিকী মাজহাবে ই'তিকাফ নিজের বাড়িতে (পুরুষ ও মহিলাদের জন্য) বৈধ বলা হয়েছে। কিন্তু হানাফীরা শুধুমাত্র মহিলাদেরকে বাড়িতে ই'তিকাফ পালন বৈধ বলেছেন।

সুতরাং আমরা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করলাম, ই'তিকাফ যে কোন মসজিদে বৈধ যেখানে নিয়মিত জামাআতে নামায আদায় করা হয়। তবে জামে মসজিদে পালন করাই উত্তম। আর আলবানি সাহেবের ফাতওয়া সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। শুধুমাত্র তিন মসজিদে [মসজিদুল হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদে আকসায়] বৈধ আর পৃথিবীর অপর কোনটিতে বৈধ নয় এরূপ মতামতের কোন ভিত্তি ফুকাহায়ে কিরাম থেকে প্রমাণিত নেই। হ্যাঁ, উক্ত তিন মসজিদে ই'তিকাফ উত্তম হবে, এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। ওবস পবিত্র মসজিদসমূহে তো নামায পড়লেও অনেকগুণ বেশী সওয়াব মিলে। আল্লাহ ভালো জানেন।

২২. *চার মাজহাবের ইমামের পরিবর্তে তাকেই অনুসরণের জন্য সবাইকে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন! তার সকল অন্ধ অনুসারীরা আলবানির সমর্থিত হাদিস ছাড়া অন্য কোন হাদিসকে গ্রহণযোগ্যই মনে করেন না।*[২৫৯]

তার এই বক্তব্যের নিন্দা: বাস্তবে এটি একটি ঔদ্ব্যত্যপূর্ণ বক্তব্য। এর চেয়ে কঠিন ভাষায় সমালোচনা সমুচিত হবে বলে মনে করছি না। আমরা তো শিষ্টাচার বহির্ভুত মন্তব্য প্রকাশের জন্য এই গ্রন্থটি প্রণয়ন করি নি। তাঁর মতো নিম্নমানের একজন গবেষক কিভাবে আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের মতো মহাত্মনের সঙ্গে তূল্য হতে পারেন? কখনো নয়। এই মন্তব্য দ্বারা তার 'বড় হওয়ার' আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন। তিনি আধ্যাত্মিক ও মানসিকভাবে রোগাক্রান্ত হেতু এরূপ ধৃষ্টতাপূর্ণ মন্তব্য করতে পারেন। এ ধরনের মন্তব্য আমরা আজ পর্যন্ত তার থেকে শত-সহস্রগুণ জ্ঞানবান উলামা-ফুকাহা-ইমামদের থেকেও শুনি নি। তাঁরা কেউই মুজতাহিদ মতলক চতুষ্টয় মহাত্মন ইমামদের মতো ছিলেন বলে কখনো একবারও মন্তব্য পেশ করেছেন, এমন কথা কারো জানা নেই। নিজেকে যে বেশী জ্ঞানী মনে করে, সে মূলত অজ্ঞ ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমরা জানি স্বয়ং মুজতাহিদ ইমামদের কোন একজনও অপর কোন এক বা একাধিক মুজতাহিদ ইমাম থেকে ভালো বুঝতেন বা শ্রেষ্ঠ ছিলেন- এমন ঔদ্বত্যপূর্ণ মন্তব্য কখনো করেন নি।

পাঠকারাই এখন বিবেচনা করুন, জনাব আলবানি সাহেবের মতো মন্তব্য কোন্ পর্যায়ের মানুষ করতে পারেন?

[২৫৯] তার বিভিন্ন বক্তৃতায় এরূপ মন্তব্য শুনা যেতো। তিনি মাজহাবের বিরোধিতা ব্যক্ত করতে যেয়ে একথা বলতেন।

২৩. জুনুব অবস্থায় কিংবা কোনো মহিলার হায়েজ চলাবস্থায় কুরআন শরীফ ছোঁয়া, পাঠ করা এবং বহন করতে তাদের মতে কোন বাধা নেই! এর কুফল হিসাবে মধ্যপ্রাচ্যে দেখা যায় পবিত্র কুরআনের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা কমে গেছে। নাউযুবিল্লাহ![২৬০]

তাদের এই ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের খণ্ডন: সালাফিদের এই ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের কারণে কুরআনের আদব রক্ষা হচ্ছে না, যেভাবে হওয়া উচিৎ। তারা অযু ছাড়া কিংবা জুনুব অবস্থায়ও কুরআন স্পর্শ করতে একটুও দ্বিধাবোধ করেন না। আপনি প্রশ্ন করলে, জবাব দেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এমন কোন হাদিস নেই যেখানে তিনি বলেছেন আমরা এরূপ করতে পারবো না!" কিন্তু তারা আসলে ভ্রান্তির মধ্যে আছেন। আর এর প্রমাণ এখনই তুলে ধরছি।

১. অযু ছাড়া কুরআন শরীফ স্পর্শ করা উচিৎ নয়: কুরআন অযু ছাড়া স্পর্শ সঠিক নয়, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এরূপ কোন মারফু' হাদিস নেই সত্য। কিন্তু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, কুরআন গ্রন্থাকারে প্রকাশ হয়েছে বেশ পরে। আর দ্বীনের উসূল হলো যখন আমরা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোন ব্যাপারে কোন হাদিস বা বর্ণনা পাবো না, তখন আমাদেরকে সাহাবায়ে কিরামের আমল ও দিক-নির্দেশনার দিকে তাকাতে হবে। তাঁদের আমল ও নির্দেশ তখন প্রমাণ হিসাবে যথেষ্ট হবে।

উলামায়ে কিরাম অনেক সাহাবা, তাবিঈ ও ফকীহ গবেষকদের কথা উল্লেখ করেছেন, মহিলাদের হায়েজ ও [পুরুষ ও মহিলাদের] জুনুব অবস্থায় তো অবশই, এমনকি এসব থেকে মুক্ত হয়েও অযু ছাড়া কুরআন শরীফ স্পর্শ করার বিপক্ষে ছিলেন তাঁরা সকলেই। এখানে দু'জন উচ্চ পর্যায়ের সাহবায়ে কিরামের বর্ণনা এবং কয়েকজন বিখ্যাত ইমামের সিদ্ধান্ত প্রমাণ হিসাবে যথেষ্ট হবে বলে মনে করি।

[২৬০] তার এই ফাতওয়ার কথা সবাই জানেন। তিনি একটি প্রশ্নের উত্তরেও এটি ব্যক্ত করেছেন যার প্রমাণ আমাদের কাছে রক্ষিত আছে। তারা বলেন, "রাসূলুল্লাহ থেকে এমন কোন বর্ণনা নেই যেখানে তিনি বলেছেন, জুনুব বা অযু ছাড়া কুরআন শরীফ ছোঁয়া যাবে না!"।

ক. হযরত আবদুর রহমান ইবনে ইয়াজিদ রাহিমাহুল্লাহ এবং অন্যান্যরা বর্ণনা করেন:

عبد الرحمن ابن يزيد قال كنا مع سلمان فى حاجة فذهب يقضى حاجته ثم رجع فقلنا له توضأ يا أبا عبد الله لعلنا أن نسألك عن آى من القرآن قال فاسألوا فإنى لا أمسه إنه لا يمسه إلا المطهرون قال فسألناه فقرأ علينا قيل أن يتوضأ.

"আমরা হযরত সালমান ফারসী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সাথে ভ্রমণে ছিলাম। এক সময় তিনি প্রস্রাব করলেন। আমরা বললাম, অযু করুন। আমরা আপনাকে কুরআনের একটি আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করতে ইচ্ছুক। তিনি বললেন, প্রশ্ন করুন। আমি কুরআন শরীফ স্পর্শ করবো না। কারণ অবশ্যই, অযু ছাড়া এটি কেউ স্পর্শ করেন না। সুতরাং আমরা যা ইচ্ছে করছিলাম তিনি তিলাওয়াত করে শুনালেন।"[২৬১]

খ. মু'সাইব ইবনে সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন:

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ قَالَهَ كُنْتُ أُمْسِكُ الْمُصْحَفَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فَاحْتَكَكْتُ فَقَالَ سَعْدٌ لَعَلَّكَ مَسِسْتَ ذَكَرَكَ قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ قُمْ فَتَوَضَّأْ فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ

-"হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সম্মুখে হাতে মুসহাফ [কুরআন] নিয়ে আমি উপস্থিত ছিলাম। আমি [ওজর হেতু] চুলকালাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: 'তুমি কি তোমার গুপ্তাঙ্গ স্পর্শ করেছো?' আমি বললাম, জি হ্যাঁ। তিনি বললেন, দাঁড়াও! যাও, অযু সেরে এসো।' সুতরাং আমি অযু সেরে আসলাম।"[২৬২]

দ্রষ্টব্য: গুপ্তাঙ্গ স্পর্শ করলে হানাফী মাজহাব মতে অযু ভঙ্গ হয় না।

[২৬১] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ (১/৯৮), সুনানে দারে কুতনী (১/১২১), সুনানে বাইহাকী আল-কুবরা (১/৮৭) এবং মুস্তাদরাকে হাকিম (১/২৯২)। হাকিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক হাদিসখানা সত্যায়িত হয়েছে। তিনি বলেছেন: বুখারী ও মুসলিমের ওজনে এটি সহীহ। জাহাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তার সাথে একমত হয়েছেন।

[২৬২] মুয়াত্তা ইমাম মালিক (২/৯১], বাইহাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এটি সহীহ বলেছেন [খিলাফিয়্যাত, ১/৫১৬/৩০৫], ইবনে তাইমিয়া মাজমুউল ফাতওয়া [২৬/২০০]।

২. জুনুব বা গোসল ফরয অবস্থায় কিংবা মহিলাদের হায়েজ অবস্থায় কুরআন শরীফ স্পর্শ করা বৈধ নয়: আমরা ইতোমধ্যে প্রমাণ করেছি বিনা অযুতে কুরআন শরীফ স্পর্শ করা উচিৎ নয়। কুরআন শরীফ বলতে এমন কিতাব যেখানে শুধুমাত্র কুরআনের আয়াতমালা আছে কিংবা অধিকাংশ লেখা কুরআনের আয়াত। আমরা এখন প্রমাণ করবো জুনুব ও হায়েজ-নিফাস অবস্থায় কুরআন শরীফ স্পর্শ করা মোটেই বৈধ নয়।

ক. হযরত হাকিম বিন হাজাম রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

لا تَمَسَّ الْقُرْآنَ إلا وَأَنْتَ طَاهِرٌ

"তাহির [পবিত্র] অবস্থায় না থাকলে তুমি কুরআন স্পর্শ করতে পারবে না।"[২৬৩]

ইমাম হাইসামী মুজাম্মাল জাওয়ায়িদ গ্রন্থে বলেন, এই হাদিসের ইসনাদ সহীহ।

ইবনে আবদুল বার তাঁর ইস্তিসখার গ্রন্থে বলেন: "এটা একটি সর্বজনজ্ঞাত হাদিস। সকল গবেষক এটা গ্রহণ ও এর উপর আমল করেছেন।"

'আল-বাতিল ওয়াল মানাকির' গ্রন্থে হযরত জাওরাকানী বলেন: "এটা একটি বিখ্যাত হাসান হাদিস"।

হযরত আবদুল হক ইশবেলী তাঁর আহকামুস সুগরা কিতাবে বলেন: "এই হাদিসের ইসনাদ সহীহ"।

কেউ কেউ হাদিসটির ব্যাখ্যা ভিন্নভাবে দিয়েছেন। তবে আমাদের নিকট এটা স্পষ্ট যে, জুনুব ও হায়েজ অবস্থায় কুরআন শরীফ স্পর্শ করা বৈধ নয়- এ সিদ্ধান্তের জন্য হাদিসখানা প্রমাণ হিসাবে মানতে হবে।

খ. উক্ত হযরত হাকিম বিন হিজাম রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদিসটি হাকীমও বর্ণনা করেছেন। তিনি নিজেই এটি সহীহ বলে ঘোষাণা দিয়েছেন:

عن حكيم بن حزام   أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه واليا إلى اليمن قال : لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر- هذا حديث صحيح الإسناد

[২৬৩] মুজাম্মাল কবীর তাবারানী, হা. ৩০৬৪ (মাকতাবাতুশ শামিলাহ); মুজাম্মাস সাগীর।

-যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাকিম ইবনে হাজামকে ইয়ামন প্রেরণ করেন, তখন বললেন, "কুরআন স্পর্শ করবে না যতক্ষণ না তুমি পবিত্র হবে। -(হাকিম বলেন) এই হাদিসের ইসনাদ সহীহ।"[২৬৪]

লক্ষ্য করুন, ইমাম হাকীম নিজেই এটি সহীহ হওয়ার স্বীকৃতি দিয়েছেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এটি সহীহ।[২৬৫] ইমাম ইয়াকুব বিন সুফিয়ান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "এই হাদিস থেকেও আরো সহীহ কোন হাদিস আমার জানা নেই।"[২৬৬] ইবনে আবদুল বার বলেন: "এটা একটি জানা হাদিস। এটি বিখ্যাত হওয়ায় এর ইসনাদের দিকে দৃষ্টিপাতের প্রয়োজন নেই। এটা তাওয়াসির আইনের আওতুভুক্ত। মানুষ একে গ্রহণ করে নিয়েছেন।" [তাহমীদ, ১৭/৩৩৮]

গ. আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা তাঁর পিতা থেকে বলেন:

عن عبد الله بن ابى بكر عن ابيه قال كان فى كتاب النبى صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ان لا تمس القرآن الا علٰى طهر

-"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রেরিত একটি চিঠিতে আমর ইবনে হাজম রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে নির্দেশ দেন: "কেউ যেনো পবিত্র না হয়ে কুরআন স্পর্শ করে না।"[২৬৭]

হাদিসটি সম্পর্কে হাফিজ ইবনে হাজর আসকালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "এটা সর্বজনজ্ঞাত হাদিস। একদল উলামা একে সহীহ বলেছেন।"

ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন: "রাসূলুল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত এই চিঠি সম্পর্কে প্রমাণ আছে।"

ইবনে আবদুল বার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "এই প্রখ্যাত চিঠি সম্পর্কে সীরাত গবেষকরা অবগত। এটা উলামায়ে কিরামদের এতোই জানা

[২৬৪] হাকিম, দার কুতনী; উভয়ে এটি সহীহ বলেছেন। জাহাবী এবং হাইসামীও এটি সহীহ বলে ঘোষাণা দিয়েছেন। কেউ কেউ এটি দুর্বল বলেছেন। কিন্তু এর ইসনাদ অন্যান্যরা সহীহ বলেছেন।

[২৬৫] মাসাঈল, আল-বগভী এবং নাসবুর রায়া।

[২৬৬] মিজানুল ই'তিদাল, ২/২০২।

[২৬৭] তাবারানী, সুনানে কুবরা, এটি মুরসাল কিন্তু সহীহ এ কারণে যে, অন্যান্য হাদিস সংকলকও এটি বর্ণনা করেছেন যেমন: নাসাঈ, ইবনে হিব্বান এবং বাইহাকী।

যে, এর জন্য ইসনাদের প্রয়োজন নেই। এটা তাওয়াসুর এর মতো, কারণ মানুষ এ সম্পর্কে জানে ও বিশ্বাস করে।”[২৬৮]

উপসংহারে এটাই উল্লেখ করছি যে, মুকাল্লিদদের উচিৎ কুরআনে কারীম অযু ছাড়া স্পর্শ না করা। কারণ হানাফী, মালিকী ও শাফিঈ মাজহাবের সিদ্ধান্ত এটাই। আর জুনুব কিংবা হায়েজ-নিফাস অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা সম্পূর্ণ না জায়েয। এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতৈক্য হয়েছে। এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন ইবনে কুদামা। এমনকি ইবনে তাইমিয়াও একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। সুতরাং আলবানি ও তার অনুসারীদের এই বাতিল বিশ্বাসের প্রতি কেউ আকর্ষিত হবেন না, আমরা এটাই একান্ত কামনা করি। গায়র মুকাল্লিদ সালাফিদের প্রতিও আকুল আবেদন, আপনারা কুরআন শরীফের মর্যাদাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে রাখার আমল থেকে বঞ্চিত হবেন না। যুগ যুগ ধরে মুসলিম উম্মাহ্ কুরআনের আদব রক্ষার আমল করে আসছেন। এখন আপনারা কোনো এর জলাঞ্জলি দেবেন? আল্লাহর কালাম থেকে পবিত্র আর কি থাকতে পারে?

আমরা ইতোমধ্যে সালাফিদের ইমাম জনাব আলবানির বিভিন্ন ফাতওয়া, ভ্রান্ত আক্বীদা ও ধারণাসমূহ খণ্ডন করেছি। নীচে জনাব আলবানি ও সালাফি গায়র মুকাল্লিদদের আরো কিছু ভ্রান্তির তথ্য তুলে ধরছি। সাথে সাথে সংক্ষিপ্তভাবে এসব ভ্রান্তির উপর আমাদের মন্তব্য দিয়েছি। যুক্তির নিরিখেও তাদের অনেক কাজ ও আমল প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আশাকরি পাঠকরা এ ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে একমত হবেন।

[২৬৮] এসব মন্তব্যের সূত্র: নাসবুর রায়া, ইরওয়াল গালীল, হিশায়াত ইবনে আবিদীন; মাজমু'; কাশ্‌শাফুল ক্বিনা'; মুগনি; নাইনাল আওতার; মাজমুআল ফাতওয়া ইত্যাদি।

২৪. *আলাবানী সাহেব সহীহ হাদিস গ্রন্থ বুখারী ও মুসলিম শরীফের ‘শুদ্ধকৃত’ সংস্করণ কিতাব প্রকাশ করেছেন! তিনি একে, দুস্কৃতকারীদের মতো ‘সংক্ষিপ্ত সংস্করণ’ নামকরণ করেছেন।*

এরূপ করা মূল গ্রন্থদ্বয় ও সংকলকদের প্রতি অশ্রদ্ধা ও চরম বেআদবীর সামিল। অতীতে এরূপ বে-আদবীপূর্ণ কাজ কেউ করেন নি। আমরা তার এই কাজটির নিন্দা জানাচ্ছি। কুরআন শরীফের পর দ্বীনের সর্বাধিক সহীহ দলিল হলো সহীহাইন শরীফাইন। এ যুগে এসে এগুলোর মধ্যে ভুল খোঁজ করা ও শুদ্ধকৃত সংস্করণ প্রকাশ, দুস্কৃতকারীদের কর্মের অনুরূপ বলে আমরা মনে করি। যারা এরকম কাজে হাত দেয় তারা কখনো দ্বীনের উপকার করতে পারে না। বরং অপকার করছে।

আলবানি উক্তরূপ আরো ‘শুদ্ধকৃত সংস্করণ’ প্রকাশ করেছেন। আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, তারগীব তারহীব ইত্যাদি হাদিসের মূল কিতাবগুলোর উপরও তিনি করাত চালনা করেছেন। এসব কিতাবকে ‘সহীহ’ ও ‘দ্বায়ীফ’ নামকরণে দু'খণ্ডে বিভক্ত করেছেন। এই বিভক্তিকরণে তার অসংখ্য ভুলও ধরা পড়েছে [যার বর্ণনা একটু পরই আসছে]। ইসলামের ইতিহাসে কেউ এরূপ কাজ করেন নি। এভাবে মূল হাসিদগ্রন্থসমূহ দু'ভাগে বিভক্ত করায় পুরো উম্মাহ্‌র মধ্যে বিরাট মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে। হাদিসের উদ্দেশ্য ও অন্তর্নিহীত অর্থ অনুধাবনে বিভ্রান্তির পথ উন্মোচন হয়েছে। তার এসব কর্ম সত্যিই নিন্দনীয়। এভাবে হাদিস শরীফকে আলাদাকরণের মাধ্যমে তিনি ও তার অনুসারীরা বুঝাতে চাচ্ছেন, সকল দুর্বল হাদিস আমলের অযোগ্য! কথাটি তো মোটেই সঠিক নয়। সনদে দুর্বলতা মানে এটা নয় যে, হাদিসগুলো মিথ্যা বা মনগড়া! মূল কিতাবে সম্পৃক্তকরণই হলো এগুলো ‘প্রত্যাখ্যান করা যাবে না’- এ কথার সুস্পষ্ট দলিল। কেউ কি এসব হাদিস মূল কিতাব থেকে মুছে ফেলার সাহস পাবে?

২৫. আলবানি তিনটি সুনান তথা ইমাম বাইহাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির 'আদাবুল মুফরাদ', ইমাম মুনযিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির 'তাগরিব ওয়াত তাহরিব' এবং ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির 'জামি আস-সাগীর' গ্রন্থের নতুন স্টাইলের সংস্করণ প্রকাশ করেছেন। প্রতিটি গ্রন্থকে আবার তিনি দু'টি খণ্ডে বিভক্ত করেছেন: 'সহীহ' ও 'জঈফ' অংশ হিসাবে।

এরূপ মারাত্মক কাজ মূল লেখকদের প্রতি চরম বেআদবীপূর্ণ আচরণ তো বটেই। এভাবে বিভক্ত করার ফলে মানুষের মধ্যে এই ভুল ধারণার জন্ম নিয়েছে যে, "**জঈফ হাদিস সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যানযোগ্য!**" কিন্তু আসলে তাতো নয়। অনেক জঈফ হাদিসের উপরও আমল করা শরীয়তে বৈধ। এছাড়া তিনি অনেক হাদিস জঈফ বলেছেন যা আসলে তা নয়। আলিমদের মতে তার এই কাজটি মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য সর্বাধিক মারাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষ ধীরে ধীরে 'আমলহীন' হয়ে দ্বীন থেকে প্রায় বের হয়ে পড়ছেন।

আমাদের হাতে দলিল আছে মরহুম আলবানি যেসব হাদিস 'জঈফ' বলেছেন তার অধিকাংশই আসলে দুর্বল নয়! অপরদিকে কিছু হাদিস তিনি 'সহীহ' বলেছেন যা মূলত দুর্বল হিসাবেই সকলে জানেন। তিনি এক দু'টো ক্ষেত্রে এরূপ ভুল করেন নি। প্রায় ১২০০ হাদিসে আলবানি ভুল-ভ্রান্তি করেছেন বলে সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে! এ থেকেই প্রমাণ হয়, তিনি কোন্ পর্যায়ের হাদিস গবেষক ছিলেন।

শাফিঈ মাজহাবের মুহাদ্দিস শায়খ সাক্কাফ আলবানির হাদিস গবেষণার ভ্রান্তির উপর একখানা গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি মরক্কোর বিখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত শায়খ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ গিমারী [১৯১০-১৯৯৩ ঈ] রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ছাত্র ও শাগরিদ। মুহাম্মদ গিমারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একটি ফাতওয়ায় 'আলবানি আমাদের যুগের প্রধান বিদআতী' হিসাবে ঘোষণা দিয়েছেন। বিশিষ্ট গবেষক ও মুহাদ্দিস শায়খ সাক্কাফ তাঁর তিন খণ্ডে সমাপ্ত 'তানাক্বাদাতুল আলবানি ওয়াদিহাত' কিতাবে ১২ শতাধিক হাদিস সম্পর্কে তথ্য তুলে ধরেছেন যার উপর আলবানি মারাত্মক ভুল-ভ্রান্তি করেছেন। কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় এসব ভ্রান্তির পূর্ণাঙ্গ তথ্য এখানে তুলে ধরতে পারছি না। তবে আমরা কয়েকটি মাত্র উদ্ধৃতি প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করতে চাই।

নিম্নের তালিকায় প্রথমে আমরা প্রতিটি হাদিসের মূল অনুলিপি কিতাব থেকে উদ্ধৃত করেছি। এরপর আলবানি সাহেবের মন্তব্য উদ্ধৃত করে শায়খ সাক্কাফের মন্তব্যও উদ্ধৃত করেছি।

হাদিস গবেষণায় আলবানি সাহেবের মারাত্মক ভ্রান্তির প্রমাণ

১. হাদিস:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللّٰهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطٰى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

-"হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 'আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, রোজ কিয়ামতে তিন ব্যক্তি আমার প্রতিপক্ষ হবে: যে আমার নামে কসম খেয়ে তা রক্ষা করে না; যে মুক্ত ব্যক্তিকে বিক্রি করে অর্জিত টাকা দ্বারা আহার করে; এবং যে কোন কাজের লোক দ্বারা কাজ করানোর পর তার বিনিময় প্রদান করে না'।" [বুখারী, ২১১৪ (আরবী সংস্করণ), আহমদ]

আলবানির মন্তব্য: এই হাদিস সম্পর্কে আলবানি তার 'জঈফুল জামি ওয়া জিয়াদাতু' [৪/১১১, সং- ৪০৫৪] গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন: "এই হাদিস জঈফ'। কিন্তু তিনি কি জানেন না হাদিসখানা ইমাম বুখারী ও আহমদ হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন! [তানাক্বাদাতুল আলবানি ওয়াদিহাত, খ. ১, পৃ. ১০, নং ১]

২. হাদিস:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ تَذْبَحُوا إِلاَّ مُسِنَّةً إِلاَّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ"

-"শুধুমাত্র পরিণত বয়স্ক পশু কুবরানী দাও যদি না তা তোমাদের জন্য কঠিন হয়। সে ক্ষেত্রে একটি ভেড়া কুবরানী দাও।" [মুসলিম ১৯৬৩ (আরবী সংস্করণ)]

আলবানির মন্তব্য: আলবানি তার পূর্বে উল্লেখিত কিতাবে [৬/৬৪ সং ৬২২২] এই হাদিসটিও 'জঈফ' বলেছেন। অথচ হাদিসখানা মুসলিম, আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ এবং ইবনে মাজাহ হযরত জাবির রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন! [প্রাগুক্ত, পৃ. ১০, নং ২]

৩. হাদিস:

سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا

"কিয়ামতের দিন সর্বাধিক বাজে লোকদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি হবে যে তার স্ত্রীর সাথে ও স্ত্রী তার সাথে সহবাস করে ও সে তার স্ত্রীর গোপনীয়তা প্রকাশ করে।" [মুসলিম, ১৪৩৭ (আরবী সংস্করণ)]

আলবানির মন্তব্য: আলবানি তার পূর্বে উল্লেখিত কিতাবে [২/৯৭ সং ২০০৫] এই হাদিসটিও 'জঈফ' বলে দাবী করেছেন। অথচ হাদিসখানা ইমাম মুসলিম হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে রিওয়ায়েত করেছেন! [প্রাগুক্ত, পৃ. ১০, নং ৩]

৪. হাদিস:

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَتِحْ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

-"যদি কেউ রাতে [তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতে] জেগে ওঠে, তাকে দু' রাকাআত পাতলা নামায দিয়ে শুরু করা উচিৎ।" [মুসলিম, নং ৭৬৮]

আলবানির মন্তব্য: আলবানি তার পূর্বে উল্লেখিত কিতাবে [১/২১৩ সং ৭১৮] হাদিসটি 'জঈফ' বলে দাবী করেছেন। অথচ এই হাদিসখানা ইমাম

মুসলিম ও ইমাম আহমদ হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন! [প্রাগুক্ত, পৃ. ১০, নং ৪]

৫. হাদিস:

قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ " .

-"অযু পালনের কারণে আমার উম্মত কিয়ামতের দিন উজ্জ্বল মুখমণ্ডল, হাত ও পাসহ পুনরুত্থিত হবে। সুতরায় যে কেউ চায় সে যেনো বেশী বেশী অযু করে।" [মুসলিম, নং ২৪৬]

আলবানির মন্তব্য: আলবানি তার পূর্বে উল্লেখিত কিতাবে [২১/১৪ সং ১৪২৫] হাদিসটি 'জঈফ' বলে দাবী করেছেন। অথচ এই হাদিসখানা ইমাম মুসলিম হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন! [প্রাগুক্ত, পৃ. ১১, নং ৫]

৬. হাদিস:

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ الدَّجَّالِ

-"কেউ যদি সূরা কাহাফের শেষ দশটি আয়াত মুখস্ত করে তাহলে সে দাজ্জাল থেকে বেঁচে থাকবে।" [মুসলিম, নং ৮০৯]

আলবানির মন্তব্য: আলবানি তার পূর্বে উল্লেখিত কিতাবে [৫/২৩৩ সং ৫৭৭২] হাদিসটি 'জঈফ' বলে ঘোষণা দিয়েছেন। আলবানি বলেছেন 'পাঠ করলে', কিন্তু বাস্তবে হাদিসে বলা হয়েছে, মুখস্ত করলে। হাদিসখানা সহীহ। কারণ ইমাম মুসলিম, ইমাম আহমদ এবং ইমাম নাসাঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম এটি হযরত আবু দারদা রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন! হাদিসটি ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিও তাঁর 'রিয়াদ্বুস সালিহীন" কিতাবে উদ্ধৃত করেছেন। [প্রাগুক্ত, পৃ. ১১, নং ৭]

৭. হাদিস:

كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَائِطِنَا فَرَسٌ يُقَالُ لَهُ اللُّحَيْفُ

-“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ‘আল-লুহাইফ’ নামক একটি অশ্ব ছিলো।” [বুখারী, ফাতহুল বারী, ৬/৫৮ নং ২৮৫৫]

আলবানির মন্তব্য: আলবানি তার পূর্বে উল্লেখিত কিতাবে [৪/২০৮ সং ৪৪৮৯] হাদিসটি ‘জঈফ’ বলে দাবী করেছেন। অথচ হাদিসখানা সহীহ। কারণ ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এটি হযরত সাহল ইবনে সাদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন! [প্রাগুক্ত, পৃ. ১১, নং ৮]

উপরে আলবানি সাহেবের হাদিসের জ্ঞানের ব্যাপ্তি কিরূপ ছিলো তার ক’টি মাত্র প্রমাণ উদ্ধৃত করলাম। লক্ষ্য করুণ সবক’টি হাদিস সহীহাইন ও অন্যান্য সিহা সিত্তার কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং আলবানির মতো দুর্বল হাদিস-বিশারদ এসে এ যুগে এগুলো ‘জঈফ’ বলার সাহস পেলেন কোত্থেকে? আমরা এই প্রশ্নের জবাব চাই। মুহাদ্দিস সাক্কাফী আলবানি সম্পর্কে কী বলেছেন, একটু লক্ষ্য করুন।

তিনি বলেন: “অত্যন্ত অদ্ভুত ও দুঃখজনক ব্যাপার হলো শায়খ আলবানি অনেক বিখ্যাত হাদিস বিশারদের মন্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং তাঁদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছেন হাদিসের উপর তার জ্ঞানের অভাবে। এটা তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে করেছেন। তিনি নিজেকে নির্ভুল সূত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তিনি সময় সময় এ ধরনের বাক্য ব্যবহার করেছেন: “লাম আক্বিফ আলা সানাদি” - আমি সনদের চেইন পাই নি! তিনি হাদিসের হাফিজদের সমালোচনা করে বলেছেন, তাঁরা পরিপূর্ণ মনোযোগী ছিলেন না! বাস্তবে এই মন্তব্য তার নিজের ক্ষেত্রেই বেশী মানায়! [প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২০]

আগেই বলেছি মুহাদ্দিস (!) জনাব আলবানি ১২ শতাধিক হাদিস নিয়ে আজেবাজে মন্তব্য করেছেন। এতে তার অনুসারীদের তিনি স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় গোমরাহীর দিকে ঠেলে দিয়েছেন। সৌভাগ্যের ব্যাপার যে, শায়খ সাক্কাফীর মতো সচেতন ও চক্ষুষ্মান জ্ঞানী ব্যক্তি এখনো পৃথিবীর জমিনে জীবিত আছেন। তাঁর গবেষণার ফলে অসংখ্য মানুষ আলবানির ভ্রান্তি

অনুধাবন করে ফিরে আসছেন তাক্বলিদের দিকে। উল্লেখিত তার গ্রন্থটি পুরো [আরবী ভাষাভাষী] মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে বহুল প্রচারিত হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। আমরা মনে করি আলবানি ও তার অন্ধ অনুসারী সালাফিদের ভ্রান্তির উপর আরো অনেক গবেষণার প্রয়োজন বাংলা ভাষায়। বিশ্বের এক বিরাট মুসলিম জনগোষ্ঠি বাংলায় কথা বলেন ও লেখাপড়া করেন। এদেরকে যুগের এই সর্বাধিক মারাত্মক ফিতনা থেকে রক্ষা করতে সম্ভাব্য সব ধরনের প্রচেষ্টা একান্ত জরুরী। সর্বোপরি এদের ফিতনা থেকে বেঁচে থাকতে আমরা আল্লাহর দরবারে আশ্রয় কামনা করি।

২৬. ***আলবানি সাহেব বলেছেন, যারা আল্লাহর গুণাবলী ‘আক্ষরিক’ অর্থে ব্যাখ্যা করে না, তারা ‘জিন্দীক’ না হলেও তাদের মতোই কথা বলে। তার মতে, ‘আলঙ্কারিক’ ব্যাখ্যা অস্বীকৃতির নামান্তর।***[২৬৯]

তার এই ভ্রান্ত মন্তব্যের উপর আমরা ইতোমধ্যে আলোচনা করেছি। কুরআন ও হাদিস শরীফের সঠিক ব্যাখ্যা বা তাফসীর ছাড়া কখনো শরয়ী সিদ্ধান্ত সম্ভব নয়। আক্ষরিক অর্থ সর্বক্ষেত্রে গ্রহণ করা যায় না। কুরআন ও হাদিসে অনেক বর্ণনা আছে যা আক্ষরিত অর্থে গ্রহণ করলে দ্বীনের অনেক মৌলিক বিষয়ও পরিবর্তিত হয়ে যাবে! সুতরাং সর্বক্ষেত্রে আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করা আদৌ অসম্ভব। এই সাধারণ কথাটি ‘আলাদা হওয়ার’ জন্য উদগ্রীব আলবানি ও তার অনুসারীরা মানতে রাজী নন। তারা একটি হাদিসও ‘মাজহাবের’ সিদ্ধান্তের পরিপন্থী পেলেই তার উপর আমল করা শুরু করেন! অথচ একবারও ভাবেন না, মাজহাবের ইমামগণ ও তাঁদের শাগরিদরাও উক্ত হাদিসটি সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তাঁরা বিষয়টির উপর অন্যান্য হাদিস ও বর্ণনা গবেষণা করে পুরোপুরিভাবে যাঁচাই-বাছাই শেষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

---

[২৬৯] তার প্রণীত ‘ফাতওয়া’ [পৃ: ৫২২-৫২৩] এবং মুখতাসারুল উলূয়া, পৃ: ২৩]

২৭. আলবানি মন্তব্য করেছেন, কুরআনের আয়াত [সূরা ২৮:৮৮] এর ব্যাখ্যা করতে যেয়ে ইমাম বুখারী রাহ. তাঁর কিতাব সহীহ বুখারীর 'তাফসির' অধ্যায়ে 'আল্লাহর মুখাবয়ব' 'মহাশক্তিধর' কিংবা 'মুলক' বলা 'অবিশ্বাসীদের মতো কথা বলার সমান'। আলবানি বলেন, "কোনো সত্যিকার ঈমানদার কেউ এরূপ কথা বলতে পারে না!" তিনি আরো বলেছেন, "এরূপ মন্তব্যের জন্য অবশ্য আল-বুখারীকে আমরা নির্দোষ ভাবা উচিৎ"।[২৭০]

এ ধরনের ধৃষ্টতাপূর্ণ মন্তব্য দ্বারা তিনি স্বয়ং ইমাম বুখারীর 'ঈমানের' উপর সন্দেহ করলেন। নাউযুবিল্লাহ। অথচ এই ইমাম বুখারীই হলেন, জগতখ্যাত সহীহ হাদিসগ্রন্থ 'বুখারী শরীফের' প্রণেতা। ইমাম বুখারীর ঈমানের উপর সন্দেহ করলে, তাঁর কিতাবের উপর মানুষের সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া কী অসম্ভব? সালাফিরা কেনো হাদিসের প্রতি বেশী মাত্রায় সন্দেহপোষণ করেন, তার জবাব তো এখানেই পাওয়া গেল।

২৮. অন্যান্য ওয়াহাবী ও সালাফি বিতআতীদের মতো আলবানি এবং উসাইমিন ঘোষণা দেন, আশআরীপন্থী, মাতুরিদীপন্থী এবং সুফিরা সবাই আহলে সুন্নাহের বাইরে অবস্থান করছেন। এমনকি কোনো কোনো মন্তব্যে তিনি এদেরকে [দুনিয়ার প্রায় সকল মুসলমানকে] অমুসলিম বলতেও দ্বিধা করেন নি।[২৭১]

অথচ আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম তাঁদের প্রশংসা করেছেন। যেমন কুরআনের আয়াত:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

[২৭০] ফাতওয়া, পৃ: ৫২৩।
[২৭১] উসাইমিন, শরহে আক্বীদাতিল ওয়াসিতিয়্যা; আলবানী, আল-আক্বীদাতুত তাহাবিয়্যা শরাহ ওয়াত তা'লিক।

-"হে ঈমানদারগ! তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, অচিরে আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়- নম্র হবে এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ- তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন, আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী।" [সূরা মায়িদাহ : ৫৪]

যখন উপরোক্ত আয়াত নাযিল হলো তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু মূসা আল-আশআরী রাহমাতুল্লহি আলাইহির প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, "তারাই হলো জনতার মানুষ।"[২৭২]

ইমাম কুশাইরী, ইবনে আসাকির, ইমাম বাইহাকী, ইবনে সুবকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম ও অন্যান্য উলামা বলেছেন, আবুল হাসান আশআরীর অনুসারীদের মধ্যে অধিকাংশ সুফি ছিলেন। তাঁদের মধ্যে 'আবু মূসা'র মতো মানুষ' বিদ্যমান।

মাতুরিদী আক্বীদা সম্পর্কে একটি সহীহ হাদিসে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। হযরত বিশ্‌র খাত্তামী রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি সহীহ হাদিসে আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "তোমরা কনস্টান্টিনোপল [তুর্কির শহর ইস্তাম্বুল] অবশ্যই জয় করবে। কী অপূর্ব এক নেতার নেতৃত্বে এ কাজটি হবে [তিনি ছিলেন মুহাম্মদ ফাতেহ সুলতান]। আর কী অপূর্ব সেনাবাহিনী হবে সেই বিজয়ীরা।" এই হাদিসখানা হাকিম, জাহাবী, সুয়ূতী ও হাইছামী প্রমুখ মহাত্মন সহীহ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। মুহাম্মদ ফতেহ সুলতান ও তাঁর সেনাবাহিনীর সকল সদস্য হানাফী মাতুরিদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এছাড়া মুহাম্মদ ফাতেহ সুফিদের শুধু ভালোবাসতেন না, তিনি একজন শায়খের মুরীদ ছিলেন।

এখানে উল্লেখ করা জরুরী যে, আশ'আরী, মাতুরিদী ও সুফিদের প্রতি ঘৃণা ও অবিশ্বাস পোষণ নিফাকের অন্তর্ভুক্ত আমল। এর দ্বারা মুসলিম উম্মাহ্‌র বিরোধিতা করা হয়। এ ব্যাপারে উলামার মধ্যে মতৈক্য বিদ্যমান।

[২৭২] হযরত ইয়াদ রাদ্বিল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, ইবনে আবি শাইবা ও হিকাম এটি সহীহ বলেছেন। তাবারানী সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপ হাইসামীও বর্ণনা করেছেন।

২৯. আলাবানী সাহেব তার প্রণীত 'সিফাতু সালাতিন্নাবী' গ্রন্থে শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পাঠ সম্পর্কে বলেছেন, "হে নবী আপনার উপর রাহমাত ও বরকত নাযিল হোক - এরূপ না বলে, 'নবীর উপর রহমত ও বরকত নাযিল হোক' বলা উচিৎ!"

তার এই সিদ্ধান্ত চার মাজহাবের মতৈক্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। হযরত ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত সহীহ হাদিস হলো চার মাজহাবের ইমামদের মতৈক্যের কারণ। ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন: "ঠিক যেভাবে আমি নামায আদায় করি, তোমরা সেভাবে আদায় করবে এবং [তাশাহহুদে] বলবে 'আস্‌সালামু আলাইকা আইয়্যুহান্ নাবীউ ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ...'।" তাঁর মৃত্যুর পরও এই বাক্যটি পরিবর্তনে নিষেধ করেছেন। নজীবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পরে সকল সাহাবায়ে কিরাম, যাদের অনুসরণ আমরা করি, এভাবেই তাশাহহুদ পাঠ করেছেন। পরবর্তী যুগের তাবিঈন, তাবে-তাবিঈন, উলামা, ফুকাহা সকলেই একই আমল করেছেন। কোত্থেকে এসে আলিম নন এমন এক ব্যক্তি এরূপ বিরূপ মন্তব্য করে বসলেন, এভাবে পড়া ঠিক নয়! ওভাবে পড়ো? এরূপ ব্যক্তিকে কোন্ খেতাবে ভূষিত করা উচিৎ তা পাঠকরাই বিবেচনা করুন।

আমরা মনে করি আলবানির উক্ত 'উপদেশ' মূলত নিজেকে 'মুজতাহিদ' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার আরো একটি প্রচেষ্টা মাত্র। কিন্তু তিনি সফল হন নি, হতে পারেন না। কারণ, এ যুগে তো নয়ই- আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের যুগের পরে কোনো যুগেই কেউ জন্ম নিয়েছেন বলে ইতিহাসে প্রমাণ নেই, যিনি চার মাজহাবের ইমামদের তুলনীয় ফকীহ-মুজতাহিদ ছিলেন। আর এ কারণেই যুগ যুগ ধরে উচ্চ পর্যায়ের আলিম, উলামা, ফকীহ ও ইমামগণ পর্যন্ত সকলেই কোনো না কোনো মাজহাবের অনুসরণ করে গিয়েছেন।

৩০. তাহাজ্জুদের নামাযের ক্ষেত্রেও আলবানি সাহেব ভিন্ন ফাতওয়া দিয়েছেন। তার মতে [শেষ রাতে নফল বা তাহাজ্জুদ নামাযের ক্ষেত্রে] ১১ রাকাআতের অধিক পড়া নাকি বিদআত! তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিন্দেগীতেও একশ' রাকাআত নামায এক রাতে পড়েন নি।[২৭৩]

অথচ উলামায়ে কিরাম নফল নামাযের ক্ষেত্রে কোন সীমা নেই বলে মতৈক্য প্রকাশ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তিনটি সহীহ হাদিস আছে যেখানে তিনি ইরশাদ করেন:

"জেনে রাখো, তোমাদের সর্বোত্তম আমল হলো [ঐচ্ছিক] নামায।"[২৭৪] অন্যত্র বলেন: "নামায হলো নূর"।[২৭৫] অপর এক হাদিসে আছে, তিনি বলেছেন: "রাতের নামায দু' দু' রাকাআতবিশিষ্ট।"[২৭৬]

মাওলানা আবদুল হাই লৌক্ষনৌবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এ ব্যাপারে অনেক সহীহ বর্ণনা সংকলন করেছেন। তাঁর প্রণীত 'ইক্বামাতুল হুজ্জা 'আলা আন্নাল ইখতার মিনাত-তা'আব্বুদি লাইসা বি বিদ'আ' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে উল্লেখ করেছেন, সাহাবায়ে কিরাম ও সালফে সালিহীন মহাত্মনদের মধ্যে অনেকেই একদিনে শত শত কিংবা হাজার রাকাআত পর্যন্ত নফল নামায আদায় করেছেন। সুতরাং আলবানির ফাতওয়া যে মূলত নফ্‌সকে খুশী করার লক্ষ্যে এবং চিরদুশমন শয়তানের ওয়াসওয়াসা-প্রসূত, তা আর বুঝিয়ে বলার উপেক্ষা রাখে না। নিজে নফল আমলে অলস হওয়ার কারণে অপরকেও এ থেকে বিরত থাকার উপদেশ বা নির্দেশ প্রদান কি কখনো যুক্তিসম্মত হলো?

---

[২৭৩] ফাতওয়া, পৃ: ৩১৫-৩১৬।

[২৭৪] একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশ, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমদ ও মুয়াত্তা ইমাম মালিকে হাদিসটির বর্ণনা আছে।

[২৭৫] একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশ, মুসলিম, তিরমিযি, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, আহমদ এবং দারামীতে হাদিসটি সহীহ সনদে বর্ণিত আছে।

[২৭৬] ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর রিওয়ায়েত, নয়টি সহীহ কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।

৩১. আলাবানী খুব বে-আদবী ও ধৃষ্টতাপূর্ণ বক্তব্য দিয়েছেন অতীত ও সমকালীন উলামার বিরুদ্ধে। ফলে তার লেখাগুলো পাঠের সময় তার প্রতি ঘৃণা জন্ম নেওয়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া কঠিন ব্যাপার। যেমন, তিনি ইমাম বুখারীর 'আদাবুল মুফরাদ' গ্রন্থ প্রণয়ন 'পাপের কাজ', 'অস্বস্তিকরভাবে মূর্খতা', এমনকি 'মিথ্যাবাদিতা' এবং 'ডাকাতি' বলে মন্তব্য করেছেন। এক ক্ষেত্রে তিনি বলেছেন: "[তার ব্যক্তিগত মতে] এতে অসংখ্য দুর্বল হাদিস আছে যে, এটা একটি 'ইসলামবিরোধী' আমল"। অপর এক মন্তব্যে বলেন: "এটা মূর্খতা! এটা কখনো বরদাশত করা যাবে না।" আরেক মন্তব্য দেখুন: "এটা জাল ও প্রকাশ্য মিথ্যা!"[২৭৭]

আলবানির উক্তরূপ মন্তব্যের উপর একখানা কিতাব রচনা করেছেন শায়খ হাসান আলী সাক্কাফ। তিনি এর শিরোনাম করেছেন: "ক্বামুস শাতা'ইমুল আলবানি ওয়ালফাজিহিল মুনকারাল্লাতি ইয়াতলুগুহা 'আলা উলামাল উম্মাহ্ [উম্মাহ্‌র উলামাদের বিরুদ্ধে আলবানির গালিগালাজ ও ধৃষ্টতাপূর্ণ শব্দ ব্যবাহারের অভিধান]"।

আমরা এ গ্রন্থে ব্যক্তিগত মতামত যতদূর সম্ভব এড়িয়ে গিয়েছি। এরপরও এখানে দু'একটি কথা বলা সমূচিত হবে বলে মনে করি। আলবানি সাহেবের উপরোদ্ধৃত মন্তব্যগুলো সার্বিকভাবে মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য ক্ষতিকর হয়েছে এবং ভবিষ্যতে হবে। এর কারণ হলো, আমাদের অতীতের ও সমকালীন বিখ্যাত আলিম, উলামা, মুহাদ্দিস ও ইমামদের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য ইসলামের সত্যিকার দুশমনদের মনে আনন্দ যোগাবে। এটা কি কখনো কারো কাম্য হতে পারে? যারা আরবী ভাষা জানেন তাদের প্রতি আমাদের অনুরোধ, আলবানি সাহেবের অযৌক্তিক, ক্ষতিকর, বে-আদবিপূর্ণ ও অসত্য উক্তিগুলো সম্পর্কে জানার জন্য শায়খ সাক্কাফের উপরে বর্ণিত 'ক্বামুস' গ্রন্থটি পাঠ করুন। এ থেকে অবশ্যই আপনারা সালাফি ইমাম আলবানি সাহেব সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেয়ে যাবেন।

---

[২৭৭] তার প্রণীত আদাবুল মুফরাদের ভূমিকায়, পৃ: ১৫, ২০ ও ২৬।

৩২. আলাবানী ইবনে হাজমের মাজহাব বিরোধী দাবীকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন। তিনি বলেন, উম্মাহ্‌র মধ্যে [মাজহাবী] মতানৈক্য কখনো রহমত হতে পারে না। তিনি কুরআন শরীফের এই আয়াত দলিল হিসাবে পেশ করেছেন:

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

-"এরা কি লক্ষ্য করে না কুরআনের প্রতি? পক্ষান্তরে এটা যদি আল্লাহ ব্যতীত অপর কারও পক্ষ থেকে হত, তবে এতে অবশ্যই বহু বৈপরীত্য দেখতে পেতে।" [সূরা নিসা : ৮২]

অথচ ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অনেক আগেই ইবনে হাজমের ব্যাখ্যা রদ করে দিয়েছেন। তিনি মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যগ্রন্থে বলেছেন: "যদি কোনো কিছু রহমত হয়ে থাকে তাহলে এর বিপরীতের বিপরীত কিছু রহমত হবে তা কিন্তু নয়। কেউ এরূপ ব্যাখ্য করেন নি, শুধুমাত্র মূর্খ ব্যক্তি ছাড়া।" অনুরূপ মনাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 'ফায়জুল কাদীর' গ্রন্থে বলেন: "এটা একটি 'কল্পনা' যা উত্থিত হয় ওদের থেকে যাদের হৃদয় রোগাক্রান্ত"।

আমরা ইতোমধ্যে মাজহাব ও তাক্বলিদের আলোচনা দ্বারা তার এই ভ্রান্তির খণ্ডন করেছি।

৩৩. হযরত মুয়াজ বিন জাবাল রাদ্বিআল্লাহু আনহুর ইজতিহাদী সিদ্ধান্তের ব্যাপারে ফকীহ উলামার মন্তব্য, সাহাবায়ে কিরামের যুগে তাক্বলিদ ও ইজতিহাদ হয়েছে, একথা তিনি অস্বীকার করেছেন। তিনি ইসলামী জ্ঞানার্জনের সূত্র যে ফিক্‌হ শাস্ত্র তা মানেন নি। তিনি বলেন, একমাত্র হাদিস থেকেই জ্ঞানার্জন করতে হবে।[২৭৮] ***যদিও সালফে সালিহীনদের অন্তর্ভুক্ত উলামা থেকে আজকের সকল হক্কানী উলামাদের উসূল হলো,***

---

[২৭৮] আল-কাসিমী রাহ. এর 'আল-মাশ 'আলাল জাওরাবাইন' গ্রন্থের উপর আলবানীর মন্তব্য বইয়ে (পৃ: ৩৮)।

'ফিক্‌হ ছাড়া হাদিস বিশারদ ব্যক্তি পথভ্রান্ত বিদআতী!' অবশ্য আলবানি শুধুমাত্র তার মতো পথভ্রষ্ট ব্যক্তিদেরকে 'আলিম মনে করেন', যেমন আধুনিক যুগের সালাফি [বাস্তবে খালাফি] মিসরের মরহুম গাজালী"।[২৭৯]

আমরা ইমাম কুরতুবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উদ্ধৃতি এখানে তুলে ধরতে পারি: "একজন আ'রিফ বলেছেন, একদল লোক যারা আমাদের সময় আসে নি, কিন্তু শেষ যুগে আসবে। তারা ফকীহ ও মুফতিদের গালিগালাজ করবে।"[২৮০]

আলবানির উপরোদ্ধৃত ভ্রান্তি ও দাবীর খণ্ডন আমরা ইতোমধ্যে মাজহাব ও তাক্বলিদের উপর আলোচনায় করেছি।

৩৪. তাদের মন্তব্য: হানাফিরা যে পদ্ধতিতে বিত্‌র নামায আদায় করেন তা সঠিক নয়। মুকাল্লিদ হওয়ার কারণে কেউ তাদের পদ্ধতির ভিন্ন উপায়ে এই নামাযটি আদায় করতে দেখলে তারা খুব কটূক্তি করে থাকেন। এমনকি এটাকে বিদআত বলে আখ্যায়িত করতেও তারা দ্বিধা করেন না।[২৮১]

তাদের এই ভ্রান্তির খণ্ডন: প্রথমত এটা উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় যে, বিভিন্ন মাজহাবে বিত্‌র নামায আদায়ের পদ্ধতিতে পার্থক্য বিদ্যমান। কিন্তু সালাফিরা গায়র মুকাল্লিদ হওয়ায় কোনো এক বা একাধিক মাজহাব মুতাবিক এই আমল (এবং আরও বিভিন্ন আমল) করেন না। তারা বলেন, আমরা কুরআন হাদিসের অনুসরণ করছি। কারো তাক্বলিদ করছি না। তারা এটাও বলেন, আমাদের পদ্ধতিই 'একমাত্র' সঠিক পদ্ধতি। বাকীগুলো বিদআত, শির্‌ক ইত্যাদি। আমাদের আপত্তি এখানেই। বিত্‌র নামায আদায়ের বিভিন্ন পদ্ধতি সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। মুকাল্লিদরা যে বা যেসব পদ্ধতি অনুসরণ করেন- তা-ই হলো সর্বোত্তম পদ্ধতি। কারণ মুজতাহিদ ইমামরা এ সম্পর্কিত সকল হাদিসই গভীরভাবে অধ্যয়ন শেষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। তারা তো আর নতুন কিছু আবিষ্কার করেন নি! তারা যেরূপ কুরআন-হাদিস বুঝেছেন ও ব্যাখ্যা

[২৭৯] তাহরিম আলাতাল তারাব (পৃ: ১৬০)।
[২৮০] আল-কুরতুবী, তাফসীর (খ.৭, পৃ: ১৯১)।
[২৮১] বিত্‌র সম্পর্কিত সালাফিদের হানাফি বিরোধী অবস্থান ও মতামত সকলেরই জানা।

করেছেন সেরূপ করার ক্ষমতা সে যুগেই অনেক বড় বড় আলিমের ছিলো না- আর এ যুগে তা থাকার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। অথচ এ যুগের কিছু তথাকথিত স্ব-ঘোষিত 'হাদিস বিশারদরা' মুজতাহিদ মতলক ইমামদের সিদ্ধান্তকে ভুল বলার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছেন! যাক, বিত্‌র নামায সম্পর্কে প্রথমে আমরা চার মাজহাবের সিদ্ধান্ত একে একে তুলে ধরছি। এরপর হানাফি মাজহাবের নিয়মটির উপর দালিলিক প্রমাণ পেশ করবো ইনশাআল্লাহ।

আমাদের আশা, পাঠকরা সালাফিদের কর্তৃক প্রচারিত আরও একটি আমলী ফিতনা থেকে এ অংশ পাঠ করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করবেন। মাজহাবের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে যেভাবে বিত্‌র নামায আদায় করছেন সেভাবেই বাকী জীবন করে যাবেন। কারণ সবগুলোর মতো মাজহাবী সিদ্ধান্তভিত্তিক এই আমলটি সঠিক হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

(১) শাফিঈ মাজহাব অনুযায়ী সালাতুল বিত্‌র: শাফিঈ মাজহাবে বিত্‌র নামায সুন্নাত (ওয়াজিব নয়)। শাফিঈ মতে তিনটি ভিন্ন পদ্ধতিতে এই নামায আদায় করা যায়:

(ক) দু' রাকাআত নামায পড়ে সালাম ফিরিয়ে পুনরায় দাঁড়িয়ে আরো এক রাকাআত পড়তে হয়। এতে দু'বার বসা ও দু'বার সালাম ফেরানো হয়।

(খ) দ্বিতীয় এ পদ্ধতিতে প্রথমে দু'রাকাআত পড়ে বসে সালাম না ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আরও এক রাকাআত পড়তে হয়। এ উপায়ে পড়লে দু'বার বসা হয় এবং একবার সালাম ফিরানো হয়।

(গ) তৃতীয় এ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হলো দু'রাকাআত শেষে বসাই যাবে না। সোজা দাঁড়িয়ে তৃতীয় রাকাআত পড়ে রুকু-সিজদা শেষে বসে যথারীতি সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করতে হবে।

দু'আয়ে কুনুতের ব্যাপারে শাফিঈ সিদ্ধান্ত হলো: শুধুমাত্র রমজানের দ্বিতীয়ার্ধে (শেষের পনেরো দিনগত রাতে) দু'আয়ে কুনুত পড়া বৈধ। রুকুর পরে দাঁড়িয়ে হাত উত্তোলন করে (কিন্তু কিবলামুখী অবস্থায় থেকে) এ দু'আ পড়তে হবে। দু'আ শেষে হাত দ্বারা মুখমণ্ডল মুছা বৈধ নয়। [ইন্টারনেট]

(২) মালিকী মাজহাবে সালাতুল বিত্‌র: মালিকী মাজহাবেও বিত্‌র নামায সুন্নাত। মালিকী মতে বিত্‌র নামাযে দু'আয়ে কুনুত নেই। নামায ক'রাকাআত ও কিভাবে পড়তে হবে সে ব্যাপারে ভিন্নমত আছে। শক্তিশালী মতামত হলো এক রাকাআত। প্রথমে দু'রাকাআত 'সালাতুশ শাফা'' [এই নামাজটি মূলত বিত্‌র নামাজেরই অন্তর্ভুক্ত। একে শাফা' নামাজ কেনো বলা হয় তার সঠিক ব্যাখ্যা মিলে নি।] পড়ে সালাম ফিরিয়ে সাথে সাথে দাঁড়িয়ে এক রাকাআত বিত্‌র পড়তে হয়। বিতর নামাযে (একই রাকাআতে) সূরা ইখলাস, ফালাক্ব ও নাস পড়া মুস্তাহাব। [ইন্টারনেট]

(৩) হাম্বলী মাজহাব: এ মাজহাবে বিত্‌র নামায সুন্নাত। নামাযের নিয়ম অনেকটা শাফিঈদের অনুরূপ।

(৪) হানাফি মাজহাব: হানফি মতে বিত্‌র নামায ওয়াজিব। এটা মাগরিবের নামাযের মতোই পড়তে হয়- তবে এতে তিনটি পার্থক্য আছে: (ক) শেষের রাকাআতে সূরা ফাতিহা শেষে কুরআন শরীফ থেকে কিরাআত (তিনটি ছোট্ট কিংবা একটি বড় আয়াত) পাঠ করতে হয়। (খ) কিরাআত শেষে হাত উত্তোলন করে তাকবীর দেওয়া। (গ) এরপর দু'আয়ে কুনুত পড়ে রুকু-সিজদা শেষে বসে যথারীতি সালাম ফিরানো। দু'আয়ে কুনুত পড়া ওয়াজিব। যে কোন আরবী দু'আ পাঠ করলেই এই ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। তবে দু'আয়ে কুনুত হিসাবে যে বিশেষ দু'আটি (আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্তাঈনুকা ...) পড়া হয় তা পাঠ করাই উত্তম।

এবার আমরা হানাফি মতের দালিলাদি পেশ করছি। আশা করি পাঠকরা এ থেকে নিশ্চিত হবেন যে, মাজহাবের সিদ্ধান্ত (সে যে মাজহাবই হোক) সঠিক ও যথার্থ। মাহজাব কেউ সৃষ্টি করে নি। মাজহাব মূলত কুরআন-হাদিসের উপর গভীর গবেষণার ফলাফল যা একমাত্র মুজতাহিদ ইমামদের দ্বারা সম্ভব। আমরা সাধারণ মানুষ তো বটেই, যুগে যুগে ইমাম পর্যায়ের বড়ো বড়ো আলিমরাও মাজহাবের অনুসরণ করেছেন একথা জেনে যে, মুজতাহিদ মতলক ইমামদের সিদ্ধান্তে কোন ভুল-ভ্রান্তি নেই। মাজহাব অনুসরণই হলো দ্বীন পালনে সর্বাধিক নিরাপদ ও উত্তম রাস্তা যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির কারণ হবে।

বিত্‌র নামায সম্পর্কে দালিলাদি: বিত্‌র নামাযের গুরুত্ব

আমরা পুনরায় এ কথাটি ব্যক্ত করছি যে, প্রত্যেক মাজহাবের যে কোন শরঈ সিদ্ধান্তই সঠিক। যে, যে মাজহাব অনুসরণ করেন তার জন্য তা বিনাবাক্যে মানা ও সে মুতাবিক আমল করাও ওয়াজিব। অন্য মাহজাবে আমলটি ভিন্ন হলেও তার নিজের মাজহাব মুতাবিক আমল করতে হবে। অপরদিকে লা-মাজহাবীরা বিত্‌র সম্পর্কে যা বলেন ও আমল করেন তা কোন বিশেষ মাজহাবের সিদ্ধান্তের অনুকূলে কিংবা অনুরূপ হলেও মাজহাব না মানার কারণে, এটা একটি বিদআত হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন আহলে সুন্নাত ও জামাআতের আলিমরা। এটুকু বলার পর আমরা এখন হানাফি মাজহাবে বিত্‌র নামাযের গুরুত্বের উপর আলোচনার প্রয়াস পাচ্ছি।

দলিল - ১ : বিত্‌র ওয়াজিব

হাদিস শরীফে আছে:

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ الْوِتْرُ حَقٌّ وَاجِبٌ فَمَنْ شَاءَ أَنْ يُوتِرَ بِثَلاَثٍ فَلْيُوتِرْ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ

-হযরত আবু আইউব [আনসারী] রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "বিত্‌র একটি সঠিক হক্ যা তোমাদের উপর ওয়াজিব। তোমরা যদি এটা তিন রাকাআতে পড়তে চাও তাহলে পড়ো। যদি তোমরা এটা এক রাকাআতে পড়তে চাও তাহলে পড়ো।" [সূনানে দারে কুতনী, হা. নং. ১৬৫৯]

হাদিস সম্পর্কে মতামত: ইমাম দারাকুতনী যদিও 'ওয়াজিব' শব্দব্যবহার 'মাহফুজ' নয় বলে উল্লেখ করেছেন, তথাপি হাদিসখানা যে সহীহ এ ব্যাপারে দ্বিমত নেই। এছাড়া 'হক্ব' শব্দব্যবহার থেকে 'ওয়াজিব' সাবিত হয়। হাদিসের

সনদের উপর মন্তব্য করতে যেয়ে আল্লামা শামসুল হক আজিমাবাদী বলেন: এই হাদিসের সকল বর্ণনাকারী 'ছিকাহ' [নির্ভরযোগ্য]। হাফিজ ইবনে হাজর আসক্বালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, এই হাদিসটি হাযারাত আবু দাউদ ও ইমাম নাসাঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম স্ব-স্ব সংকলনে ও দারাকুতনী রাহিমাহুল্লাহ 'ইলাল' কিতাবেও বর্ণনা করেছেন। ইমাম বাইহাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও অন্যান্য মুহাদ্দিসীনে কিরাম বলেছেন, এই হাদিসখানা 'মাওকুফ'। আর এটাই সঠিক কথা। (আত-তালীক্ব মুগ্বনি আলা দারাকুতনি, খ. ২, পৃ. ২৩)

দলিল - ২: বিত্‌র ওয়াজিব

হাদিস শরীফে আছে:

عن عَبْدِ اللهِ بنِ بُرَيْدَةَ عن أَبِيهِ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلّم يَقُولُ: الْوِتْرُ حَقٌّ فَمنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنّا الْوِتْرُ حَقٌّ فَمنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنّا الْوِتْرُ حَقٌّ فَمنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنّا

-হযরত আবদুল্লাহ বিন বুরাইদাহ তাঁর পিতা [হযরত বুরাইদাহ ইবনে হাসিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,"বিত্‌র হলো হক্ব [আমল] সুতরাং যারা এই আমল করে না তারা আমাদের দলের নয়; বিত্‌র হলো হক্ব [আমল] সুতরাং যারা এই আমল করে না তারা আমাদের দলের নয়; বিত্‌র হলো হক্ব [আমল] সুতরাং যারা এই আমল করে না তারা আমাদের দলের নয়।" [সুনানে আবু দাউদ, হা. নং. ১২০৯]

লক্ষ করুন, গুরুত্ব বুঝাতে যেয়ে একই কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এই হাদিস সম্পর্কে ইমাম আবু দাউদ রাহিমাহুল্লাহর 'সুকূত' [নীরবতা] থেকেই এটি সহীহ বলে প্রমাণিত হয়। কারণ তিনি এক পর্যায়ে লিখেছেন: আমার গ্রন্থে যেসব হাদিসে দুর্বলতা আছে তা আমি উল্লেখ করেছি এবং যেগুলো সম্পর্কে মন্তব্য করি নি, ওগুলো

'সালেহ' [শুদ্ধ]। এছাড়া কিছু হাদিস আছে যা অন্যগুলো থেকে বেশি সঠিক। [সুনানে আবু দাউদ] কোনো কোনো মুহাদ্দিসীনে কিরাম হাদিসের একজন বর্ণনাকারী 'উবাইদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ আল-আতকি'-কে দুর্বল বললেও অধিকাংশ তাকে গ্রহণ করেছেন। [দেখুন ইবনে হাজর আসক্বালানী রাহিমাহুল্লাহর 'তাহযিবুত তাহযিব' কিতাবখানা]

দলিল - ৩: বিত্‌র ওয়াজিব

হাদিস শরীফে আছে:

عن خَارِجَةَ بنِ حُذَافَةَ قال أَبُو الْوَلِيدِ الْعَدَوِىّ قال : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلّم فَقَالَ: إِنّ اللهَ تَعَالَىَ قَدْ أَمَدّكُمْ بِصَلاَةٍ وَهِى خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النّعَمِ وَهِى الْوِتْرُ فَجَعَلَهَا لَكُم فيما بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى طُلوعِ الْفَجْرِ

-হযরত খারিজাহ ইবনে হুজাফা আল আদাওয়ী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট এসে বললেন: "আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে অতিরিক্ত একটি নামায পড়ার ঘোষণা দিয়েছেন যা লাল উট থেকেও উত্তম [অর্থাৎ উন্নতমানের উট থেকেও ভালো]। এটা হলো বিত্‌র যা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য ইশার ও ফজরের মধ্যে আদায় করার জন্য নির্দিষ্ট করেছেন।" [সুনানে আবু দাউদ]

এই হাদিসটি বর্ণনা করেও ইমাম আবু দাউদ নীরব রয়েছেন। এতে বুঝা গেল এটিও সহীহ হাদিস।

দলিল - ৪: বিত্‌র ওয়াজিব

হাদিস শরীফে আছে:

عنْ أبِى سَعِيدٍ قال قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلّم مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّهِ إِذَا ذَكَرَهُ

-হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যদি কেউ ঘুমন্ত থাকে এবং বিত্‌র কাযা করে কিংবা তা ভুলে যায়, স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে তার উচিৎ এটা পড়ে নেওয়া।" [সুনানে আবু দাউদ, হা.নং. ১২১৯]

কাযা একমাত্র ফরয ও ওয়াজিবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সুতরাং এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, বিত্‌র নামাযের কাযা আদায় করতে হবে কারণ এটা ওয়াজিব নামাজ।

দলিল - ৫: বিত্‌র ওয়াজিব

হাদিস শরীফে আছে:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ زَادَكُمْ صَلَاةً فَحَافِظُوا عَلَيْهَا وَهِىَ الْوَتْرُ

-হযরত উমর ইবনে সাঈদ তাঁর পিতা [হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য একটি নামায বাড়িয়েছেন। তোমাদের উচিৎ এটার হিফাজত করা। এই নামাজ হলো বিত্‌র নামাজ।" [মুসনাদে আহমদ]

আল্লামা শুয়াইব আরা'নূত এই হাদিসটিকে 'হাসান লি গাইরী' হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন। [মুসনাদে আহমদ]

আমরা মনে করি, বিত্‌র নামায ওয়াজিব সাব্যস্ত হওয়ার প্রমাণ হিসাবে উপরোক্ত পাঁচটি সহীহ হাদিসের বর্ণনাই যথেষ্ট। তবে এ সম্পর্কে আরো অনেক সহীহ বর্ণনা আছে যা উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করছি না। কারণ, মুকাল্লিদরা জানেন মুজতাহিদ ইমামদের কর্তৃক সাব্যস্তকৃত সকল আমলই সঠিক ও বিশুদ্ধ। এগুলো কুরআন ও সহীহ-শুদ্ধ হাদিসের উপরই নির্ভরশীল। কেউ কিছু আবিষ্কার করেন নি।

হানাফি মাজহাব মতে বিত্‌র নামাজে আছে তিন রাকাআত। অন্যান্য মাজহাবের সঙ্গে এ ব্যাপারে মতানৈক্য থাকলেও হানাফি মতে তিন রাকাআত হওয়ার দলিলাদি [যার সংখ্যা অনেক] জানলে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না। আর এ কারণেই আমরা এখানে কিছু দলিল পেশ করছি। এ থেকে সকলেই আশ্বস্থ বোধ করবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

দলিল - ১: বিত্‌র নামাজ তিন রাকাআত

হাদিস শরীফে আছে:

عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِى رَمَضَانَ وَلَا فِى غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّى أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى ثَلَاثًا ...

-হযরত আবু সালামা বিন আবদুর রহমান রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, আমি হযরত আয়িশা রাদ্বিআল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করলাম, রমজান মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে নামায পড়তেন? তিনি

জবাব দিলেন, “তিনি ১১ রাকাআতের বেশী পড়তেন না, তা রমজান বা অন্য কোন মাস হোক। তিনি চার রাকাআত পড়তেন এবং এর সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করো না। এরপর আরো চার রাকাআত পড়তেন এবং এর সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করো না। অবশেষে তিনি তিন রাকাআত (বিত্‌র) নামায আদায় করতেন। ...” [সহীহ বুখারী]

একই হাদিস মুয়াত্তা ইমাম মালিকেও বর্ণিত হয়েছে। এই হাদিস দ্বারা এটাও সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, বিত্‌র নামায সমস্ত বছরই পড়তে হবে। শুধু রমজানে নয়।

দলিল - ২: বিত্‌র নামাজ তিন রাকাআত

হাদিস শরীফে আছে:

عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ رَقَدَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَيْقَظَ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ وَهُوَ يَقُولُ { إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ }
فَقَرَأَ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَأَطَالَ فِيهِمَا الْقِيَامَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ سِتَّ رَكَعَاتٍ كُلَّ ذَلِكَ يَسْتَاكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيَقْرَأُ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ ثُمَّ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ ...

-হযরর আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত: তিনি [এক রাত] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গৃহে কাটালেন। [তিনি দেখলেন] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুম থেকে জেগে ওঠলেন, মিসওয়াক করলেন এবং অযু সারলেন। এরপর: “নিশ্চয় আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধসম্পন্ন লোকদের জন্যে।” [৩:১৯০] (এ আয়াত থেকে) সূরার শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত

চার মাজহাবের আলো

করলেন। এরপর দাঁড়িয়ে দু'রাকাআত নামাজ পড়লেন। ক্বিয়াম, রুকু ও সিজদায় দীর্ঘক্ষণ কাটালেন। এরপর এতোটা গভীর ঘুমিয়ে পড়লেন যে, নাক ডাকার আওয়াজ শুনা যাচ্ছিল। তিনি অনুরূপভাবে (ঘুমিয়ে ও জেগে ওঠে) তিন বারে মোট ৬ রাকাআত নামাজ আদায় করলেন। প্রতিবারই মিসওয়াক ও অযু সেরে উক্ত আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করলেন। এরপর তিনি তিন রাকাআত বিত্‌র নামাজ পড়লেন। ...” [সহীহ মুসলিম]

এই হাদিস শরীফ সম্পর্কে আর কিছু বলার প্রয়োজন নেই। এ থেকে স্পষ্ট যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন রাকাআত বিত্‌র নামায পড়েছেন।

দলিল - ৩: বিত্‌র নামায তিন রাকাআত

হাদিস শরীফে আছে:

عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَأَلْنَا عَائِشَةَ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يُوتِرُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ

-হযরত আবদুল আজিজ বিন জারিহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি হযরত আয়িশা রাদ্বিআল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিত্‌র নামাজে কোন্ কোন্ সূরা তিলাওয়াত করতেন? তিনি জবাব দিলেন: “প্রথম রাকাআতে তিনি ‘সাব্বি হিসমা রাব্বিকাল আ'লা’ তিলাওয়াত করতেন। দ্বিতীয় রাকাআতে তিলাওয়াত করতেন, ‘কুল ইয়া আয়্যুহাল কা-ফিরুন’ এবং তৃতীয় রাকাআতে পাঠ করতেন ‘কুলহু আল্লাহু আহাদ’ কিংবা যে কোন মুয়াওয়িজাতাইন [সূরা ফালাক্ব অথবা নাস]।” [সুনানে তিরমিযি] ইমাম তিরমিযি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই হাদিসটি ‘হাসান’ হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন।

দলিল - ৪: বিত্‌র নামায তিন রাকাআত

হাদিস শরীফে আছে:

-হযরত ইব্রাহীম নাখয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেছেন, "আমি অতি সহজে তিন রাকাআত বিত্‌র নামাজ আদায় করা ছেড়ে দেবো না- এমনকি লাল চামড়াবৃত গৃহপালিত পশুর বিনিময়েও নয়।" [মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ]

দলিল - ৫: বিত্‌র নামায তিন রাকাআত

হাদিস শরীফে আছে:

ইমাম মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "ইয়াকুব ইবনে ইব্রাহীম আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, হুসাইব ইবনে ইব্রাহীম বলেছেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, বিত্‌র নামাজ কখনো এক রাকাআত পড়া যথেষ্ট নয়।" [মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ]

দলিল - ৬: বিত্‌র নামায তিন রাকাআত

হাদিস শরীফে আছে:

হযরত ইব্রাহীম নাখয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, হযরত আলক্বামা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণনা করেন: আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, "বিত্‌র সর্বনিম্ন তিন রাকাআত হতে পারে।" [মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ]

দলিল - ৭: বিত্‌র নামায তিন রাকাআত

উক্ত হাদিসগুলো মাজমা আয-জাওয়াঈদ কিতাবেও তাবারানির সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম হাইসামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এসব হাদিস 'হাসান' বলে ঘোষণা দিয়েছেন। [মাজমা আয-জাওয়াঈদ, খ. ২, পৃ. ২৪৯]

দলিল - ৮: বিত্‌র নামায তিন রাকাআত

একই কিতাবের অপর একটি বর্ণনায় আছে: হযরত হুসাইন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু যখন জানলেন, হযরত সা'দ রাদ্বিআল্লাহু আনহু এক রাকাআত বিত্‌র পড়েন তখন তিনি মন্তব্য করলেন: "আমি মনে করি না, বিত্‌র নামায এক রাকাআত পড়া যথেষ্ট হবে।" [মাজমা আয-জাওয়াঈদ, খ. ২, পৃ. ৫০৪]

হাদিসখানা তাবারানিও বর্ণনা করেছেন। বর্ণনার সনদ 'হাসান' বলে সাব্যস্ত হয়েছে। কেউ যদি প্রশ্ন তুলেন, উক্ত বর্ণনার কোনো কোনোটি সহীহ বা হাসান না-ও হতে পারে। এর জবাব হলো, মুহাদ্দিসীনে কিরাম একটি বর্ণনার ভিত্তিতেই হাদিসটি হাসান বা সহীহ কি না সাব্যস্ত করেন নি। বরং অনেক বর্ণনা একত্রে যাঁচাই-বাছাই করে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অধিকাংশ সহীহ বর্ণনায় যেহেতু এক রাকাআত বিত্‌র পড়ার বিপক্ষে সাহাবায়ে কিরাম মন্তব্য করেছেন তাই হানাফি ইমামরা তিন রাক্‌আত ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

বিত্‌র নামায মাগরিব নামাযের ফরযের অনুরূপ হওয়ার দলিলাদি

দলিল - ১: বিত্‌র মাগরিবের অনুরূপ

হাদিস শরীফে আছে:

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وِتْرُ صَلَاةِ النَّهَار

-[ইয়াহইয়া আমার নিকট] ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে দীনার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে এবং তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন, যিনি বলেন: "মাগরিব নামায হলো দিনের বেলার বিত্‌র নামায"। [মুয়াত্তা ইমাম মালিক]

এই সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হলো, বিত্‌র মাগরিবের মতোই পড়তে হয়। পার্থক্য হলো তৃতীয় রাকাআতে সূরা ফাতিহার পর তিলাওয়াত করা, হাত উত্তোলন করে অতিরিক্ত তাকবীর দেওয়া এবং দুয়ায়ে কুনুত পাঠ।

দলিল - ২: বিত্‌র মাগরিবের অনুরূপ

ইমাম মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উপরোক্ত হাদিসখানা বর্ণনা করে মন্তব্য করেন: "যে কেউ মাগরিবের নামায দিনের বিত্‌র এর মতো পড়বে তার উচিৎ হবে ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমার উক্তি মুতাবিক রাতের বিত্‌র নামাযও অনুরূপভাবে আদায় করা। এর মা'না হলো, নামাযে দু'টি সালাম হবে না [তিন রাকাআতই এক সাথে পড়তে হবে]। আর ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সিদ্ধান্ত এটাই।" [মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ]

দলিল - ৩: বিত্‌র মাগরিবের অনুরূপ

ইমাম মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় কিতাব মুয়াত্তায় বিত্‌র নামাযে সালাম ফিরানোর উপর একটি পুরো অধ্যায় সংযোজন করেছেন। তিনি এতে নিম্নোক্ত হাদিসটিও এনেছেন।

হযরত আবু উবাইদাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেছেন, "বিত্‌র হলো 'তিন' [রাকাআত] ঠিক মাগরিবের 'তিন' [রাকাআত] এর মতো।" [মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ]

দলিল - ৪: বিত্‌র মাগরিবের অনুরূপ

ইমাম মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন: হযরত আতা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা বলেছেন: "বিত্‌র মাগরিব নামাজের মতো।" [মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ]

বিত্‌র নামাযে শুধুমাত্র শেষ রাকাআতে সালাম ফিরাতে হয়

দলিল - ১: বিত্‌র নামাজে একবার মাত্র সালাম

হাদিস শরীফে আছে:

হযরত আয়িশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম [বিত্‌র নামাজে] দু'রাকাআত পরে সালাম ফিরান নি। [মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ]

দলিল - ২: বিত্‌র নামাজে একটি মাত্র সালাম

হাদিস শরীফে আছে:

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِسَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ وَيَقُولُ يَعْنِي بَعْدَ التَّسْلِيمِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلَاثًا

-হযরত কা'ব রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিত্‌র নামাজে প্রথম রাকাআতে 'সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা', দ্বিতীয় রাকাআতে 'কুল ইয়া আইয়্যুহাল কা-ফিরূন' এবং তৃতীয় রাকাআতে 'কুল হুয়াআল্লাহু আহাদ' তিলাওয়াত করতেন। তিনি শুধুমাত্র [তাসলিম] শেষে সালাম ফিরাতেন এবং তিনবার বলতেন: সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস। [সুনানে নাসাঈ]

দলিল - ২: বিত্র নামাজে একবার মাত্র সালাম

হাদিস শরীফে আছে:

عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَيْ الْوِتْرِ

-হযরত সাঈদ ইবনে হিশাম রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, হযরত আয়িশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা তাকে বলেছেন: "বিত্র নামাজের দ্বিতীয় রাকাআতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরাতেন না।" [সুনানে নাসাঈ]

শাফিঈ মাজহাবের ইমাম হযরত আবু জাকারিয়া মুহিউদ্দনী নববী (৬৩১-৬৭৬ হি.) রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই হাদিসের উপর মন্তব্য করতে যেয়ে বলেন:

حديث عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم لا يسلم فى ركعتى الوتر رواه النسائى بإسناد حسن ورواه البيهقى فى السنن الكبيرة بإسناد صحيح

-"ইমাম নাসাঈ বর্ণিত আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহার হাদিসখানা যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'রাকাআত বিত্র নামায পড়ে সালাম ফিরাতেন না বলা হয়েছে, তার সনদ হাসান। ইমাম বাইহাকি রাহমাতুল্লাহি আলাইহিও 'সুনানে কাবিরাহ' কিতাবে হাদিসখানা সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।" [আল-মাজমু, খ. ৪, পৃ. ২৩]

দলিল - ৩: বিত্র নামাজে একবার মাত্র সালাম

হাদিস শরীফে আছে:

حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال أجمع المسلمون عن أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا فى آخرهن

-ইমাম হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "এ ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে ইজমা হয়েছে যে, বিত্র তিন রাকাআত ও সালাম ফেরানো [তিন রাকাআত] শেষে ছাড়া হবে না।" [মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ, খ. ২, পৃ. ১৯৪]

আমরা মনে করি, বিত্র নামায ওয়াজিব হওয়া, মাগরিবের মতো তিন রাকাআত হওয়া এবং শেষ রাকাআতে [শেষ বৈঠক শেষে] সালাম ফিরানোর ব্যাপারে হানাফি সিদ্ধান্তের দলিলাদি হিসাবে উপরোক্ত সহীহ বর্ণনাগুলোই যথেষ্ট। আমরা আশা করি, গায়র মুকাল্লিদ ভাইগণ এ ব্যাপারে বাড়াবাড়িমূলক মন্তব্য ও বিভ্রান্তি ছড়ানো থেকে বিরত থাকবেন। তারা লা-মাজহাবী হওয়ার কারণে যেভাবে ইচ্ছে এ নামায আদায় করছেন বলে এটা প্রমাণ হয় না যে, মাহজাবপন্থী বৃহত্তর মুসলিম জনতা তাদেরকে অনুসরণ করবেন- কখনও নয়। ভ্রান্তি থেকে বাঁচার জন্যই মাজহাব। সুতরাং আমরা কখনো নিজে নিজে কুরআন-হাদিস চয়ন করে দ্বীন পালনের দুঃসাহস দেখাবো না, যা লা-মাজহাবীরা করে থাকেন। এভাবে দ্বীন পালনের ফলে মারাত্মক ভুল-ভ্রান্তি ও ক্ষতির মধ্যে পতিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। এমনকি, শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মতে, দ্বীন থেকে বের হওয়ার ভীষণ সম্ভাবনা আছে- আমরা আল্লাহর দরবারে আশ্রয়প্রার্থী। (ফুয়ুযূল হারামাইন)

বিত্‌র নামাযে দু'আয়ে কুনুত পাঠ

এবার বিত্‌র নামাযে দু'আয়ে কুনুত পাঠের প্রসঙ্গে আসা যাক। হানাফি মতে তৃতীয় রাকাআতের জন্য দাঁড়ানোর পর ফাতিহা ও তিলাওয়াত শেষে হাত তুলে একটি তাকবীর দিতে হবে। এরপর দু'আয়ে কুনুত পাঠ করে যথারীতি রুকু-সিজদা ও শেষ বৈঠক শেষে উভয় দিকে সালাম ফিরিয়ে বিত্‌র নামায সমাপ্ত করতে হয়।

বিত্‌র নামাজে দু'আয়ে কুনুতের ব্যাপারে নিচে তিনটি দলিল পেশ করছি। আমাদের বিশ্বাস এসব দলিলই হানাফি সিদ্ধান্ত অন্য চারটি মাহজাবী সিদ্ধান্তের মতো সম্পূর্ণ সঠিক হিসাবে প্রমাণিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

দলিল - ১: কুনুত তৃতীয় রাকাআতের রুকুর পূর্বে পাঠ করতে হয়

হাদিস শরীফে আছে:

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ

-হযরত উবাই বিন কা'ব রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত: [তিনি বলেন] "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিত্‌র নামাজের কুনুত রুকুতে যাওয়ার পূর্বে পাঠ করতেন।" [সুনানে আবু দাউদ]

দলিল - ২: কুনুত তৃতীয় রাকাআতের রুকুর পূর্বে পাঠ করতে হয়

হাদিস শরীফে আছে:

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ فَرَأَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ الْقُنُوتَ فِي الْوِتْرِ فِي السَّنَةِ كُلِّهَا وَاخْتَارَ الْقُنُوتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَإِسْحَقُ وَأَهْلُ الْكُوفَةِ

-আহলে ইলমের মধ্যে বিত্‌র নামাজে কুনুত পাঠের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য আছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, কুনুত সারা বছরই পাঠ করতে হবে এবং তা 'রুকুতে যাওয়ার পূর্বে' পড়া জরুরী। হাযারাত সুফিয়ান সাওরী, ইবনে মুবারক, ইসহাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমসহ প্রমুখ আলিম এবং কুফাবাসী মানুষও একই কথা বলেছেন। [সুনানে তিরমিযি]

দলিল - ৩: কুনুত তৃতীয় রাকাআতের রুকুর পূর্বে পাঠ করতে হয়

হাদিস শরীফে আছে:

حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم قا لاخبرنا منصور عن الحارث العلكى عن إبراهيم عن الاسود بن يزيد أن بن عمر قنت فى الوتر قبل الركوع

-হযরত ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু বিত্‌র নামাযের কুনুত পাঠ করতেন রুকুতে যাওয়ার পূর্বে। [মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ]

আরো অনেক সাহাবায়ে কিরাম রিদ্বওয়ানুল্লাহি তা'আলা আজমাঈন কুনুত রুকুর পূর্বে পাঠ করেছেন বলে সহীহ বর্ণনা বিভিন্ন মূল গ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ আছে। আর সাহাবায়ে কিরামের আমল হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলের আয়নাস্বরূপ। তাঁরা কাছে থেকে এসব আমল দেখে শিখেছিলেন ও নিজেদের জিন্দেগীতে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

সুতরাং হানাফি সিদ্ধান্ত সবগুলোর মতো এ ক্ষেত্রেও কুরআন-হাদিসের বর্ণনা, সাহাবায়ে কিরামের আমল, তাবিঈ এবং তাবে তাবিঈদের আমলের উপর নির্ভরশীল। বাস্তবে সকল মাজহাবের সিদ্ধান্তই অনুরূপভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তা সঠিক, শুদ্ধ ও যথার্থ। মাজহাবের বাইরে যেয়ে দ্বীন পালনের প্রবণতা সত্যিই মারাত্মক ও ভীষণ ভ্রান্তিমূলক হতে পারে। এই ঝুঁকি যারা নিচ্ছেন তারা কোন্ স্বার্থে নিচ্ছেন তা আমাদের জানা নেই। আমরা তাদের প্রতি আকুল অনুরোধ জানাবো, ফিরে আসুন। চার মাজহাবের যে কোন একটির অনুসরণ করে গড়ে তুলুন সঠিক আমলী জিন্দেগী যা হবে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের সন্তুষ্টির অনুকূলে। কোন্ সাহসে আপনারা দুনিয়া-আখিরাতকে বরবাদ করার ঝুঁকি নিচ্ছেন?

মাজহাব ছাড়া দ্বীন পালন মোটেই সম্ভব নয়। সাধারণ মুসলমান তো বটেই, যুগ যুগান্তর ধরে জ্ঞানী-গুণি আলিম-উলামাও মাজহাব থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সাহস করেন নি। মাজহাবী ফিক্‌হই সঠিক দ্বীনদারিত্ব ও শরীয়ত শুরু থেকেই উত্তরসূরীদের জন্য সংরক্ষণ করে আসছে। এই ফিক্‌হ ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞানার্জনই অসম্ভব। সুতরাং ভ্রান্তির বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আমরা মুসলিম উম্মাহ্‌র মধ্যস্থ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এই লা-মাজহাবী ভাইদের প্রতি আবারো আকুল আবেদন জানিয়ে এই প্রসঙ্গের ইতি টানছি। আর আল্লাহ তা'আলাই সবকিছুর উপর পূর্ণ জ্ঞানবান। তাঁর সন্তুষ্টি কামনা ছাড়া আমাদের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই।

৩৫. *সম্প্রতি গায়র মুকাল্লিদদের কেউ কেউ একটি ভ্রান্ত মন্তব্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও সঠিক আরেক আমল থেকে মানুষকে বিরত রাখার চেষ্টা করছেন। তারা বলছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে কুরবানী করা নাকি অবৈধ!*

তাদের এই ফাতওয়া যে অমূলক তার প্রমাণ আমরা এক্ষুণি উপস্থাপন করছি।

এই ব্যাপারটি নিয়ে ভাবলে যে প্রশ্নটি প্রথমেই আসে তাহলো, ইসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে মৃত ব্যক্তির পক্ষে কুরবানী দেওয়া শরীয়তে বৈধ কি না? আমরা এ প্রশ্নের জবাবে সবাইকে নিশ্চিত করতে পারি যে, মহাত্মন আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের মধ্যে মতৈক্য হয়েছে যে, মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে শুধু কুরবানী নয়, জীবিতদের দ্বারা ইসালে

সওয়াব হিসাবে কৃত অনেক 'নফল' [ঐচ্ছিক] আমল মৃতের রূহের ওপর মাগফিরাতের ওয়াসিলা হিসাবে পৌঁছে থাকে এবং তা অবশ্যই শরীয়তে বৈধ। উলামায়ে কিরাম ইসালে সওয়াবের দৃষ্টান্ত হিসাবে 'আর্থিক' ও 'শারীরিক' যেসব আমলের কথা বলেছেন তার মধ্যে ক'টি হলো এই: (ক) সাদক্বা, (খ) কুরবানী, (গ) হাজ্জ, (ঘ) নামায, (ঙ) রোজা, (চ) কুরআন তিলাওয়াত, (ছ) দু'আ-দরূদ ইত্যাদি। [দ্র: ইবনে আবিদীন, রাদ্দুল মুহতার (হানাফি); হাত্তাব রুই'আনী, মাওয়াহিবাল জালিল (মালিকী); ইমাম নববী, আল-মিনহায (শাফিঈ); ইবনে কুদামা মাক্বদিসী, আল-মুগনি (হাম্বলি)]

ইসালে সওয়াবের উপর ইমাম মুসলিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর সহীহ সংকলনে একটি আলাদা বাব সংযুক্ত করেছেন। এর নাম হলো:

بَاب وُصُولِ ثَوَابِ الصَّدَقَةِ عَنْ الْمَيِّتِ إِلَيْهِ

অর্থাৎ: "মৃতের জন্য সওয়াবের উদ্দেশ্যে দানকৃত সদক্বার বিনিময় তার নিকট পৌঁছে।" এরপর প্রথমেই এই হাদিসটি বর্ণনা করেন:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَتْ نَفْسَهَا وَلَمْ تُوصِ وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ

অর্থাৎ: "হযরত আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে প্রশ্ন করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা হঠাৎ মারা গেছেন। তিনি তাঁর [রেখে যাওয়া] সম্পদের উপর কোনো উপদেশ দেন নি। আমার বিশ্বাস, কথা বলতে পারলে তিনি সাদক্বা দিয়ে যেতেন। আমি যদি তাঁর পক্ষ থেকে সাদক্বা করি তাহলে এর প্রতিদান তিনি পাবেন কি?' তিনি [সা.] জবাব দিলেন, হ্যাঁ।" [সহীহ মুসলিম : ১৬৭২]

মৃতের ওপর সওয়াব পাঠানোর উদ্দেশ্যে কুরবানী করার ব্যাপারে সহীহ হাদিস বিদ্যমান। যেমন:

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই তাঁর সমস্ত উম্মতের পক্ষে কুরবানী করেছেন। একটি হাদিসে আছে:

قَالَ بِاسْمِ اللهِ اللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحّٰى بِهِ

অর্থাৎ: "বললেন: আল্লাহর নামে, হে আল্লাহ! মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে গ্রহণ করুন, মুহাম্মাদের পরিবার-পরিজনের ও মুহাম্মাদের উম্মতের পক্ষ থেকে গ্রহণ করুন।" [সহীহ মুসলিম : ৩৬৩৭]

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পরও তাঁর নামে সাহাবায়ে কিরামের পক্ষ থেকে কুরবানী হয়েছে। হাদিস শরীফে আছে:

عَنْ حَنَشٍ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ مَا هَذَا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَانِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ

অর্থাৎ: "হযরত হানাশ রাদ্বিআল্লাহু অনাহু বলেন, আমি দেখলাম আলী দু'টি ভেড়া কুরবানী করছেন। জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা কি?' জবাব দিলেন, 'অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে উপদেশ প্রদান করেছেন [ইন্তিকালের পর] তাঁর নামে কুরবানী করতে। তাই আমি তাঁর পক্ষ থেকে কুরবানী করছি।'" [আবু দাউদ : ২৪০৪, তিরমিযি : ১৪১৫, আহমদ : ১২১৯]

উক্ত তিনজন মুহাদ্দিসীনে কিরামের মধ্যে একমাত্র ইমাম তিরমিযি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, "قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ"। এটি 'জঈফ' বা দুর্বল কোথাও বলা হয় নি। ইমাম আবু দাউদ ও আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমার 'সুকুত' [নীরবতা] প্রমাণ করে এটি আসলে একটি সহীহ বর্ণনা।

আগেকার যুগের মুসলমানরা সর্বদাই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষে নফল হজ্জ, খতমে কুরআন, কুরবানী ইত্যাদি আমল করেছেন বলে সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। বুজুর্গানে দ্বীন এ ব্যাপারে উপদেশও করেছেন। [দেখুন: রাদ্দুল মুহতার, ২/২৪৪; ই'লাউস সুনান, ১৭/২৬৮]

সুতরাং আমরা আশা করবো, গাইর মুকাল্লিদ বন্ধুরা যেনো ভিত্তিহীন বক্তব্য দ্বারা মুসলিম উম্মাহ্‌কে বিভ্রান্ত করা থেকে বিরত থাকেন। নিজেরা 'মুজতাহিদ' বনে কোনো আমল ছেড়ে দেওয়া কিংবা নতুন একটি শুরু করার মানে নয় যে, অন্যদেরকেও তাদের 'তাক্বলিদ' করতে হবে?

৩৬. গায়র মুকাল্লিদ সালাফিরা ইদানিং আরেক মারাত্মক ফিতনার জন্ম দিয়েছেন। তারা বলেন, একদিনে ঈদ ও একদিনে রোযা সমগ্র পৃথিবীব্যাপী পালন করতে হবে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তারা সৌদি আরবের অনুসরণে ঈদের আগের দিন ঈদ ও রোযার আগের দিন থেকে রোযা পালনে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করছেন। মানুষ তাদের এই ভ্রান্তির ফলে ধার্মিকতার ক্ষেত্রে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। যে দেশে যেদিন রোযা নয় সে দেশে রোযা রাখছেন, যে দেশে যেদিন ঈদ নয় সে দেশে সেদিন ঈদ পালন করছেন। একদিকে তাদের ঈদের ওয়াজিব নষ্ট হচ্ছে এবং অপরদিকে নষ্ট হচ্ছে ফরয রোযা।

তাদের এই বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণার খণ্ডন: খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সিলেট, সুবিদবাজার, বাংলাদেশ থেকে এসম্পর্কিত একখানা পুস্তিকা ২০১২ ঈসায়ী সনে প্রকাশিত হয়েছে। মাওলানা মুহাম্মদ আতাউর রহমান জকিগঞ্জী সাহেব লিখিত, মাওলানা ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী ও মাওলানা সৈয়দ মাহমুদুল হাসান সম্পাদিত এবং মাওলানা নিজাম উদ্দীন রানাপিংগী কর্তৃক প্রকাশিত 'আল-বায়ানুল জামি' ইবরাতান লি-ইখতিলাফিল মাতালি'' শিরোনামের এই পুস্তকে কুরআন, হাদিস, ফুকাহায়ে কিরামের সিদ্ধান্ত, সৌদি 'সালাফি' আলিমদের ফাতওয়ার আলোকে এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তির নিরিখে সালাফিদের এই বাতিল প্রচারণার খণ্ডন করা হয়েছে।

'একদিনে রোযা, একদিনে ঈদ' মূলত একটি ভ্রান্ত স্লোগান। আর এটা ভ্রান্ত হওয়ার দলিল হিসাবে আমরা ১৯৮১ ঈসায়ীতে প্রকাশিত একটি বিখ্যাত ফাতওয়ার আরবী অনুলিপি বঙ্গানুবাদসহ নিম্নে (পরের পৃষ্ঠায়) তুলে ধরছি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস সালাফিদের উক্ত ভ্রান্তি খণ্ডনে এই ফাতওয়াটিই যথেষ্ট হবে। ফাতওয়াটি উক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করছি। অবশ্য এটি পাঠকরা ইন্টারনেটের একটি সাইটে যেয়ে নিজেই দেখতে পারবেন: www.hilalsighting.org। মাওলানা জকিগঞ্জী সাহেবের পুস্তিকা ইন্টারনেটের একটি সাইট থেকে ডাউনলোড করে পাঠ করার জন্যও অনুরোধ জানাচ্ছি। সাইটটি হলো:

https://archive.org/details/MoonSightingSameDayIslamic

‘রাবেতায়ে আলমে ইসলামী’ নামক সৌদি আরব ভিত্তিক আন্তর্জাতিক ইসলামী সংগঠনের ফাতওয়া:

The 4th Meeting of the Council
From 7th of Rabi Al-Thani-17th of Rabi Al-Thani 1401 Hijri
11th of Feb-21st of Feb 1981

القرار السابع
في بيان توحيد الأهلة من عدمه

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لانبي بعده.. أما بعد :

لقد درس المجمع الفقهي الإسلامي مسألة اختلاف المطالع في بناء الرؤية عليها، فرأى أن الإسلام بني على أنه دين يسر وسماحة، تقبله الفطرة السليمة، والعقول المستقيمة، لموافقته للمصالح، ففي مسألة الأهلة، ذهب إلى إثباتها بالرؤية البصرية لا على اعتمادها على الحساب، كما تشهد به الأدلة الشرعية القاطعة، كما ذهب إلى اعتبار اختلاف المطالع، لما في ذلك من التخفيف على المكلفين، مع كونه هو الذي يقتضيه النظر الصحيح، فما يدعيه القائلون من وجوب الاتحاد في يومي الصوم والإفطار مخالف لما جاء شرعاً وعقلاً، أما شرعاً فقد أورد أئمة الحديث، حديث كريب، وهو أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال : فقدمت الشام، فقضيت حاجتها، فاستهل علي شهر رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبدالله بن عباس –رضي الله عنهما– ثم ذكر الهلال فقال : متى رأيتم الهلال؟ فقلت : رأيناه ليلة الجمعة فقال : أنت رأيته؟ فقلت نعم ورآه الناس، وصاموا وصام معاوية، فقال : لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه، فقلت : أولا نكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال : لا، هكذا أمرنا رسول الله ﷺ (رواه مسلم في صحيحه).

وقد ترجم الإمام النووي على هذا الحديث في شرحه على صحيح مسلم بقوله (باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم، وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد، لايثبت حكمه لما بَعُدَ عنهم) ولم يخرج عن هذا المنهج من أخرج هذا الحديث من أصحاب الكتب الستة أبى داود والترمذي والنسائي في تراجمهم له.

The 4th Meeting of the Council
From 7th of Rabi Al-Thani-17th of Rabi Al-Thani 1401 Hijri
11th of Feb-21st of Feb 1981

وناط الإسلام الصوم والإفطار بالرؤية البصرية دون غيرها، لما جاء في حديث ابن عمر –رضي الله عنهما– قال قال رسول الله ﷺ (لاتصوموا حتى تروا الهلال، ولاتفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له). رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فهذا الحديث علق الحكم بالسبب، الذي هو الرؤية، وقد توجد في بلد كمكة والمدينة، ولا توجد في بلد آخر، فقد يكون زمانها نهاراً عند آخرين، فكيف يؤمرون بالصيام أو الإفطار؟ أفاده في بيان الأدلة في إثبات الأهلة – وقد قرر العلماء من كل المذاهب : أن اختلاف المطالع هو المعتبر عند كثير، فقد روى ابن عبدالبر الإجماع على ألا تراعى الرؤية فيما تباعد من البلدان : كخراسان من الاندلس، ولكل بلد حكم يخصه– وكثير من كتب أهل المذاهب الاربعة طافحة بذكر اعتبار اختلاف المطالع، للأدلة القائمة من الشريعة بذلك، وتطالعك الكتب الفقهية بما يشفي الغليل.

وأما عقلاً : فاختلاف المطالع لا اختلاف لاحد من العلماء فيه، لانه من الأمور المشاهدة، التي يحكم بها العقل، فقد توافق الشرع والعقل على ذلك، فهما متفقان على بناء كثير من الاحكام على ذلك التي منها أوقات الصلاة – ومراجعة الواقع تطالعنا بأن اختلاف المطالع من الامور الواقعية– وعلى ضوء ذلك قرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي : أنه لا حاجة إلى الدعوة إلى توحيد الأهلة والأعياد في العالم الإسلامي؛ لأن توحيدها لايكفل وحدتهم ، كما يتوهمه كثير من المقترحين لتوحيد الأهلة والأعياد. وأن تترك قضية إثبات الهلال إلى دور الإفتاء والقضاء في الدول الإسلامية، لأن ذلك أولي وأجدر بالمصلحة الإسلامية العامة. وأن الذي يكفل توحيد الأمة وجمع كلمتها، هو اتفاقهم على العمل بكتاب الله وسنة رسولهﷺ في جميع شؤونهم. والله ولي التوفيق.وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

The 4th Meeting of the Council
From 7th of Rabi Al-Thani-17th of Rabi Al-Thani 1401 Hijri
11th of Feb-21st of Feb 1981

অনুবাদঃ "রাবেতায়ে আলমে ইসলামী'র চতুর্থতম কাউন্সিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ৭ রবিউস-সানী থেকে ১৭ রবিউস-সানী ১৪০১ হিজরী মুতাবিক ১১ ফেব্রুয়ারী থেকে ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৮১ ঈসায়ী।

সপ্তম সিদ্ধান্ত

চাঁদের উদয়স্থলের অভিন্নতা গ্রহণযোগ্য নয়

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য এবং সালাত ও সালাম হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি। আম্মা বা'দ-

ইসলামী ফিকহ পরিষদ চাঁদ দেখার উদয়স্থলের ভিন্নতার উপর বেশ গবেষণা করেছে। পরিষদের অভিমত হলো, ইসলাম একটি সরলপথের ধর্ম। সুস্থ প্রকৃতি এবং জ্ঞান-বিবেকের সাথে ইসলামের সামঞ্জস্যতা বিদ্যমান। কারণ, জীবনের সার্বিক অবস্থার সঙ্গে ইসলাম সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে চাক্ষুষ দেখাই হলো ইসলামী সিদ্ধান্ত, হিসাবের উপর নির্ভরশীল নয়। শরীয়তের অকাট্য দলিলাদি এর সাক্ষ্য বহন করে। ইসলামী আইনে চন্দ্রের উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রহণযোগ্য। মুসলমানদের জন্য এটি একটি সহজ পথ। সুতরাং যারা বলেন, "গোটা বিশ্বে একদিনে রোযা-ইফতার হবে" তারা শরয়ী ও যৌক্তিক প্রমাণের বিরোধী। এ ব্যাপারে শরয়ী প্রমাণ হলো, হাদিসের ইমামগণ কর্তৃক রিওয়াতকৃত কুরাইব রা. থেকে বর্ণিত হাদিসটিঃ [অনুবাদ] "উম্মুল ফযল বিনতে হারিস তাঁকে শামদেশে মুয়াবিয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নিকট পাঠিয়েছিলেন। আবু কুরাইব রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, আমি শামদেশে পৌঁছে তাঁর (প্রেরণকারীর) প্রয়োজন পূর্ণ করি। এমতাবস্থায় রমযানের চাঁদ আমার উপর উদয় হলো। তখনও আমি শামে, অতএব জুমু'আর রাতে আমরা চাঁদ দেখলাম, এরপর মাসের শেষ দিকে আমি মদীনা শরীফ এসে পৌঁছি। আমাকে ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করেন, আপনারা কখন চাঁদ দেখেছেন?' আমি জবাব দিলাম (আবু কুরাইব বলেন), 'আমরা জুম'আর রাতে চাঁদ দেখেছি'। তিনি আবার বললেন, 'আপনিও কি চাঁদ দেখেছেন?' বললাম, 'হ্যাঁ, লোকজনও দেখেছেন, এবং তারা রোযা রেখেছেন। মুয়াবিয়াও রোযা রেখেছেন'। এতদশ্রবণে তিনি বললেন, 'আমরা (মদীনায়) চাঁদ দেখেছি শনিবার রাতে। অতএব আমরা ৩০ দিন পূর্ণ করা বা চাঁদ দেখা পর্যন্ত রোযা রাখবো।' আমি বললাম, 'আপনি মুয়াবিয়ার চাঁদ দেখা ও রোযা রাখাকে যথেষ্ট মনে করেন না?'। তিনি বললেন, 'না, এভাবেই

আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন'।" (সহীহ মুসলিম)

ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যায় এই হাদিসের আলোকে শিরোনাম করেছেন এভাবে: "প্রত্যেক শহরবাসীকে নিজ নিজ শহরে চাঁদ দেখতে হবে। এক শহরে যদি লোকজন চাঁদ দেখে, তবে দূরবর্তী শহরবাসীর জন্য এই দর্শন যথেষ্ট নয়।" সিহাহ সিত্তার ইমামগণ যেমন ইমাম আবু দাউদ, ইমাম তিরমিযী ও ইমাম নাসাঈ তাঁদের স্ব-স্ব কিতাবে উক্ত হাদিস বর্ণনা করেছেন। এতে বর্ণিত বিধানে তারা দ্বিমত পোষণ করেন নি। রোযা ও ইফতারের ক্ষেত্রে চন্দ্রের চাক্ষুষ দর্শনের উপর ইসলামের বিধান। হযরত ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা বর্ণিত হাদিসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত চাঁদ দেখবে না ততক্ষণ রোযা রাখবে না। অনুরূপ চাঁদ না দেখে রোযা ভাঙ্গবে না (ঈদ পালন করবে না)। আকাশ যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে গণনার মাধ্যমে তা নির্ধারণ করবে। এই হাদিসখানা বুখারী ও মুসলিম তাঁদের স্ব-স্ব সহীহ কিতাবে বর্ণনা করেছেন। এই হাদিসে 'বিধানকে কারণের সঙ্গে' সম্পৃক্ত করা হয়েছে। আর এই কারণটি হলো, চন্দ্র দর্শন (দেখা)। মক্কা ও মদীনা শরীফে চাঁদ দেখা যেতে পারে। একই সময় অন্য শহরে না-ও দেখা যেতে পারে। এসময় হয়তো অন্যদের এলাকায় দিবালোক। সুতরাং এসব লোকদেরকে কিভাবে রোযা বা ইফতার পালনের নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে?

প্রত্যেক মাজহাবের আলীমদের মত হলো, চাঁদের উদয়স্থলের ভিন্নতা অধিকাংশের নিকটই গ্রহণযোগ্য। হযরত ইবনে আবদুল বার রহ. এ ব্যাপারে ইজমায়ী মত পেশ করেছেন যে, দূরবর্তী শহরে চাঁদের দর্শন গ্রহণযোগ্য নয়, যেমন খুরাসান ও উন্দুলুস (স্পেন)। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক শহরের নিজস্ব বিধান ধর্তব্য। চার মাজহাবের অধিকাংশ গ্রন্থেই চাঁদের উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য বলে লিখিত আছে। কারণ এ ক্ষেত্রে শরীয়তের দালায়িল দ্বারা তা প্রমাণিত। ফিকার কিতাবাদি অধ্যয়নের মাধ্যমে অন্তরের সংশয়-সন্দেহ থেকে যে কোন ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করতে পারে।

যুক্তিভিত্তিক দলিল

চাঁদের উদয়স্থলের ভিন্নতা যে ধর্তব্য এ ব্যাপারে কোন আলিমের মধ্যে দ্বিমত নেই। বিষয়টি তো চাক্ষুষ। বিবেকের অনুকূলে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে শরীয়ত ও যুক্তির মধ্যে মতৈক্য সৃষ্টি হয়েছে। অনুরূপ শরীয়তের আরো অনেক বিধান

আছে যা শরীয়ত ও যুক্তির অনুকূলে। যেমন নামাযের ওয়াক্তসমূহ। সুতরাং আমাদের গবেষণা দ্বারা এটা প্রমাণিত হলো, চাঁদের উদয়স্থলের ভিন্নতা একটি বাস্তব বিষয়। এর আলোকে **এই ইসলামী ফিক্‌হ পরিষদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো:**

গোটা বিশ্বে একই দিনে রোযা ও ঈদ পালনের আহ্বান নিষ্প্রয়োজন। কারণ, একই দিনে রোযা ও ঈদ পালনে উম্মতের ঐক্য নিহিত নয়- যেভাবে একদল লোক একই দিনে রোযা ও ঈদ পালনের আহ্বান জানাচ্ছে।

ইসলামী রাষ্ট্রগুলোতে চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে তাদের স্ব-স্ব ফাতওয়া ও বিচার বিভাগের উপর ছেড়ে দেওয়া উচিৎ। আর এটাই হলো মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য সার্বিকভাবে কল্যাণকর পন্থা। উম্মতের ঐক্য মূলত জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সুন্নাত পালনের মধ্যে নিহিত।

আল্লাহ তা'আলাই তাওফিকদাতা। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ও তাঁর সাথীদের উপর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক।"

উক্ত ফাতওয়ায় যারা দস্তখত করেছেন তারা হলেন:

১. শায়খ আবদুল আজিজ বিন আবদুল্লাহ বিন বায, ২. শায়খ মুহাম্মদ আলী আল-হারকান, ৩. শায়খ আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন-হুমায়িদ, ৪. শায়খ মুস্তফা আহমদ জারক্বা, ৫. শায়খ মুহাম্মদ মাহমূদ আস-সাওওয়াফ, ৬. শায়খ সালেহ বিন উসাইমিন, ৭. শায়খ মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন সাবিল, ৮. শায়খ মাবরুক আল-আওয়াদী, ৯. শায়খ মুহাম্মদ আশ-শাযিলী নাবগী, ১০. শায়খ আবদুল কুদ্দুস আল-হাশিমী, ১১. শায়খ মুহাম্মদ রাশীদ কুবায়ী, ১২. শায়খ আবুল হাসান আলী হাসানী আন-নাদাওয়ী, ১৩. শায়খ আবু বকর মাহমূদ জুমী, ১৪. শায়খ হুসাইন মুহাম্মদ মাযউফ, ১৫. শায়খ ড. মুহাম্মদ রাশিদী, ১৬. শায়খ মাহমূদ শায়েত খাত্তাব, ও ১৭. শায়খ মুহাম্মদ সালিম আ'দুদ।

সূত্র: www.hilalsighting.org।
অনুবাদ: মাওলানা সৈয়দ মাহমুদুল হাসান

সহকারী সচিব, খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া গবেষণা বিভাগ।"

পরিচ্ছেদ - ২

যুগের প্রধান 'বিদআতী' নাসিরুদ্দীন আলবানিসহ সালাফি লেখকদের মতামত, আক্বীদা ও ফাতওয়া খণ্ডনে উলামায়ে কিরাম কর্তৃক রচিত গ্রন্থাদি

আমাদের সময়ের সর্বাধিক মারাত্মক এক 'ওয়াহাবী' ও 'সালাফি' বিদআতী ছিলেন নাসিরুদ্দীন আলবানি। 'ঘড়ি মেরামতকারী' এ ব্যবসায়ী স্ব-শিক্ষিত হিসাবে দাবী করতেন। তিনি হাদিস শাস্ত্রে অভিজ্ঞ বলেও নিজেকে গর্বভরে উপস্থাপন করেছেন। যদিও আমাদের জানামতে তার কোনো বিশেষ উস্তাদই ছিলেন না। অবশ্য তিনি কুরআনে হাফিজ ছিলেন না। এছাড়া কোনো হাদিস গ্রন্থ, ফিকাহ শাস্ত্রের কিতাব, আক্বীদা বিষয়ক গ্রন্থ, উসূলে কুরআন ও হাদিস কিংবা আরবী ব্যাকরণের উপর তার দক্ষতা খুবই সীমিত বলে স্বীকার করেছেন। তিনি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের উচ্চ পর্যায়ের আলিমদের উপর 'আক্রমণ' করে [অপরিপক্ক] জনতার মধ্যে সুপরিচিত হয়ে ওঠেন। তিনি অবশ্য অদক্ষ হয়েও এমন কিছু মারাত্মক সংস্কার কাজ করেছেন যার খেসারত মুসলিম উম্মাহ্‌কে বহুদিন দিতে হবে। তিনি তার নিজের মুফতি পিতার অনুসরণীয় হানাফী মাজহাবের প্রতি খুব শক্তভাবে হামলা চালান। আমরা ইতোমধ্যে 'ওয়াহাবী-সালাফিদের মতামতসমূহের খণ্ডন' শিরোনামে জনাব আলাবানীর ভ্রান্তির স্বরূপ বিস্তারিতভাবে উন্মোচন করেছি।

আল্লাহর ওলীদের বিরুদ্ধে বিষোদগারকারী এই আধুনিক যুগের ফিতনাবাজ 'অল্পবিদ্যান ভয়ঙ্গর' ব্যক্তিকে সিরিয়া এবং পরে সাউদী আরব থেকে বহিস্কার করা হয়। তিনি জার্দানের আম্মানে যেয়ে আশ্রয় নেন। সেখানেও তিনি 'গৃহবন্দী' অবস্থায় বাকী জীবন কাটিয়ে ১৯৯৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তবে বিদআতী সালাফিদের 'শায়খ' হিসাবে তিনি স্থান করে নিয়েছেন। যারা নিজের নফসের তাড়না মুতাবিক 'ইচ্ছেমাফিক' ইসলামের সংস্কারকাজে লিপ্ত তাদের জন্য আলবানি একজন ইমাম হিসাবে গণ্য। তাছাড়া ওয়াহাবী, সাফাফিদের প্রতি দুর্বল কিছু লোক এবং দ্বীন সম্পর্কে অর্ধ্ব বা অশিক্ষিত কিছু মানুষ আলবানির উপর নির্ভরশীল। অথচ সমসাময়িক

অধিকাংশ সুন্নী আলিম আলবানির ধর্মদ্রোহিতা, ফিতনা ও বাতুলতা সম্পর্কে সকলকে সতর্ক করে দিয়েছেন। তাঁরা এ ব্যাপারে প্রবন্ধ-নিবন্ধ, বই-পুস্তক রচনা করে প্রকাশ করেছেন। যেমন:

১. ভারতীয় হাদিস বিশারদ হযরত হাবীবুর রহমান আজমী সাহেব চার খণ্ডে লিখেছেন: "আল-আলবানি শুদ্ধুদু ওয়া আখতা'উ [আলবানির ভ্রান্তি ও ভুল]"।

২. সিরিয়ার আলিম মুহাম্মদ সাইদুর রহমান বুতী দু'টি ক্লাসিক কিতাব লিখেছেন: "আল-লামাজহাবিয়া আখতারু বিদআতিন তুহাদ্দিদুশ শারীয়াল ইসলামিয়া [মাজহাব অনুসরণ না করা হলো সর্বাধিক মারাত্মক বিদআত যা ইসলামী শরীয়াকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছে]" এবং "আস্‌সালাফিয়া মারহালাতুন জামানিয়াতুন মুবারাকা লা মাজহাবুন ইসলামী [প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের রাস্তা ছিলো একটি মুবারক ঐতিহাসিক যুগ, ইসলামী মাজহাব নয়]"।

৩. মরক্কোর মুহাদ্দিস আবদুল আজিজ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সিদ্দীক গুনামী লিখেছেন: "ইরগামুল মুবতাদি'ল গাবির বি জওয়াযুত তাওয়াস্‌সুল বিন-নাবী ফীর-রাদ্দ আলাল আলবানি আল-ওয়াবি [নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অকাট্য দলিলসহ মারাত্মক ক্ষতিকর আলবানি নামক অজ্ঞ বিদআতীর জোর জরবদস্তিমূলক লেখার খণ্ডন]", "আল-ক্বওলাল মুক্বনি' ফীর-রাদ্দ আলাল আলবানি আল-মুবতাদী [বিদআতকারী আলবানির মতামত খণ্ডনের বোধযোগ্য ধর্মোপদেশ]" এবং "ইতক্বানাস সুনা'আ ফী তাহক্বীক্ব মা'নাল বিদআ' [বিদআতের অর্থের সঠিক ব্যাখ্যা]"।

৪. মিসরের মুহাদ্দিস মুহাম্মদ আওয়ামা লিখেছেন: "আদব আল-ইখতিলাফ [ইখতিলাফের আদব]"।

৫. মিসরের মুহাদ্দিস মুহাম্মদ সাঈদ মামদুহ লিখেছেন: "উসূলুল তাহাবী বি ইতবাত সুন্নিয়্যাতুস সুবহা ওয়ার রাদ্দ আলাল আলবানি [জিকিরের সময় গুটাযুক্ত তাসবীর ব্যবহারের উত্তম ফায়দা ও আলবানির মতামতের খণ্ডন]" এবং "তানবিহুল মুসলিম ইলা তা'আদ্দিল আলবানি আলা সহীহ মুসলিম [সহীহ মুসলিমের উপর আলবানির আক্রমণ সম্পর্কে মুসলমানদের প্রতি সতর্কবাণী]"।

৬. সৌদী মুহাদ্দিস ইসমাঈল ইবনে আহমদ আল-আনসার লিখেছেন: “তা’আক্কুবাত আলা ‘সিলসিলাতুল আহাদিসাল দ্বায়িফা ওয়াল মাওদু’আ’ লিল আলবানি [আলবানির বই ‘দুর্বল ও জাল হাদিস’ এর একটি সমালোচনা]”, “তাশীহ সালাতুত তারাওয়ী ’ইশরিনা রাক’আতান ওয়ার রাদ্দ ’আলাল আলবানি ফী তাদ’ইফিহ [তারাবী নামায ২০ রাকাআত হওয়ার সঠিক প্রমাণ ও আলবানি কর্তৃক এর গুরুত্ব দূর্বল করার চেষ্টার খণ্ডন]” এবং “ইবাদাতুত তাহাল্লী বিয-যাহাবুল মুহাল্লাক্ব লিন-নিসা’ ওয়ার রাদ্দ আলাল আলবানি ফী তাহরিমিহ [আলাবানী কর্তৃক মহিলাদের স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার অবৈধ সিদ্ধান্তের খণ্ডন]”।

৭. সিরিয়ার আলিম বদরুদ্দীন হাসান জিয়াব লিখেছেন: “আনওয়ারুল মাসাবিহ ’আলা জুলুমাতিল আলবানি ফী সালাতিত্‌ তারাওয়ী [তারাবিহ নামাযের ক্ষেত্রে আলবানির অন্ধকারকে আলোকিত করা]”।

৮. ইউনাইটেড আরব আমিরাতের ধর্মবিষয়ক মন্ত্রী শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল-খাজরানী লিখেছেন: “আল-আলবানি: তাতাররুফাতুহ [আলবানি: তার সীমাতিক্রমতা]”।

৯. জার্দানের আলিম হাসান আলী সাক্কাফ দু’টি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। এর মধ্যে একটি হলো, “তানাকুদাতুল আলবানি আল-ওয়াদিহা ফী মাওয়াক্বা’আ ফী তাশিহাল আহাদিস ওয়া তাদি’ইফিহা মিন আখতা’ওয়া গ্বালতাত [হাদিস শুদ্ধ ও দুর্বল ঘোষণার ক্ষেত্রে আলবানির স্ববিরোধিতা ও ভুল]”।

১০. সিরিয়ার আলিম ফিরাস মুহাম্মদ ওয়ালিদ লিখেছেন: “সুন্নিয়্যাতুল জুমু’আল ক্বাবলিয়্যা [জুমু’আ নামাযের পূর্বের সুন্নাত নামায]”।

আরোও বহু গ্রন্থের তালিকা আমাদের কাছে আছে। উপরে কয়েকটি মাত্র কিতাবের উল্লেখ করলাম।

আলবানি ও বিন বাযের উপর দারুল উলূম দেওবন্দের ফাতওয়া

নিম্নোক্ত ফাতওয়াটি দারুল উলূম দেওবন্দের ‘দারুল ইফতা’ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। ইন্টারনেটে প্রাপ্ত এই ফাতওয়াটির বঙ্গানুবাদ নীচে তুলে ধরছি।

“আমি জানতে চাই শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানি ও বিন বায কি গ্রহণযোগ্য আলিম না তারা গায়র মুকাল্লিদদের অন্তর্ভুক্ত? একজন গায়র মুকাল্লিদ আমাকে একখানা বই দিয়েছেন। এতে উক্ত ব্যক্তিদেরকে সূত্র হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের কিতাবাদি পাঠ করা কি আমাদের জন্য সঠিক হবে?”

“জবাব

(ফাতওয়া : ২৪২/২২১/ঘ=১৪৩৪)

(১-৩) নাসিরুদ্দীন আলবানি সীমালঙ্ঘনকারী, কট্টর গায়র মুকাল্লিদ ছিলেন। এছাড়া তিনি হানাফী মাজহাবের প্রতি সংকীর্ণমনা ছিলেন। তিনি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বাইরে এবং একজন গোমরাহ ব্যক্তি। অরপদিকে শয়াখ বিন বায রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একজন সত্যিকার আলিম ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। তথাপি, কোন কোন ফাতওয়ায় তিনি কট্টরতা দেখিয়েছেন। হাম্বলী মসলকের প্রতি তার অনুরক্ততা থাকায় তিনি কিছু কিছু ফ্রুয়া'তে হানাফী থেকেও ভিন্নমত পোষণ করতেন। সুতরাং নাসিরুদ্দীন আলবানির কিতাব পাঠ করা আপনার জন্য ঠিক হবে না। তবে, আপনি শায়খ বিন বাযের কিতাব পড়তে পারেন কিন্তু সাধারণ হানাফীদের পক্ষে এগুলো পাঠ থেকেও দূরে থাকা উচিৎ।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা’আলা ভালো জানেন।

দারুল ইফতা
দারুল উলূম দেওবন্দ

(ফাতওয়া: ২৪২/২২১/ঘ=১৪৩৪)”

পরিশিষ্ট -১

একনজরে মাজহাব মানার গুরুত্ব

এখন আমরা সবার সুবিধার জন্য মাজহাব মানার গুরুত্ব অতি সংক্ষেপে তুলে ধরছি। আশাকরি এ থেকে সকলেই উপকৃত হবেন।

১. মাজহাব মানা হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম।

২. চার ইমামের মাজহাবের যে কোন একটি মানা ওয়াজিব।

৩. মাজহাব মানার মাধ্যমেই সঠিকভাবে দ্বীন পালন সম্ভব।

৪. মাজহাব মানার অর্থ কুরআন-সুন্নাহর সঠিক অনুসরণ।

৫. মাজহাবের মুজতাহিদ মতলক চার ইমাম কুরআন-হাদিস থেকে চয়ন করে সকলের জন্য আল্লাহর পছন্দসই দ্বীন পালনের পন্থা উদ্ভাবন করে গেছেন। তাঁরা নতুন দ্বীন আবিষ্কার করেন নি।

৬. একমাত্র মাজহাব মানার মাধ্যমেই আল্লাহর হুকুম ও সন্তুষ্টি লাভ হয়।

৭. মাজহাব মানার অর্থ সীরাতুল মুসতাক্বীমের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা।

৮. কুরআন-হাদিস মানার নামই মাজহাব মানা। আর মাজহাব মানার নামই কুরআন-হাদিস মানা।

৯. দ্বীন সঠিকভাবে অনুসরণের ক্ষেত্রে সর্বসাধারণের জন্য মাজহাব সবকিছু সহজ-সরল করেছে।

১০. চার মাজহাবের মধ্যে সামান্য মতানৈক্য 'রহমত' হিসাবে মনে করা হয়। মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে কোন কালেই অনৈক্যের কারণ মাজহাব ছিলো না এবং হবেও না। বরং চারটি মাতমত থাকায় দ্বীন পালন মুসলমানদের জন্য সহজ হয়েছে।

মাজহাব না মানার কুফল

এবার আমরা মাজহাব না মানার কয়েকটি কুফল সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরছি।

১. মাজহাব ছাড়া সঠিকভাবে আল্লাহর হুকুম পালন অসম্ভব।

২. মাজহাব না মানলে আল্লাহর পছন্দসই দ্বীন পালন সম্ভব হয় না।

৩. মাজহাব ছাড়া সঠিকভাবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা মানা সম্ভব হয় না।

৪. মাজহাব না মানলে পথভ্রষ্টতার রাস্তা উন্মুক্ত হয়ে যায়।

৫. দ্বীন পালনে মতানৈক্য ও অরাজকতার সৃষ্টি হয় কারণ, মাজহাব না মানার অর্থ সবাইকে 'মুজতাহিদ' হয়ে যাওয়া! অর্থাৎ নিজে নিজে কুরআন-হাদিস চয়ন করে মাসআলা-মাসাঈল বের করতে হয়। যা আদৌ সম্ভব নয়।

৬. মাজহাব না মানলে 'নফসে আম্মারা' থেকে সৃষ্ট খাহিশাত পূরণের দিকে মানুষ ঝুকে পড়ে, যা পবিত্র কুরআন-হাদিসে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

৭. মাজহাব না মানলে দ্বীন পালনে বিদআতের রাস্তা উন্মুক্ত হয়ে পড়ে, যা কুরআন-হাদিসে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

উচ্চ পর্যায়ের উলামায়ে কিরাম ছিলেন মাজহাবের অনুসারী

আগের যুগের প্রসিদ্ধ মহাত্মন ইসলামী চিন্তাবিদরা নিজে নিজে দ্বীন অনুসরণের যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও তাক্বলিদ তথা মাজহাব অনুসরণ করেছেন। নীচে প্রসিদ্ধ ক'জন মহাত্মনের নাম উল্লেখ করছি।

ইমাম আবু জাফর তাহাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (হানাফী)

ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (শাফিঈ)

ইমাম আবু হামিদ গায্যালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (শাফিঈ)

ইমাম ইবনে আবদুল বার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মালিকী)

ইমাম আবু যাকারিয়া নববী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (শাফিঈ)

ইমাম আবু বকর জাস্‌সাস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (হানাফী)

ইমাম ইবনে হুমাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (হানাফী)

ইমাম আবু ইসহাক শাতিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মালিকী)

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (শাফিঈ)

ইমাম আবুল আব্বাস কুরতুবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মালিকী)

ইমাম বদরুদ্দীন আইনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (হানাফী)

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (শাফিঈ)

ইমাম ইবনে আবিদীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (হানাফী)

ইমাম ইবনে রাজব হাম্বলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (হাম্বলী)

ইমাম ইবনে কাছীর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (শাফিঈ)

এছাড়া সিহা সিত্তার হাদিস সংকলক মহাত্মন মুহাদ্দীসিনে কিরাম অর্থাৎ ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম ইবনে মাজাহ ও ইমাম নাসাঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম তাক্বলিদ করেছেন বলে অনেক প্রমাণ মিলে। অনুরূপ অন্যান্য হাদিস সংকলক মুহাদ্দীসিনে কিরামও তাক্বলিদ করে গেছেন।

পরিশিষ্ট ২

ইজতিহাদের যোগ্য কারা

আমাদের মহাত্মন চার ইমাম তথা ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহামাতুল্লাহি আলাইহিমের মধ্যে নিম্নোক্ত মৌলিক যোগ্যতা ছাড়াও আরো অনেক গুণ বিদ্যমান ছিল। তাঁদের পর থেকে আজ পর্যন্ত অনুরূপ গুণসম্পন্ন কোন আলিম জন্ম নেন নি। তথাপি কিয়ামত পর্যন্ত উক্ত গুণাবলীসম্পন্ন কারো আগমন ঘটলে তাঁর জন্য তাক্বলিদ ওয়াজিব হবে না। মোটকথা ইজতিহাদের দরোজা বন্ধ হয় নি বটে, কিন্তু সঠিক যোগ্যতা ছাড়াও শরীয়ত কাউকে ইজতিহাদ করার অনুমতি দেয় নি।

আজকের যুগে কেউ যদি ইজতিহাদের আশা পোষণ করেন তাহলে তার মধ্যে নিম্নোক্ত প্রত্যেকটি বিষয়ের উপর পূর্ণ জ্ঞান থাকতে হবে। ইজতিহাদ কয়েকজন মিলে সম্ভব নয়। মুজতাহিদ একজনকেই হতে হয়। ব্যাপারটি বুঝার জন্য একটি উদাহরণ দেওয়া যায়। একটি গাধার মধ্যে অন্তত বিশটি বকরির সমপরিমাণ শক্তি বিদ্যমান। এখন ঐ গাধাটি যে পরিমাণ বোঝা বহন করতে সক্ষম, সে পরিমাণ বোঝা সকল বকরি মিলে বহন করতে সক্ষম হবে কি? কখনো নয়। যা হোক, ইজতিহাদের যোগ্যতা অর্জনের শর্তাবলী উল্লেখ করছি।

১. শরয়ী বিধি-বিধান সংক্রান্ত কুরআন শরীফের সকল আয়াত ও সনদসহ সকল হাদিস মুখস্ত থাকতে হবে।

২. পবিত্র কুরআনের আয়াত নাজিলের সময়, প্রেক্ষাপট, কারণ, উপলক্ষ ইত্যাদি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখতে হবে।

৩. কোন্ হাদিস কোন্ সময়, কোন্ প্রেক্ষাপট, উপলক্ষ এবং কারণে বর্ণিত হয়েছে সে সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান থাকতে হবে।

৪. হাদিস বর্ণনাকারীদের জীবন ও কর্মের পূর্ণ ইতিহাস জানতে হবে।

৫. কুরআন শরীফের কোন্ আয়াত অপর আরেক আয়াত দ্বারা রহিত হয়েছে এবং তার কারণ কি- তা-ও জানতে হবে।

৬. কোন্ হাদিস কোন্ কারণে অপর হাদিস দ্বারা রহিত হয়েছে তার উপর পূর্ণ জ্ঞান থাকতে হবে।

৭. কুরআন শরীফের একাধিক আয়াতের মধ্যে বৈপরিত্য দেখা দিলে তার সমাধান কিভাবে সম্ভব সে সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখতে হবে।

৮. হাদিস শরীফে অনুরূপ বৈপরিত্য দেখা দিলে তার সমাধান কিভাবে হবে তার উপর সঠিক পূর্ণ জ্ঞান থাকতে হবে।

৯. উসূলে তাফসীর ও উসূলে হাদিসের উপর গভীর অধ্যয়ন ও জ্ঞান থাকতে হবে।

১০. মুজতাহিদ মতলক তথা চার ইমামের গবেষণার উপর গভীর জ্ঞান রাখতে হবে।

১১. আরবী ভাষার উপর ব্যাকরণসহ অর্থাৎ সরফ, নাহু, বালাগাত, মানতিক ইত্যাদির পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান থাকতে হবে।

১২. আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান।

১৩. প্রাচীন আরবী সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান।

১৪. আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক দিক দিয়ে মুত্তাকী, পরহেজগার, ইবাদতগুজার, খোদাভীরুতা ইত্যাদি উত্তম গুণের অধিকারী হতে হবে।

পরিশিষ্ট - ৩

অন্যান্য লা-মাজহাবী ফিতনাবাজ সম্পর্কে উলামায়ে কিরামের মন্তব্য

এ গ্রন্থে আমরা এ যুগের সর্বাধিক মারাত্মক লা-মাযহাবী ফিতনা ‘সালাফিবাদের’ স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করেছি। তবে আজকের অনুরূপ আরো তিনটি ফিতনা মুসলিম উম্মাহ্কে অভ্যন্তর থেকে ভীষণ ক্ষতিসাধন করছে। এগুলো হলো:

১. আহলে হাদিস, ২. ওয়াহাবীবাদ ও ৩. মওদুদীবাদ।

নাম তিনটি হলেও এদের আমল ও আক্বীদার মধ্যে মিল বিদ্যমান। এছাড়া ভারতে ওয়াহাবীদের দৌরাত্ম্য যখন শুরু হয় তখন ছিলো বৃটিশ রাজ। নজদের আবদুল ওয়াহহাবের নামকে মুছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে নেতৃস্থানীয় লা-মাজহাবী আলিম মাওলানা ইসমাইল দেহলবী বৃটিশদের নিকট আবেদন করেন: আমাদেরকে ওয়াহাবী না বলে ‘আহলে হাদিস’ নামে সম্বোধন করা হোক। তার এই আবেদন মঞ্জুর করা হয়।[২৮২] সুতরাং এ থেকে স্পষ্ট হলো ‘আহলে হাদিস’ ওয়াহাবী ফিতনারই অংশ। এছাড়া ‘সালাফি’ ও ‘ওয়াহাবী’ একই বৃক্ষের দু’টি শাখা মাত্র। উভয় দল আবদুল ওয়াহহাব নজদী ও পরবর্তীতে আবদুল্লাহ বিন বায, নাসিরুদ্দিন আলবানি, মুহাম্মদ আবদুহ, জামালুদ্দিন আফগানী, রশিদ রাজা এবং ইবনে উসাইমিনকে ইমাম হিসাবে গণ্য করে। আমাদের উপমহাদেশে মওদুদীবাদও ওয়াহাবীবাদ এবং সালাফিবাদের একটি শাখা মাত্র। কারণ, মওদুদী ফ্রিমেসন মুহাম্মদ আবদুহ দ্বারা চরমভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। এছাড়া উক্ত তিন ফিতনার মতো তিনিও ছিলেন ‘লা-মাজবাহীদের’ অন্তর্ভুক্ত।

এরা যে মূলত ভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট ক’টি ফিতনা, তা এদের সম্পর্কে মুহাক্কিক উলামায়ে কিরামের নিম্নে উল্লেখিত মতামত ও ফাতওয়াসমূহ পাঠ করলেই সকলে অবগত হবেন।

---

[২৮২] মির্জা হাইরাত দেহলবী প্রণীত ‘হয়াতে তায়্যিবাহ’।

লা-মাজহাবীদের ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের

ফাতওয়াহ ও মতামত

১. গায়র মুকাল্লিদ আহলে হাদিসপন্থীরা চরম বিদআতী। আর এরূপ বিদআতীদের সাথে ব্যবহার কিরূপ হতে পারে তার দিক-নির্দেশা দিয়েছেন হযরত মাওলানা আবদুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তাঁর প্রণীত তাফসীরে আজিজীতে লিখেন: "হাফায়িকে তানজিল কিতাবে উল্লেখিত আছে যে, হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ তাইসিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, যার ঈমান ও তাওহীদ খাঁটি, সে কখনো বিদআতীদের সাথে সংস্রব রাখবে না। তার সাথে বসবে না, পানাহার করবে না। বরং তার সাথে দুশমনী প্রকাশ করবে। যে ব্যক্তি কোনো বিদআতীর সাথে সংস্রব রাখবে, আল্লাহ তার ঈমানের মাধুর্য অন্তর থেকে বের করে নেবেন। যে ব্যক্তি বিদআতীর সাথে মুহাব্বত রাখবে তার অন্তর থেকে ঈমানের নূর চলে যাবে।"[২৮৩]

২. ইমাম তাহতাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রণীত সুবিখ্যাত কিতাব 'দুররুল মুখতার' গ্রন্থের টীকায় আছে: "হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী অনুযায়ী উম্মতে মুহাম্মদীর ৭৩ ফিরকার মধ্যে যে একটি মাত্র ফিরকা নাজাতপ্রাপ্ত ও জান্নাতী, তা অবশ্যই চার মাজহাবের অন্তর্ভুক্ত [এখানে উল্লেখ্য যে, চার মাজহাব কোনো আলাদা ফিরকা নয়-বরং এই চার মাহজাবপন্থী সকলেই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতভুক্ত দল]। এই চার মাজহাব হলো হানাফী, মালিকী, শাফিঈ ও হাম্বলী। যারা এই চার মাজহাবের বহির্ভূত, অর্থাৎ গায়র মুকাল্লিদ তারাই বিদআতী ও জাহান্নামী।[২৮৪]

৩. বিখ্যাত ফাতওয়ার কিতাব, ফাতওয়ায়ে আলমগিরী ও জামিউর রজুম কিতাবে আছে: শাফিঈ মাযহাবপন্থী ইমামের পেছনে নামায পড়া জায়িয, যদি সেই ইমাম হানাফী বা অন্য কোন মাজহাবের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ না করেন। অর্থাৎ বাকী তিন মাজহাবও যে সঠিক, তা তাকে মানতে হবে। এই ফাতওয়া থেকে বুঝা গেল, লা-মাজহাবী ইমামের পেছনে নামায জায়িয হবে

[২৮৩]খোন্দকার মাওলানা মো: বশির উদ্দিন প্রণীত, 'চারি মাজহাব (সমস্যা ও সমাধান)' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।
[২৮৪]খোন্দকার মাওলানা মো: বশির উদ্দিন প্রণীত, 'চারি মাজহাব (সমস্যা ও সমাধান)' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।

না। কারণ তারা সকল মাজহাবের প্রতি শুধু বিদ্বেষ পোষণ করেন না, বরং ঘোর বিরোধিতা করেন। সালাফি ও আহলে হাদিসপন্থীরা তো প্রকাশ্যে হানাফী মাজহাবপন্থীদেরকে গালিগালাজ করেন। এমনকি হানাফীদেরকে তারা 'মুশরিক', 'ফাসিক', 'বিতআতী', 'জাহান্নামী' ইত্যাদি বলেও গালি দেন।

৪. আল্লামা শামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দুররুল মুখতার গ্রন্থের টীকায় মন্তব্য করেন: আমাদের যুগে নজদের আবদুল ওয়াহাবের পুত্র মুহাম্মদের অনুসারীরা আগের যুগের বাতিল ফিরকা খারিজীদের তুল্য। ওরা হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধাচরণ করে তাঁর দল থেকে বহিস্কৃত হয়েছিল। লা-মাজহাবীরাও ঠিক অনুরূপ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিরুদ্ধাচরণ করে মাজহাব হতে বের হয়েছে। সুতরাং এরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের প্রকৃত বিরুদ্ধবাদী দল। কারণ হলো, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত মানেই চার মাজহাবের যে কোন একটির অনুসারী। যারা কোনো মাজহাবভুক্ত নন তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতভুক্তও নন। সুতরাং লা-মাজহাবীরা রাফিজী, খারিজী, মু'তাজিলা, কাদরিয়া, মুরযিয়া ইত্যাদি বাতিল ফিরকাসমূহের অন্তর্ভুক্ত আরেকটি বাতিল ফিরকা। নাজাত পেতে হলে উল্লেখিত চার মাজহাবের যে কোন একটির অনুসরণ করতেই হবে।

৫. আল্লামা তাহতাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দুররুল মুখতার কিতাবের টীকায় ঘোষণা দিয়েছেন: হে মু'মিনগণ! তোমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত নামক নাজাতী দলের অনুসারী হয়ে যাও। কেননা আল্লাহর সাহায্য, হিফাজত ও তাওফিক তাদের অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে। আল্লাহ থেকে আসমানী অসন্তুষ্টি ও কঠোরতা তাদের বিরোধিতার মধ্যেই রয়েছে। এই নাজাতী দল হলো হানাফী, মালিকী, শাফিঈ ও হাম্বলী, এই চার মাজহাবের অন্তর্গত। অতএব যারা এই চার মাজহাব থেকে বহির্ভূত এরাই বিদআতী ও জাহান্নামী ফিরকাভুক্ত।

৬. শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'উক্বদুল জীদ' কিতাবে উল্লেখ করেন: জেনে রাখো, চার মাজহাবের যে কোন একটিকে আঁকড়ে ধরার মধ্যে বিরাট ফায়দা নিহিত। আর লা-মাজহাবী হওয়ার মধ্যে বিরাট ফিতনা-ফাসাদ রয়েছে। মাজহাবপন্থীরাই খাঁটি মুসলমানের

সর্ববৃহৎ দল। এরূপ বিরাট দল সম্পর্কে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘেষাণা করেছেন: "তোমরা মুসলমানদের বড় দলের অনুসারী হও [তাহলে সঠিক পথ পাবে]। এ থেকে যে আলাদা থাকবে সে দোযখে পতিত হবে।" [হাদিস]

৭. হানাফী শায়খ ইমাম মুহাম্মদ আমিন ইবনে আবিদীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "আমাদের যুগে ইবনে আবদুল ওয়াহহাব নজ্‌দ থেকে আবির্ভাব হয়েছেন। তিনি হারামাইন শরীফাইনে আক্রমণ করেন। নিজেকে হাম্বলী মাজহাবপন্থী বলে দাবী করেছেন। কিন্তু এটাও দাবী তুলেছেন, এ যুগে একমাত্র তিনিই সত্যিকার মুসলমান! বাকী সকলেই মুশরিক! তিনি বলেছেন, আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতীদের হত্যা করা বৈধ। অবশ্য আল্লাহ তা'আলা ওয়াহাবীদের ১২৩৩ হিজরী সনে ধ্বংস করে দেন মুসলিম সৈন্যদের হাতে।"[২৮৫]

৮. শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "ইসলামী ১৩তম শতকে ইবনে আবদুল ওয়াহহাব নজদে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তার চিন্তাভাবনা ভ্রান্ত ছিলো। তার ভুল বিশ্বাসগুলো ছিলো দুর্নীতিপ্রবণ। এসব বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে তিনি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভুক্ত মুসলমানদের হত্যার সূত্রপাত ঘটান।"[২৮৬]

৯. মাওলানা আবদুল হাকিম মুরাদ লিখেছেন: "ইবনে আবদুল ওয়াহহাব ইবনে তাইমিয়াকেও হার মানিয়েছেন। আরবের নজদের মরু অঞ্চলে তিনি বেড়ে ওঠেন। মূল ইসলামী ফিক্‌হ শাস্ত্রের উপর তার দক্ষতা খুব সীমিত ছিলো। বাস্তবে যখন তার দাওয়া আত্মপ্রকাশ করে, তিনি সীমাতিক্রম করতে শুরু করেন। সমকালীন উলামা-মাশায়িখ ও মুফতিয়ানে কিরাম তার বিরুদ্ধে 'নজদ' এর উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই প্রখ্যাত হাদিসের কথা উল্লেখ করেছেন: হযরত ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম বলেন, "হে আল্লাহ! আমাদের সিরিয়ার প্রতি অনুগ্রহ করো। হে আল্লাহ! আমাদের ইয়ামনের প্রতি অনুগ্রহ করো।" উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম বললেন, 'এবং আমাদের নজদের

[২৮৫]তাঁর রচিত 'হাশিয়া রাদ্দুল মুখতার', খ.৩, পৃ: ৩০৯

[২৮৬]তাঁর রচিত 'শিহাব আস-সাক্বিব', পৃ: ৪২।

প্রতি, হে রাসূলাল্লাহ!' কিন্তু তিনি আবার বললেন, "হে আল্লাহ! আমাদের সিরিয়ার প্রতি অনুগ্রহ করো। হে আল্লাহ! আমাদের ইয়ামনের প্রতি অনুগ্রহ করো।" আবার উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম আবদারের সুরে বললেন, 'এবং আমাদের নজদ, ইয়া রাসূলাল্লাহ!' ইবনে উমর বলেন, তৃতীয়বার তিনি বললেন: "সেখানে ভূমিকম্প ও ফিতনা! ওখান থেকেই শয়তানের শিং বেরুবে।"[২৮৭] এটা ভাবার বিষয় যে, ইসলামের পুরাতন ভূমিতে একমাত্র নজ্‌দ কখনো কোনো উচ্চ পর্যায়ের ফকীহ সৃষ্টি করে নি।[২৮৮]

১০. ওয়াহাবী-সালাফি লা-মাজহাবীরা 'ইমাম' হিসাবে মেনে নিয়েছেন আরেক আবদুল ওয়াহহাবপন্থী 'স্কলার' মুহাম্মদ ইবনে আলী শওকানী নামক এক ব্যক্তিকে। প্রাথমিক জীবনে তিনি ছিলেন ইয়ামনে 'জাইদী' নামক শিয়াদের একটি ফিরকার নেতৃস্থানীয় স্কলার। পরে তিনি দাবী করেন, শিয়াদের পন্থা পরিহার করেছেন। কিন্তু সমকালীন উলামা তার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেন যখন তিনি 'তাক্বলিদ হারাম' বলে ফাতওয়া জারি করলেন। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আক্বাইদী বিষয়ের উপর তার বিরূপ মন্তব্য, লেখা ও বক্তব্যের সমালেচনাও করেন যুগের শীর্ষস্থানীয় হক্কানী উলামায়ে কিরাম। কোনো কোনো আলিমের মতে তিনি শিয়াদের জায়িদিয়া-মুতাজিলী আক্বীদাকে ধারণ করেছেন মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত। অবশ্য এ ব্যাপারে সবাই অবগত যে, এই ভ্রান্ত ব্যক্তি সাহাবায়ে কিরামের ইজমা ও সাহাবায়ে কিরামের ফাতওয়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন।[২৮৯]

[২৮৭] সহীহ বুখারী।

[২৮৮] আবদুল হাকিম মুরাদ, 'ইসলামিকা', পৃ: ৯।

[২৮৯] দেখুন, আনওয়ার আহমদ কাদিরী প্রণীত, 'ইসলামিক জুরিসপ্রোডেন্স ইন দ্যা মডার্ণ ওয়ার্লড'. পৃ: ১৪২।

মওদুদী ও মওদুদীবাদের উপর উলামায়ে কিরামের অভিমত

আমরা এই গ্রন্থে পাক-ভারত-বাংলাদেশে উদ্বুদ্ধ আরেক মারাত্মক ফিতনা 'মওদুদীবাদের' উপর তেমন কিছু বলি নি। মওদুদীবাদীরা 'লা-মাজহাবী' নয় বলে দাবী করেন। কিন্তু তাদের ইমাম মওদুদী নিজে বলেছেন, 'জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য তাকলীদ করা তথা চার মাযহাবের কোন এক মাযহাব অনুসরণ করা নাজায়েয ও গোনাহের কাজ। বরং নাজায়েয ও গোনাহর চেয়েও জঘন্যতম।'[২৯০] পাঠকরা এবার বিবেচনা করুন, মওদুদীবাদীরা লা-মাজহাবী কি না?

যাক, মওদুদী ফিতনা সম্পর্কে জগতখ্যাত উলামায়ে কিরাম যুগ যুগ ধরে আমাদেরকে সতর্ক করে যাচ্ছেন। নিম্নে প্রয়োজনীয় সূত্রসহ এসব বাণী ও মন্তব্যের কয়েকটি মাত্র উদ্ধৃতি তুলে ধরা হলো। পাঠকরা আশাকরি এ থেকে বুঝতে সক্ষম হবেন, মওদুদী বিপর্যয় কতো মারাত্মক ও গভীর।

১. হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জনৈক ব্যক্তি মওদুদী সাহেবের পত্রিকা 'তরজমান' পাঠ করতে দিলেন। মাওলানা সাহেব কয়েকটি মাত্র লাইন পাঠ করেই মন্তব্য করলেন: "কথাগুলো নাজাসাত মিশ্রিত করে বলা হচ্ছে! বাতিলপন্থীদের কথা এরকমই হয়ে থাকে।" এরপর তিনি পত্রিকাটি বন্ধ করে রেখে দিলেন।[২৯১]

২. শায়খুল ইসলাম সাইয়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে এক ব্যক্তি মওদুদী সাহেব সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি জবাব দিলেন: "তিনি ও তার দল পথভ্রষ্ট। তাদের আকাঈদ আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাআত এবং কুরআন-হাদিসের পরিপন্থী।" অন্য আরেক প্রশ্নের উত্তরে বলেন: "এই জামাআতের সাথে মিলিত হয়ে কাজ করা এবং এদের সাহায্য-সহায়তা করা জায়িয নয়। এই জামাআতের প্রচেষ্টা আসলে ইসলামের জন্য নয়, বরং মওদুদী সাহেব প্রবর্তিত বাতিল নামধারী ইসলামের জন্য। এসকল লোক সাধারণ মুসলমানদেরকে ধোঁকা দেয় এবং নিজেদের প্রতি বাধ্য করার জন্য ইসলামের নাম নিয়ে থাকে। দ্বীনি জ্ঞানে অপরিপক্ক ব্যক্তিরা মনে করে 'এটাই আসল ইসলাম ও দ্বীন'। এদের বই-পুস্তকসমূহে এমন সব বদ-দ্বীনি ও ইল্‌হাদের কথা বিদ্যমান, যা বাহ্যিক দৃষ্টিসম্পন্ন ও দ্বীন

---

[২৯০] তার প্রণীত 'রাসায়েল মাসায়েল' ১/২৩৫; আবদুল মুকিত মুখতার রচিত 'আধুনিকতা ও বিপর্যয়' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।

[২৯১] তরজমানুল ইসলাম, লাহোর, ৩০ ডিসেম্বর ১৯৫৭ ঈসায়ী।

সম্পর্কে অপর্যাপ্ত জ্ঞানীরা বুঝতে সক্ষম নয়। মোটকথা, হযরত রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দ্বীন-ইসলাম যার উপর উম্মতে মুহাম্মদী সাড়ে তেরোশ' বৎসর যাবৎ আমল করে আসছেন তা থেকে এরা একেবারেই ভিন্ন।

আপনাদের উপর আমার আশা যে, এ ফিতনা থেকে মুসলমানদেরকে বাঁচানোর জন্য নিশ্চুপ, অবহেলা ও উদারতার ভাব যেনো জায়িয না ভাবেন।"[২৯২]

৩. শাইখুল হাদিস মাওলানা জাকারিয়া কান্ধলভী মুহাজিরে মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "মওদুদী জামাআত এবং তাদের সাহিত্য সাধারণ মানুষের উপর এমন প্রভাব বিস্তার করে যে, হিদায়াতের ইমামগণের অনুসরণ থেকে তাদেরকে স্বাধীন ও সম্পর্কহীন করে দেয়। এটা সাধারণ্যের জন্য ধ্বংস ও গুমরাহীর কারণ বটে। যেসব হাযারাত এটাকে সাধারণ ব্যাপার ভাবেন, তারা হয়তো এই জামাআতের বাড়াবাড়ির সাথে মেলামেশার সুযোগ পান নি। ফলে তারা এর ক্ষতির মাত্রাও অনুধাবন করেন নি। মোটকথা, আমি এই দলে শরীক হওয়া বা তাদের সাহিত্য পাঠকে মুসলমানদের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর মনে করি।"[২৯৩]

৪. মওদুদী ফিতনার উপর বাংলা ভাষায় প্রথম গ্রন্থ প্রণয়ন করেন খলীফায়ে মাদানী মাওলানা আব্দুল মতিন চৌধুরী শায়খে ফুলবাড়ি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি লিখেছেন: "মওদুদী সাহেব বলেছেন, ইসলাম কোন ধর্ম নয় বরং ইসলাম হলো 'পরিবর্তনশীল পরিকল্পনা'। অর্থাৎ যুগের পরিবর্তনের সাথে ইসলামও পরিবর্তন হবে। আধুনিক যুগের কতিপয় শিক্ষিত সমাজের অভিমতও অনুরূপ। তাই মওদুদী সাহেব যুগের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার জন্য কুরআন ও হাদীসের এমন নিয়ম-কানুন রচনা করেছেন যা আমাদের অতীতের প্রত্যেক যুগের বিপরীত। ... মওদুদী সাহেবের মধ্যে এই ভ্রান্ত মৌলিক ধারণার জন্ম নেওয়ার ফলেই তার 'তাফসীর' [তাহফিমুল কুরআন] দেখলে এরূপ বোধ হয়, তার তাফসীর নিজের মস্তিষ্কের পরিকল্পনা বৈ কিছু নয়।"[২৯৪]

৫. মুফতিয়ে আযম হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কিফায়াতুল্লাহ দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "এই জামাআতের প্রধান ও প্রতিষ্ঠাতা আবুল আলা মওদুদীকে আমি চিনি। তিনি কোনো নির্ভরযোগ্য আলিমের ছাত্র কিংবা ফায়েজ প্রাপ্ত ব্যক্তি নন। যদিও তার দৃষ্টিতে নিজস্ব অধ্যয়নের প্রশস্ততা বিস্তৃত, তবে দ্বীনি

---

[২৯২] মওদুদী সাহেব আকাবিরে উম্মাত কী নযর মে, হাকীম মুহাম্মদ আখতার, পৃ: ৮-৯।

[২৯৩] প্রাগুক্ত।

[২৯৪] সত্যের মাপকাঠি, পৃ: ৫৫, প্রথম প্রকাশ: ১৯৫৮ ঈসায়ী।

ক্ষেত্রে তিনি দুর্বল। তার মাঝে 'ইজতিহাদের' ভাবও পরিলক্ষিত হয়। এ কারণে তার রচনাবলীতে বড়ো বড়ো উলামায়ে কিরাম, এমনকি সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুম সম্পর্কেও আপত্তিকর বক্তব্য দেখতে পাওয়া যায়। তাই মুসলমানদেরকে এই আন্দোলন থেকে দূরে থাকা একান্ত জরুরী। এ আন্দোলনের সাথে মেলামেশা, সম্পর্ক রাখা ও ইত্তিহাদ করা উচিৎ নয়। তার [মওদুদী সাহেবের] রচনাসমূহ বাহ্যিক অবস্থায় মনঃপুত ও ভালো অনুভূত হয়। এতে এমন ধরনের প্রভাব দিলের উপর স্থায়ী হয় যে, যার ফলে মন-মস্তিষ্ক 'স্বাধীন' হয়ে যায়। পরিণামে পাঠকের মনে হক্কানী বুজুর্গানে ইসলামের প্রতি খারাপ ধারণার জন্ম নেয়।"[২৯৫]

৬. মুফতিয়ে আযম আল্লামা মুহাম্মদ শফী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "আমার মতের উদ্ধৃতির জন্য কেবলমাত্র এই লেখার উপর নির্ভর করা যাবে: আমার কাছে মাওলানা মওদুদী সাহেবের বুনিয়াদী ভুল এটাই যে, তিনি আক্বাইদ ও মাসাইলে নিজ ইজতিহাদের অনুসরণ করেন, যদিও তা জমহুর উলামায়ে সলফের খেলাফ হয়ে থাকে। অথচ ইজতিহাদের স্তরে উন্নীত হওয়ার জন্য যেসব শর্ত পূরণের প্রয়োজন, তা আমার দৃষ্টিতে তার মধ্যে মোটেই বিদ্যমান নেই। এই বুনিয়াদী ভুল থাকার কারণে তার সাহিত্যেও অনেক ভ্রান্তি এবং জমহুর উলামায়ে আহলে সুন্নাতের পরিপন্থী কথা দেখতে পাওয়া যায়।"[২৯৬]

৭. হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এক সময় জামাআতে ইসলামীর সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। পরে এই জামাআতের মারাত্মক ভ্রান্তি তার নিকট ধরা পড়ে। তিনি তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে 'ভুল সংশোধন' শিরোনামে একটি বই লিখেন। এই বই থেকে নিম্নে কয়েকটি উদ্ধৃতি তুলে ধরছি।

(ক) ফরিদপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মওদুদীর তিন মূলনীতি বা দস্তর উল্লেখ করে বলেন: " ... কথা কয়টি কত সুন্দর! আমরা মনে করিলাম, শিরক বিদআতের সব দূর হইয়া গেল, তৌহীদের আলোকে জগৎ আলোকিত হইয়া উঠিল। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী অন্তঃদৃষ্টিসম্পন্ন আলিমগণ বুঝিলেন মনে হয় এতে যেন কি তিক্ত বিষাক্ত বিষ মাখানো আছে। বছর তিরিশেক পরে যখন ঐ গাছ শাখা-প্রশাখা ফুল-পাতা ছাড়িল তখন আমরা যাহারা স্থূলদর্শী ছিলাম তাহারাও বুঝিলাম, ইহা তো লেংড়া আম নয়, ইহা তিক্ত বিষাক্ত বিষ বৃক্ষের বিষ ফল। বিষ বৃক্ষও সাধারণ বিষ বৃক্ষ নয়, যাহাতে মানুষের দৈহিক জীবন নাশ করে বরং ইহা এমন বিষ বৃক্ষ যাহাতে মানুষের রূহানী জিন্দেগী ধ্বংস করে এবং মূল ঈমানকে বিনষ্ট করে। সেই বিষ বৃক্ষ

[২৯৫] মাকতুবে হিদায়াত, পৃ: ২১।
[২৯৬] মওদুদী সাহেব আকাবিরে উম্মাত কী নযর মে, পৃ: ২০।

কি? সেই বিষ বৃক্ষ অর্থাৎ অতি গোপনে অতি সন্তর্পণে সাহাবায়ে কিরামের উপর থেকে বিশ্বাস উঠাইয়া দেওয়া। আর সাহাবাদের উপর থেকে বিশ্বাস উঠে যাওয়ার অর্থই কুরআন হাদিস থেকে বিশ্বাস উঠে যাওয়া এবং কুরআন হাদিস থেকে বিশ্বাস উঠে যাওয়ার অর্থই ঈমানহারা হইয়া চিরজাহান্নামী হওয়া।"

(খ) আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাআতের আইম্মায়ে মুজতাহিদীন, মুহাদ্দিসীন ও সমস্ত বুজুর্গানে দ্বীন এ ব্যাপারে একমত পোষণ করিয়াছেন যে, মুসলমানদের আক্বীদা হলো: "হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিন্দুমাত্র সুহবতও যাহারা [ঈমানসহ] লাভ করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে কাহারও (নিম্নতম একজনেরও) গুণচর্চা ব্যতিরেকে দোষচর্চা আমরা করিব না। ইহা আমাদের ঈমান ও ধর্মের একটি প্রধান অঙ্গ। সমস্ত আহলে সুন্নত ওয়াল জাময়াতের আক্বীদার কিতাব সর্বমান্য 'শরহে আক্বীদাতুত্ তাহাবি'র (شرح عقيدة الطحاوى) ৩৯৬ পৃষ্ঠায় ইজমায়ী আক্বীদা হিসাবে উল্লেখ রহিয়াছে-

ولانذكرهم الا بخير وحبهم دين وايمان واحسان

আমাদের উপর ওয়াজিব আমরা কোন একজন সাহাবারও গুণচর্চা ব্যতীত দোষচর্চা না করি, কারণ সাহাবা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমদের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি এবং মুহাব্বত রাখা আমাদের ধর্মের ও ঈমানের প্রধান অঙ্গ এবং আধ্যাত্মিক জগতে আল্লাহর নৈকট্য লাভের প্রধান জরিয়া (অবলম্বন)।"

হযরত ফরিদপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উক্ত আক্বীদা সম্পর্কে আরেকটি বিখ্যাত কিতাব থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "আক্বায়িদের বিখ্যাত কিতাব আল-মুছামারার ৩১৩ পৃষ্ঠায় সাহাবা রাদ্বিআল্লাহু আনহুমদের দর্জা নির্ণয় করিয়া বলা হইয়াছে-

واعتقاد اهل السنة والجماعة تزكية جميع الصحابة وجوبا باثبات العدالة لكل منهم والكف عن الطعن فيهم والثناء عليهم

মর্মার্থ: কোন মুসলমান সুন্নত জামাআতভুক্ত থাকিতে চাহিলে তাহার উপর ওয়াজিব হইবে- সমস্ত সাহাবাগণের প্রত্যেক সাহাবীকে সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ, মুত্তাক্বী-পরহেজগার, ইসলামের ও উম্মতের স্বার্থকে ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থান দানকারী মনে করিতে হইবে এবং কোন একজন সাহাবীর প্রতিও কটাক্ষপাত করা জায়িয হইবে না, বরং সকলেরই গুণচর্চা করিতে হইবে; দোষচর্চা কাহারও জায়িয

হইবে না। যদি কেহ এর খেলাপ করে তবে সে আর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতভুক্ত থাকিতে পারিবে না, খারিজ হইয়া যাইবে।' ... খবরদার! ইহাকে [অর্থাৎ উক্ত মাসআলাটিকে] কেহ হালকা মনে করিবেন না।"[২৯৭]

৮. খলীফায়ে শাইখুল ইসলাম মাদানী, হাটহাজারী মাদ্রাসার সম্মানিত মহাপরিচালক হযরত শাহ আহমদ শফী দামাত্‌বারাকাতুহুম বলেন: " ... আমরা বহুবার মওদুদীপন্থী তথা জামাআতের ধারক-বাহকদেরকে আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাআতের আক্বীদা পরিপন্থী লিখাসমূহ পরিহার করে বাংলাদেশের মত শান্তিকামী মুসলিম জনগোষ্ঠির কাতারে আসার আহ্বান জানিয়েছিলাম। কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, তারা বার বার ঐক্যের ডাক দিয়েও আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাআতের আক্বীদা পরিপন্থী মত ও পথ অনুসরণ করে নবী-রাসূল, সাহাবা প্রেমিকদের মাঝে ক্ষোভ সৃষ্টি করে অনৈক্য বাড়িয়েই চলছে। আমরা তাদের এহেন ধৃষ্টতামূলক আচরণের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। নায়েবে রাসূল হিসাবে হক কথা বলা ও লিখা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব।"[২৯৮]

৯. মুফতি রশীদ আহমাদ লুদিয়ানবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "১. জামাআতে ইসলামী আহলে সুন্নাত বহির্ভূত এবং নিজস্ব নির্ধারিত আক্বাইদ দ্বারা সাধারণ মুসলমান থেকে পৃথক একটি আলাদা ফিরকা। ২. ওদের কোন প্রকার সাহায্য করা জায়িয নয়। ৩. ওদের সাথে আত্মীয়তা করা বৈধ নয়। ৪. এমন [আক্বীদায় বিশ্বাসী] ব্যক্তিকে ইমাম বানানো জায়িয নয়। যদি কোন মসজিদে এ আক্বীদার ইমাম থাকেন তবে তাকে বরখাস্ত করার চেষ্টা প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের উপর ফরয। মসজিদ কমিটি যদি এ ইমাম বদলাতে রাজী না হয় তাহলে মহল্লাবাসীদের উপর ফরয হবে এ কমিটি বর্জন করে অপর বিশুদ্ধ আক্বীদাসম্পন্ন কমিটি গঠন করা।"[২৯৯]

১০. তাবলীগ জামাআতের আমীর হযরত মাওলানা ইউসুফ কান্ধলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত এক তাবলিগী ইজতিমায় স্থানীয় জামাআতে ইসলামীর আমীর একটি বই বিক্রির স্টল দিতে চাইলেন। হযরতজী সাহেব স্টলের অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে মন্তব্য করলেন: "আপনারা এমন জিনিসের প্রার্থী যা শরীয়তের দৃষ্টিতে পরিত্যাজ্য। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

[২৯৭] ভুল সংশোধন, পৃ: ১৬-১৮, দশম সংস্করণ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।
[২৯৮] দৈনিক ইনকিলাব, ৯ অক্টোবর ২০০৩ ইং।
[২৯৯] আহসানুল ফাতওয়া, মুফতি রশীদ আহমাদ লুদিয়ানবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, পৃ: ৩২৯, ১ম খণ্ড, দ্বিতীয় প্রকাশ, মার্চ ১৯৯৮, বাংলা ইসলামিক একাডেমী, দিল্লী।

ওয়াসাল্লামকে নবুওয়াতের হুকুমত দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে নবুওয়াতের আবদিয়াত গ্রহণ করেন। আপনাদের ধারণা হলো শাসন ক্ষমতার পরিবর্তন হলে ইসলাম পুনর্জীবিত হবে, তা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।"[৩০০]

১১. হাটহাজারী মাদ্রাসার প্রাক্তন মুফতীয়ে আজম হযরত মাওলানা মুফতী ফায়জুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ১৩৮৬ হিজরীর ৫ জিলকদ প্রকাশিত ফাতওয়ায় তিনি বলেন: "মওদুদী সাহেব ফাসিকী চিন্তা ও ফাসিকী আক্বীদাসম্পন্ন এক ব্যক্তি। তার লিখনী ও বক্তৃতার মধ্যে শুধু সালফে সালিহীন, সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন ও আউলিয়ায়ে কিরাম সম্পর্কে অভদ্রোচিত আলোচনা নয় বরং আম্বিয়ায়ে কিরামদের সম্পর্কেও বে-আদবানা কথাবার্তা আছে। এ কারণে তাদের সাথে মেলামেশা জায়িয নেই। কাফিরদের সাথে মেলামেশার চেয়ে বিদআতীদের সাথে মেলামেশা খারাপ। ফাসিকদের পেছনে নামায পড়া মাকরুহে তাহরিমী।" এ ফাতওয়ার উপর স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন মাওলানা আবদুল ওয়াহহাব, মুহতামিম দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী এবং মাওলানা আহমদ শফী সাহেব হাটহাজারী।[৩০১]

মুফতীয়ে আজমের উক্ত ফাতওয়ার প্রতি সমর্থন জানিয়ে ফখরে বাঙ্গাল হযরত মাওলানা তাজুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "আমি মওদুদী জামাআত সম্পর্কে হাটহাজারী মাদ্রাসার মুফতী ফায়জুল্লাহ সাহেবের ফাতওয়া সমর্থন করি। প্রকৃতপক্ষে মওদুদী ফিতনা কাদিয়ানী ফিতনার চেয়ে কম নয়। খুলাফায়ে রাশিদীন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন এমনকি নবীগণ পর্যন্ত মওদুদীর সমালোচনা থেকে রেহাই পান নি। এতে প্রমাণিত হয় যে মওদুদী সাহেবের ইল্‌ম সকলের চেয়ে বেশী! (নাউযুবিল্লাহ্)

'ঘোর কুয়াশা দূর হলে দেখিবে পরিষ্কার

ঘোড়ায় তুমি সওয়ার কি না গাধাতে সওয়ার!'" [৩০২]

[৩০০] মওদুদী ফিতনা, পৃ: ২৩-২৪।
[৩০১] জামায়াতে ইসলামী ছে মুখালেফাত কিউ?, পৃ: ১১৯।
[৩০২] মওদুদী ফিতনা, পৃ: ৩৫ স্বাক্ষরসহ, ১৩/১১/১৩৮৬ হিজরী।

পরিশিষ্ট ৪

গায়র মুকাল্লিদ ভাইদের প্রতি আকুল আবেদন

حدثنا أبو مسلم قال : نا الحكم بن مروان الكوفي قال : نا سلام الطويل عن الأجلح بن عبد الله الكندي عن عدي بن عدي الكندي قال : قال عمر بن الخطاب : جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حين غير حينه الذي كان يأتيه فيه فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « يا جبريل ما لي أراك متغير اللون فقال : ما جئتك حتى أمر الله عز وجل بمفاتيح النار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا جبريل صف لي النار وانعت لي جهنم » فقال جبريل : « إن الله تبارك وتعالى أمر بجهنم فأوقد عليها ألف عام حتى ابيضت ثم أمر فأوقد عليها ألف عام حتى احمرت ثم أمر فأوقد عليها ألف عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمة لا يضيء شررها ولا يطفأ لهبها والذي بعثك بالحق لو أن قدر ثقب إبرة فتح من جهنم لمات من في الأرض كلهم جميعا من حره والذي بعثك بالحق لو أن ثوبا من ثياب النار علق بين السماء والأرض لمات من في الأرض جميعا من حره والذي بعثك بالحق لو أن خازنا من خزنة جهنم برز إلى أهل الدنيا فنظروا إليه لمات من في الأرض كلهم من قبح وجهه ومن نتن ريحه والذي بعثك بالحق لو أن حلقة من حلقة سلسلة أهل النار التي نعت الله في كتابه وضعت على جبال الدنيا لارفضت وما تقاربت حتى تنتهي إلى الأرض السفلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « حسبي (১) يا جبريل لا ينصدع قلبي فأموت » قال : فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل وهو يبكي فقال : تبكي يا جبريل وأنت من الله بالمكان الذي أنت به قال : وما لي لا أبكي أنا أحق بالبكاء لعلي أن أكون في علم الله على غير الحال التي أنا عليها وما أدري لعلي

أبتلى بمثل ما ابتلي به إبليس فقد كان من الملائكة وما يدريني لعلي أبتلى بمثل ما ابتلي به هاروت وماروت » قال : فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى جبريل عليه السلام فما زالا يبكيان حتى نوديا : أن يا جبريل ويا محمد إن الله عز وجل قد أمنكما أن تعصياه فارتفع جبريل عليه السلام وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بقوم من الأنصار يضحكون ويلعبون فقال : أتضحكون ووراءكم جهنم فلو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما أسغتم الطعام والشراب ولخرجتم إلى الصعدات (২) تجأرون إلى الله عز وجل » فنودي : يا محمد لا تقنط عبادي إنما بعثتك ميسرا ولم أبعثك معسرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « سددوا (৩) وقاربوا (৪) » لا يروى هذا الحديث عن عمر إلا بهذا الإسناد تفرد به سلام

---

(১) حسبي : كفايتي

(২) الصعدات : الطرق

(৩) سددوا : الزموا السداد وهو الصواب بلا إفراط وبلا تفريط

(৪) قارب : اقتصد وحاول الوصول إلى الكمال

হাদিস শরীফের অনুবাদ: “হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, একবার জিব্রাঈল আলাইহিস্‌সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎ করেন এমন এক সময় সাধারণত যখন তিনি আসেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “হে জিব্রাঈল! আপনার চেহারা কেনো এতো মলিন দেখাচ্ছে? তিনি জবাব দেন, আমি আপনার কাছে এমন এক সময় এসেছি যখন আল্লাহ তা’আলা আমাকে দোযখের চাবি বহনের নির্দেশ দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আপনি

আমার নিকট আগুনের বর্ণনা প্রদান করুন। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা দোযখকে নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তাতে এক হাজার বৎসর আগুন প্রজ্জ্বলিত রাখলেন, তাতে এর রঙ সাদা হয়ে গেল। এরপর আবার নির্দেশ দিলেন। আরো এক হাজার বৎসর আগুন জ্বালালেন। এতে তার রঙ লাল হলো। এরপর আবারো নির্দেশ দিলেন। আরো এক হাজার বৎসর জ্বলন্ত থাকার পর এর রঙ কালো হয়ে গেল। এখন দোযখের আগুনের রঙ কালো ও অন্ধকার হয়েছে, এতে অগ্নি স্ফুলিঙ্গের কোনো আলো নেই এবং তা নিভে না। আল্লাহর কসম! যদি জাহান্নামের একটি সুঁই বরাবর ছিদ্রও দুনিয়ার প্রতি থাকতো তাহলে পৃথিবীর সকলেই মারা যেতো। আল্লাহর কসম করে বলছি, দোযখের কোন কাপড় যদি ছড়িয়ে দেওয়া হয় তাহলে পৃথিবীর সবাই ও সবকিছু এর গরমে মরে যেতো। আল্লাহর কসম! যদি দোযখের একজন মাত্র ফিরিশতা পৃথিবীতে আসতেন, তাহলে তার কুৎসিত চেহারা ও দুর্গন্ধ থেকে সবাই মারা যেতো। দোযখের কোন স্তর যদি পাহাড়ে রাখা হতো তবে তা চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে নীচু ভূমির মতো সমতল হয়ে যেতো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যথেষ্ট হয়েছে! আর বললে আমার অন্তর ফেটে যাবে। আমি মারা যাবো। এসময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিব্রাঈলের দিকে তাকিয়ে দেখলেন তিনিও কাঁদছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, আপনি তো নিরাপদ স্থানে আছেন। আপনি কেনো কাঁদছেন? তিনি জবাব দিলেন, কেনো কাঁদবো না? আমি তো ক্রন্দনের উপযুক্ত। আল্লাহর ইলমে যদি অন্য কোন অবস্থার শিকার হয়ে যাই। আমার তো জানা নেই, পরীক্ষার সম্মুখীন যদি হয়ে যাই যেরূপ ইবলিস হয়েছিল। সে তো ফিরিশতাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। এটাও আমার জানা নেই যদি আমি হারুত-মারুতের মতো পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে পড়ি।

একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব কাঁদলেন, ওদিকে জিব্রাঈল আলাইহিস্সালামও কাঁদছিলেন। উভয়ে অনর্গল কাঁদতে থাকেন। এরপর আওয়াজ উঠলো: হে জিব্রাঈল! এবং হে মুহাম্মদ! তোমরা উভয়কেই আল্লাহ তা'আলা নাফরমানী থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন। একথা শুনে জিব্রাঈল আলাইহিস্সালাম উর্ধ্বলোকে চলে গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর থেকে বেরিয়ে আসলেন। একদল আনসারের সাথে তাঁর দেখা হলো। তাঁরা হাসি-খুশী ও খেলাধুলা করছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা হাসছো! অথচ তোমাদের পেছনে জাহান্নাম। আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে তাহলে কম হাসতে এবং বেশী কাঁদতে। খানাপিনা তোমাদের ভালো লাগতো না। তোমরা রাস্তা ও অলিগলিতে বেরিয়ে পড়তে। আল্লাহর নিকট

আশ্রয় প্রার্থনা ও রোনাজারি করতে। এবার আবার গায়েব থেকে আওয়াজ আসলো: হে মুহাম্মাদ! আমার বান্দাদেরকে নিরাশ করো না! আমি তো তোমাকে পাঠিয়েছি সহজ করে দেওয়ার জন্য। জটিল করবে না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা সঠিক পথ অবলম্বন করো। মধ্যম পথে চলো।" [তিবরানী, আল-মুয়াজ্জামুল আওসাত]

প্রিয় মুসলিম 'গাইর মুকাল্লিদ' ভাইগণ! উপরে উদ্ধৃত হাদিসটি ভালো করে পাঠ করুন। দ্বীনকে সঠিকভাবে পালন করতে ব্যর্থ হলে আমাদের পরিণতি জাহান্নাম হতে পারে। আল্লাহর নিকট আমরা আশ্রয়প্রার্থী। বারো শত বৎসরের অধিক সময় ধরে প্রত্যেক যুগের সর্বোচ্চ পর্যায়ের উলামায়ে কিরামসহ সাধারণ মুসলমান কোন না কোন মাজহাবের অনুসরণ করে আসছেন। দ্বীনকে সঠিকভাবে পালনের ক্ষেত্রে মাজহাবের অনুসরণের বিকল্প নেই। আপনারা কি মনে করেন, ইতিহাসখ্যাত আমাদের লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রপুরুষ সালফে-সালিহীন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন, আলিম, উলামা, মাশায়িখে কিরাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমের কেউ আপনাদের মতো দ্বীন বুঝতেন না? এমন অযৌক্তিক প্রশ্নই কি আদৌ করা যায়? অথচ আপনারা যাদের ইত্তিবা-তাকলিদ করেছেন তারা কেউই উক্ত উলামা-মাশায়িখের সমপর্যায়ের তো নয়ই- তাঁদের সঙ্গে তুলনার যোগ্যও ছিলেন না। দ্বীনকে সঠিকভাবে বুঝার ক্ষেত্রে যারা রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লামের যুগের নিকটবর্তী ছিলেন তাঁরাই সর্বাধিক যোগ্য ছিলেন।

প্রিয় ভাইগণ! মজাহাবের নূরান্বিত রাস্তা থেকে আর দূরে সরে পড়বেন না। ফিরে আসুন। একগুঁয়েমি ছেড়ে একটু ভাবুন, লক্ষ লক্ষ উলামায়ে কিমার কিভাবে ভুল করতে পারেন? অথচ মাজহাব না মানার মনেই হলো মহাত্মন উলামায়ে কিরামকে অবিশ্বাস করা। তাঁদের সিদ্ধান্ত না মানা, তাঁদের বিরোধিতা করা।

আপনারা আমাদেরই আপনজন, মুসলিম ভাইবোন। আপনারা পথভ্রষ্ট হলে সর্বাধিক বেশী মনঃক্ষুন্ন হবো আমরাই। সুতরাং আল্লাহর ওয়াস্তে ভ্রান্তি ও গোমরাহির পথ পরিহার করুন। ফিরে আসুন আসল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের দলে। আপনাদের পছন্দসই যে কোন মাজহাব অনুসরণ করলেই দ্বীনকে সঠিকভাবে পালন করা হবে। সন্তুষ্ট হবেন আল্লাহ জাল্লে জালালুহু ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমরা আশাবাদী, আপনারা যদি ঠাণ্ডামাথায় এ গ্রন্থটি পাঠ করেন তাহলে বুঝতে সক্ষম হবেন: 'এ যুগের বড়ো এক ফিতনা হলো সালাফিবাদ। এই ফিতনার ফলে মানুষ দ্বীনের মৌলিকত্ব হারাচ্ছেন। সৃষ্টি হচ্ছে দিন দিন অসংখ্য ফিরকার। আর এর মূল কারণ হলো সালাফিবাদের প্রতিষ্ঠাতারা তাকলিদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। তারা সবাইকে দ্বীনের অনেক বিষয় মুক্তভাবে গবেষণা করে

যারতার বুঝ মুতাবিক আমল করার এক মারাত্মক পথ উন্মোচন করেছেন। আহ! এ কী তারা করলেন? আস্তে আস্তে 'মুজতাহিদদের' সংখ্যা বাড়তে থাকবে। সকলেই যারতার বুঝ মুতাবিক দ্বীন পালনে অগ্রসর হবে। পুরো উম্মাহ্‌র মধ্যে সৃষ্টি হবে দ্বীনি অরাজকতা। ইতোমধ্যে এই অরাজকতার কিছুটা আবির্ভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।'

আমরা আল্লাহর দরবারে দু'আ করি: হে আল্লাহ! মুসলিম উম্মাহ্‌কে রক্ষা করুন। মুসলমানদের মধ্যে সঠিক দ্বীনদারিত্বের জ্ঞান দান করুন। মজাহাবের গুরুত্ব অনুধাবনে সাহায্য করুন। আমীন।

সমাপ্ত

তথ্যসূত্র গ্রন্থতালিকা

হযরত আহমদ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফে সানী রাহ., 'মাকতুবাতে ইমামে রব্বানী'।
শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহ. 'ফুইউদুল হারামাইন'; 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ'; 'উক্বদুল জিদ'; 'ইনসাফ'।
আল্লামা আল্লাহ ইয়ার খান (রাহঃ), 'দালাইলুস সুলুক'; বঙ্গানুবাদ: মাওলানা মুহিউদ্দীন খান দা.বা., 'ইসলামী তাছাউফের স্বরূপ'।
মাওলানা মুহাম্মদ হেমায়েত উদ্দীন দা.বা., 'ইসলামী আক্বীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ'।
মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ দা.বা., 'দরসে কুরআন সিরিজ'।
হাফিজ কামাল ইবনে হুমাম রাহ., 'মিনহাজুস্ সুন্নাহ', 'ফাতহুল ক্বাদির'।
তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, মুফতি শফি উসমানী রাহ., বঙ্গানুবাদ: মাওলানা মুহিউদ্দীন খান দা.বা.।
হযরত আবু বকর জাস্‌সাস রাহ., 'আহকামুল কুরআন'।
বুখারী; মুসলিম; আবু দাউদ; নাসাঈ; তিরমিযী; ইবনে মাজাহ; মুসতাদরাকে হাকিম; মিশকাত; মুসনাদে আহমদ; তাবারানী; দারে কুতনী; কানযুল উম্মাল; ইবনে হিব্বান; হায়াতুল আম্বিয়া লিলবাইহাক্বী; বাইহাক্বী শুয়াবুল ঈমান; মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ; মুসনাদে তাইলিসি; দারিমী।
হাফিজ নূরুদ্দীন আলী বিন আবু বকর হাইসামী রাহ., 'মাযমাল জাওয়ায়িদ'।
ইবনে আবদুল বার রাহ., 'জামি'উ বয়ানুল ইলম'।
ইমাম শা'রানী রাহ., 'মিজানুল কুবরা'।
মুল্লা আলী ক্বারী রাহ., 'শরাহ, ফিকহে আকবর'।
ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতি রাহ., 'খুলাফায়ে রাশিদীন'।
মুফতি আবদুর রহীম লাজপুরী রাহ., 'ফাতওয়ায়ে রাহিমীয়া'।
ইমাম গাজ্জালী রাহ., 'ইহইয়াউ উলূমিদ্দিন'।
[গায়র মুকাল্লিদ] মরহুম মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন বাটালভী, 'ইশা'আতুস সুন্নাহ'।
ইমাম মুহাম্মদ বিন ইউসুফ আস-সালেহ শামী রাহ., 'সাবীলুর রাশাদ'।
[কাদিয়ানী] মির্জা বশির আহমদ কাদিয়ানী, 'কালিমাতুল ফাস্‌ল'।
'তাক্বলিদে আইম্মাহ'।
[গায়র মুকাল্লিদ] মরহুম নবাব সিদ্দীক হাসান খান, 'আল-হিত্তা ফী জিকরী সিহাহিস সিত্তা'।
ইমাম শামসুদ্দীন শাখাওয়ী রাহ., 'মাক্বাসিদুল হাসানাহ'।
ইবনে নাজিম হানাফী রাহ., 'আশবার ওয়ান নাদ্বা'ইর'।

কামালুদ্দীন ইবনে হুমাম, ‘তাহরীর ফী উসূলিল ফিক্‌হ’।
আল্লামা মুল্লা জিওয়ান রাহ., ‘তাফসীরাতে আহমদী’।
শায়খ জাইনী দাহলান রাহ., ‘ফিতনাতুল ওয়াহাবিয়া’।
খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়া রাহ,. ‘রাহাতুল কুলুব’।
মুহাম্মদ ইবনে হাজর হাইসামী রাহ., ‘ফাতহুল মুবীন’।
‘হাক্বাইক্বে হানাফিয়া’।
‘নূরুল হিদায়া’।
ইমাম নববী রাহ., শাফিঈ মাজহাবের কিতাব, ‘রাওদ্বাতুত্ তালিবীন’।
ইমাম আবদুল ওয়াহহাব শা’রানী রাহ., ‘মিযানুশ্ শারীয়াতিল কুবরা’।
ইমাম তাহতাওয়ী রাহ., ‘’আলা দুররুল মুখতার’।
শাহ ইসহাক মুহাদ্দিসে দেহলবী, ‘মি’আহ মাসাঈল’ কিতাবের অনুবাদগ্রন্থ ‘ইমদাদুল মাসাঈল’।
শাহ মুহাম্মদ হিদায়াত আলী, ‘দুররে লাছানী’।
‘আহসানুল তাক্বীম’।
শায়খ মুহাম্মদ ইদ্রিস কান্ধলবী রাহ., ‘আক্বাঈদুল ইসলাম’।
‘হাক্বিক্বাতুল ফিক্‌হ’।
আল্লামা ইবনে জাওযী রাহ., ‘তাবলিস ইবলিস’।
ইমাম নববী রাহ., ‘শরহে মুসলিম শরীফ’।
হাফিজ ইবনে হাজর আসক্বালানী রাহ., ‘ফাতহুল বারী’।
মুহাম্মদ আবুল হাসান শিয়ালকুটী, ‘ফায়যুল বারী - শরহে ফাতহুল বারী’।
ইবনে কাইয়্যিম জাওযী রাহ., ‘ই’লামুল মুয়াক্কী’ঈন’।
‘ফাতওয়ায়ে সিরাজিয়া’।
আবদুল আউয়াল জৌনপুরী, ‘মুফীদুল মুফতি’।
শায়খ বদরে আলম মিরাঠী, ‘তারজুমানুস্ সুন্নাহ’।
এইচ. এম. সাঈদ, ‘মা’আরিফুস সুনান’।
ইমাম ইবনে হাজর মক্কী রাহ., ইমামে আজমের জীবনীগ্রন্থ, ‘খাইরাতুল হিসান’।
ইমাম শামসুদ্দীন জাহাবী রাহ., ‘তাজকিরাতুল হুফ্‌ফাজ’।
ইমাম মুহাম্মদ শাতিবী রাহ., ‘ই’তিসাম’।
[গায়র মুকাল্লিদ] মুহাম্মদ মারযুক কুর্দিস্থানী, ‘ফিক্বহে মুহাম্মদী’।
আবদুল্লাহ ইবনে বায রাহ., ‘তানবিহাত হাম্মা’।
[গায়র মুকাল্লিদ] মুহাম্মদ খলিল হাররাস, ‘শরহে আক্বিদাতুল ওয়াসিতিয়া’।
ইমাম আহমদ দারদীর রাহ., ‘শরহে আক্বীদা মালিক আস-সাগির’।
হাফিজ ইবনে হুমাম রাহ., ‘ফাতহুল ক্বাদির’।

ইমাম আবু হানিফা রাহ., ‘ফিকহুল আকবর’।
হাফিজ মুহাম্মদ মুরতাজা জাবিদী রাহ., ‘ইতাফাস সাদাল মুত্তাকীন’।
হাফিজ ইবনে তাইমিয়া রাহ., ‘মাজমুয়াল ফাতওয়াহ’।
[গায়র মুকাল্লিদ] নাসির উদ্দীন আলবানি, ‘সিলসিলা জায়িফা’।
‘সাফাউস্ সাক্বাম’।
মাওলানা সাফরাজ খান সাফদার রাহ., ‘তাসকীনুস সুদুর’।
মুল্লা আলী ক্বারী রাহ., ‘মিরকাতুল মাফাতিহ শরহে মিশকাতুল মাসাবিহ’।
ইমাম ইবনে কাসির রাহ., ‘তাফসীরে ইবনে কাসির’।
ইবনে কুদামা হাম্বলী রাহ., ‘মুগ্বনি’।
ইমাম নববী রাহ., ‘মুজমু’।
ইবনে আসাকির রাহ., ‘তারিখে ইবনে আসাকির’।
আবদুল্লাহ বিন বায রাহ., ‘আল-ফিকহিয়্যিয়াতুল মা’আসিরা’।
[গায়র মুকাল্লিদ] নাসির উদ্দীন আলবানি, ‘সিলসিলাতুল আহাদিসুস সাহিহা’।
আহমদ সাওয়ী রাহ., ‘হিশায়া আস-সাওয়ী ’আলাল জালালাইন’।
আবু হাইয়ান আন-নাহাওয়ী, ‘তাফসীর আন-নাহর আল-মাদ্দ’; ‘আল-বাহরুল মুহিত’।
ইবনে তাইমিয়া রাহ., ‘কিতাবুল আরশ’।
জাহিদ কাওসারী, ‘আস-সাইফুস সাক্বিল’।
ইমাম নববী রাহ., ‘আল-আজকারুন নববীয়া’।
ইমাম নববী রাহ., ‘আজ-জিকির’।
আবদুর রহমান আবদুল খালিক্ব কুয়েতি, ‘ফাদা’ইহ আস-সুফিয়া’।
জামালুদ্দীন তালিয়ানী, ‘তারগিবুল মুতাহাব্বিন ফী লাবস খাইরাতিল মুতামাইয়্যিযীন’।
ইবনুল কাইয়্যিম রাহ., ‘আন-নুনিয়্যা’।
মাওলানা মুহিউদ্দীন খান দা.বা., ‘সংক্ষিপ্ত তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন’।
শায়খ মসীহ উল্লাহ খান রাহ., ‘পরিশুদ্ধির বাস্তবতা’, হুয়াইটথ্রেডপ্রেস.কম।
ইমাম বাইহাকী রা., ‘কিতাব আদ-দাওয়াত আল-কবীর’।
মাওলানা এ.বি.এম. মাঈনুল ইসলাম, ‘তাফসীরে মাযহারী (বঙ্গানুবাদ)’।
ইমাম গাযযালী রাহ., ‘তা’লিমুল মু’আল্লিমীন’।
হযরত আশরাফ আলী থানবী রাহ., ‘আত্তাকাশ্‌শাফ আন-মুহিম্মাতাত্ তাসাওউফ’।
শাহ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহ., ‘তাহফিমাত’।
হযরত আবু নাইম ইসফাহানী রাহ., ‘হিলয়াতুল আউলিয়া’।
ইবনে আবিদ দুনইয়া রাহ., ‘আল-আউলিয়া’।

ইবনে খালদুন রাহ., 'মুকাদ্দীমা'।
ইবনে আবিদীন রাহ., 'হাশিয়াত রাদ্দুল মুহতার আলাল দুররুল মুখতার'।
ইবনে যাওজী রাহ., 'সিফাতু সাফওয়া'।
মুল্লা আলী ক্বারী রাহ., 'শরাহ আইনুল ইলম ওয়া জাইনুল হিলম'।
আহমদ জাররুক রাহ., 'ক্বাওয়াইদুত তাসাওউফ'।
আলী আদাওয়ী রাহ., 'হিশায়াতাল আদাওয়ী আলা শারহ আবি আল-হাসান লি রিসালাত ইবনে আবি জায়িদ আল-মুসাম্মাত কিফায়াতুল তালিবুর রাব্বানি লি রিসালাত ইবনে আবি জায়িদ আল-কাইরাওয়ানি ফি মাযহাব মালিক'।
ইবনে আযিবা রাহ., 'ইক্বাজুল হিমাম ফি শারহ আল হিকাম'।
ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতী রাহ., 'তাঈদুল হাক্বিক্বাল আউলিয়া'।
আল-আযলুনী রাহ., 'কাশফাল খাফা ওয়া মুজিলাল আলবাস'।
আমীন ইবনে ফাতহুল্লাহ জাহদাহ, 'তানবীরুল কুলুব'।
মাওলানা নূরুর রহমান, 'তাযকিরাতুল আওলিয়া'।
'সুফিয়ায়ে কেরামের বাণী'।
ইবনে যাওজী রাহ., 'আদাবুল শাইখুল হাসান ইবনে আবুল হাসান বসরী'।
ইবনে কাইয়্যিম রাহ., 'রাওদ্বাতুল মুহিব্বীন ওয়া নুযহাতুল মুস্তাক্বীন'।
ইবনে কাইয়্যিম রাহ., 'মাদারিয়ুস সালিকীন'।
আব্দুল ক্বাহির বাগদাদী রাহ., 'কিতাবুল উসূল দ্বীন'।
তাজউদ্দীন সুবকি রাহ., 'তাবাক্বাতাশ শাফিয়্যা'।
আলিফুদ্দীন আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবনে আছাদ ইয়াফিঈ রাহ., 'নাসরুল মাহাসিনুল গ্বালিয়া ফি ফজল মাশায়িখুস সুফিয়্যা'।
হযরত জুনায়িদ বাগদাদী রাহ., 'কিতাব দাওয়াল আরওয়াহ'।
মাওলানা সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, [বঙ্গানুবাদ পাণ্ডুলিপি] 'রিসালাতুল কুশাইরী'।
'এনসাইক্লোপিডিয়া ইরানিকা'।
মাওলানা কবির আহমদ খান ও ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী, 'সালফে সালিহীন ও ইলমে তাসাওউফ'।
ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী, 'কুরআন-হাদীসের আলোকে মাজহাবের গুরুত্ব ও নামায'।
'তাফসীরে তুশতারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি', ইংরেজী অনুবাদ।
আহমদ ভনডেনফর, 'উলূমুল কুরআন'।
'তাফসীরে ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু'।
[গায়র মুকাল্লিদ] নাসির উদ্দীন আলবানি, 'মুখতাসার সহীহ মুসলিম'।
[গায়র মুকাল্লিদ] নাসির উদ্দীন আলবানি, 'আহকামুল জানাইয ওয়া বিদা'উহা'।

[গায়র মুকাল্লিদ] নাসির উদ্দীন আলবানি, 'তালখিস আহকামাল জানাইয'।
[গায়র মুকাল্লিদ] নাসির উদ্দীন আলবানি, 'তাহজিরাস সাজিদ'।
[গায়র মুকাল্লিদ] নাসির উদ্দীন আলবানি, 'হিজ্জাতুন নাবী'।
[গায়র মুকাল্লিদ] নাসির উদ্দীন আলবানি, 'মানাসিকাল হাজ্জ ওয়াল উমরা'।
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, 'সীরাত বিশ্বকোষ'।
আবুল হাসান আলী নদবী রাহ., 'আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা'।
ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রাহ., 'তাফসীরে কবীর'।
ড. জি. এফ. হাদ্দাদ, 'AL-ALBANI, A Concise Guide to the Chief Innovator of Our Time'.
www.salaficentre.net (Salafi Centre of Manchester, England).
'রাদ্দুল মুহতার'।
'ফাতওয়ায়ে আলমগীরী'।
'দুররে মুখতার'।
'শামী'।
আল-খতীবুদ দুরারী, 'লামিউদ দুরারী - শরহে সহীহ বুখারী'।
ইমাম বাইহাকী রাহ., 'সুনানে কুবরা'।
[গায়র মুকাল্লিদ] নাসির উদ্দীন আলবানি, 'আজ-জাঈফাহ'।
ইমাম জালালুদ্দীস সুয়ূতী রাহ., 'তা'আকুবাত'।
'Criticism of Hadith among Muslims with reference to Sunan Ibn Maja', by Suhaib Hasan
হযরত আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রাহ., 'বুখারী শরীফের শরাহ ফায়জুল বারী'।
ইমাম শুরুন্দাবুলালী রাহ., 'মারাক্বিউল ফালাহ'।
ইমাম নুজাইম আল-মিসরী রাহ., 'বাহরুর রা'ইক'।
কাজী সাহনূন রাহ., 'আল-মুদাওয়ানাহ'।
হাফিজ ইউসুফ জাইলানী রাহ., 'নাসবুর রাইয়া'।
হাফিজ ইবনে হাজর আসক্বালানী রাহ., 'তালখিসুল হাবির ফী তাখরিজ আহাদিসুল রাফি'ইল কাবীর'।
ইমাম ইবনে নাসির মারওয়াজি রাহ., 'ক্বিয়ামুল লাইল'।
ইবনে কুদামা রাহ., 'আল-মুগনি'।
হযরত আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রাহ., 'তিরমিযিল মা'রফু বাআরফা'শ শায্যী'।
'উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারী'।
ইবনে তাইমিয়া রাহ., 'ফাতওয়ায়ে ইবনে তাইমিয়া'।

[গায়র মুকাল্লিদ] আবুল কালাম মুহাম্মদ আবদুর রহমান, 'আল্লাহর রাসূল (সা.) এর শিখানো জানাযার নামায'।
হানাফী ফিক্হ জ্ঞানপুঞ্জী, 'বাহরে শরীয়ত'।
ইবনে রুশ্দ রাহ., 'বিদায়াতুল মুজতাহিদ'।
আবু জাফর ইবনে নাসির দাউদী রাহ., শরহে সুনানে আবি দাউদ, 'বাযলুল মাজহূদ'।
আল-বাদি'উ রাহ., 'আওযাজুল মাসালিক, শরাহ মুয়াত্তা ইমাম মালিক'।
আবদুর রহমান মুহাম্মদ যাজিরী, 'মাজাহিবুল আরবা'আ'।
'আল-কাউলিবি'।
সাঈদ মুর্তাজা জুবাইদী, 'শাহরুল ইহইয়া'।
শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহ., 'শারহুল মুয়াত্তা'।
হযরত আশরাফ আলী থানবী রাহ., 'খুতবাতুল আহকাম লি জুমু'আতুল আম'।
ইমাম নববী রাহ., 'কিতাবুল আজকার'।
'ফাতওয়ায়ে হিদায়া'।
আবদুল মুকিত মুখতার, 'আরবী ছাড়া ভিন্ন ভাষায় জুমু'আর খুতবা: একটি যৌক্তিক পর্যালোচনা'।
মুফতি তকী উসমানী দা.বা., ওয়েবসাইট:
http://www.albalagh.net/qa/fazail_amaal.shtml)
হযরত হাসিম সিন্ধী রাহ. 'দিরহামুস-সুররা'।
ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রাহ., 'জাম'আল জাওয়ামী'।
শায়খ আলী মুত্তাকী রাহ,. 'কানযুল উম্মাল'।
ইমাম নববী রাহ., 'তালীক্ব আল-হাসান'।
ইমাম ইবনে মাজাহ, 'মুহিতুল বুরহানী'।
হাইসামী রাহ., 'মাযমা'আল বাহরেইন'।
ইবনে তুর্কমানী রাহ., 'আয-জাওহারুন নাক্বী'।
সাঈদ সাবিক, 'ফিকহুস সুন্নাহ'।
[গায়র মুকাল্লিদ] নাসির উদ্দীন আলবানি, 'সিফাতু সালাতিন নাবী'।
[গায়র মুকাল্লিদ] আবু আমিনা বিলাল ফিলিফ্স, 'দ্যা ইভ্যুলুশন অব ফিক্হ'।
'মুসনাদে ইবনে জুবাইর হুমাইদী রাহ.'।
'সহীহ আবু আওয়ানাহ রাহ.'।
মুফতি আহমদ খান, 'জা'আল হাক্ব'।
Imam Abu Hanifa: Life and Work' by Shibli Numani.

'Vide: The Ethics of Disagreement in Islam' by Taha Jabir al-Alwani.
শামসুল হক আজিমাবাদী, 'আওনাল মা'বূদ - শরহে সুনানে আবু দাউদ'।
শায়খ জাফর আহমদ উসমানী, 'ইলাউস সুনান'।
ইমাম নববী রাহ., 'আল-মাজমু'।
ইমাম নববী রাহ. 'রিয়াদুস সালিহীন'।
মুল্লা আলী ক্বারী রাহ., 'শরহে মুসনাদে আবি হানিফা'।
শায়খ আবদুল হাই লৌক্ষনৌবী, 'আস্ সিয়ায়াহ'।
ইমাম তাহাবী রাহ., 'তুহফা আখইয়ার'।
শায়খ সাব্বির আহমদ উসমানী রাহ., 'ফাতহুল মুলহিম'।
ইমাম তাহাবী রাহ., 'মিশকাতুল আনওয়ার'।
ইমাম জাহাবী রাহ., 'সিয়ারু আ'লামিন নুবালা'।
ইমাম শাওকানী রাহ., 'নাইলান আওতার'।
ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আহমদ জাহাবী রাহ., 'মিজানুল ই'তিদাল'।
ইমাম কুরতুবী রাহ., 'তাফসীরে কুরতুবী'।
মাওলানা মুহাম্মদ আতাউর রহমান জকিগঞ্জী, 'আল-বায়ানুল জামি' ইবরাতান লি-ইখতিলাফিল মাতালি''।
www.hilalsighting.org
'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'।
হাবীবুর রহমান আজমী, 'আল-আলবানি শুদ্ধদু ওয়া আখতা'উ [আলবানির ভ্রান্তি ও ভুল]'।
মুহাম্মদ সাইদুর রহমান বুতী, 'আল-লামাজহাবিয়া আখতারু বিদআতিন তুহাদ্দিদুশ শারীয়াল ইসলামিয়া [মাজহাব অনুসরণ না করা হলো সর্বাধিক মারাত্মক বিদআত যা ইসলামী শরীয়াকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছে]'।
মুহাম্মদ সাইদুর রহমান বুতী, 'আস্সালাফিয়া মারহালাতুন জামানিয়াতুন মুবারাকা লা মাজহাবুন ইসলামী [প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের রাস্তা ছিলো একটি মুবারক ঐতিহাসিক যুগ, ইসলামী মাজহাব নয়]'।
আবদুল আজীজ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সিদ্দীক গুনামী, 'ইরগামুল মুবতাদি'ল গাবির বি জওয়াযুত তাওয়াস্সুল বিন-নাবী ফীর-রাদ্দ আলাল আলবানি আল-ওয়াবি [নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অকাট্য দলিলসহ মারাত্মক ক্ষতিকর আলবানি নামক অজ্ঞ বিতআতীর জোর জরবদস্তিমূলক লেখার খণ্ডন]'।
আবদুল আজীজ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সিদ্দীক গুনামী, 'আল-কৃওলাল মুক্বনি' ফীর-রাদ্দ আলাল আলবানি আল-মুবতাদী [বিদআতকারী আলবানির মতামত খণ্ডনের

বোধযোগ্য ধর্মোপদেশ]” এবং “ইতক্বানাস সুনা’আ ফী তাহক্বীক্ব মা’নাল বিদআ’ [বিদআতের অর্থের সঠিক ব্যাখ্যা]’।

মুহাম্মদ আওয়ামা, ‘আদব আল-ইখতিলাফ [ইখতিলাফের আদব]’।

মুহাম্মদ সাঈদ মামদুহ, ‘উসূলুল তাহাবী বি ইতবাত সুন্নিয়্যাতুস সুবহা ওয়ার রাদ্দ আলাল আলবানি [জিকিরের সময় গুটাযুক্ত তাসবীর ব্যবহারের উত্তম ফায়দা ও আলবানির মতামতের খণ্ডন]’।

মুহাম্মদ সাঈদ মামদুহ, ‘তানবিহুল মুসলিম ইলা তা’আদ্দিল আলবানি আলা সহীহ মুসলিম [সহীহ মুসলিমের উপর আলবানির আক্রমণ সম্পর্কে মুসলমানদের প্রতি সতর্কবাণী]’।

ইসমাঈল ইবনে আহমদ আল-আনসার, ‘তা’আক্কুবাত আলা ‘সিলসিলাতুল আহাদিসাল দ্বায়িফা ওয়াল মাওদ্বু’আ’ লিল আলবানি [আলবানির বই ‘দুর্বল ও জাল হাদিস’ এর একটি সমালোচনা]’।

ইসমাঈল ইবনে আহমদ আল-আনসার, ‘তাশীহ সালাতুত তারাওয়ী ’ইশরিনা রাক’আতান ওয়ার রাদ্দ ’আলাল আলবানি ফী তাদ’ইফিহ [তারাবী নামায ২০ রাকাআত হওয়ার সঠিক প্রমাণ ও আলবানি কর্তৃক এর গুরুত্ব দূর্বল করার চেষ্টার খণ্ডন]’।

ইসমাঈল ইবনে আহমদ আল-আনসার, ‘ইবাদাতুত তাহাল্লী বিয-যাহাবুল মুহাল্লাক্ব লিন-নিসা’ ওয়ার রাদ্দ আলাল আলবানি ফী তাহরিমিহ [আলাবানী কর্তৃক মহিলাদের স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার অবৈধ সিদ্ধান্তের খণ্ডন]’।

বদরুদ্দীন হাসান জিয়াব, ‘আনওয়ারুল মাসাবিহ ’আলা জুলুমাতিল আলবানি ফী সালাতিত্ তারাওয়ী [তারাবিহ নামাযের ক্ষেত্রে আলবানির অন্ধকারকে আলোকিত করা]’।

শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল-খাজরানী, ‘আল-আলবানি: তাতাররুফাতুহ [আলবানি: তার সীমাতিক্রমতা]’।

হাসান আলী সাক্কাফ, ‘তানাকুদাতুল আলবানি আল-ওয়াদিহা ফী মাওয়াক্বা’আ ফী তাশিহাল আহাদিস ওয়া তাদি’ইফিহা মিন আখতা’ওয়া গ্বালতাত [হাদিস শুদ্ধ ও দুর্বল ঘোষণার ক্ষেত্রে আলবানির স্ববিরোধিতা ও ভুল]’।

ফিরাস মুহাম্মদ ওয়ালিদ, ‘সুন্নিয়্যাতুল জুমু’আল ক্বাবলিয়্যা [জুমু’আ নামাযের পূর্বের সুন্নাত নামায]’।

[লা-মাজহাবী] মির্জা হাইরাত দেহলবী , ‘হয়াতে তায়্যিবাহ’।

খোন্দকার মাওলানা মো: বশির উদ্দিন, ‘চারি মাজহাব (সমস্যা ও সমাধান)’।

মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী রাহ., ‘শিহাব আস-সাক্বিব’।

আবদুল হাকিম মুরাদ, ‘ইসলামিকা’।

আনওয়ার আহমদ কাদিরী, ‘ইসলামিক জুরিসপ্রোডেন্স ইন দ্যা মডার্ণ ওয়ার্লড’

শাহ আবদুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহ., ‘তাফসীরে আজিজী’।

[লা-মাজহাবী] আবুল আলা মওদুদী, ‘রাসায়েল মাসায়েল’।

শায়খ মাওলানা আবদুল মতিন ফুলবাড়ি রাহ., ‘সত্যের মাপকাঠি’ [পুনর্মুদ্রণ]।

আবদুল মুকিত মুখতার, ‘আধুনিকতা ও বিপর্যয়’।

হাকীম মুহাম্মদ আখতার রাহ., ‘মওদুদী সাহেব আকাবিরে উম্মত কী নযর মে’।

মুফতি মুহাম্মদ কিফায়াতুল্লাহ দেহলবী রাহ., ‘মাকতুবে হিদায়াত’।

আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুরী রাহ., ‘ভুল সংশোধন’।

মুফতি রশীদ আহমাদ লুদিয়ানবী রাহ., ‘আহসানুল ফাতওয়া’।

শায়খ জাকারিয়া কান্ধলবী রাহ., ‘মওদুদী ফিতনা’।

‘জামায়াতে ইসলামী ছে মুখালেফাত কিউ?’।